শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা'র

কর~কমলে ~

শ্রীচরণ আশ্রিতা—

"লিলি"

ওঁ তৎ সৎ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম্ম

শ্রীগীতা-সম্পাদক

শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ বি.এ.-প্রণীত

৩য় সংস্করণ

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

মূল্য ৫·০০ টাকা

গীতাশাস্ত্রী শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষের

ভারত-আত্মার বাণী

ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক আলোচনা।

একটা জাতির সুবিস্তীর্ণ আত্মিক ভাব-সাধনার ইতিহাস রচনা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আলোচ্য গ্রন্থে এই বিরাট ইতিহাসের প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের পরিচয়ই আছে। লেখকের গভীর পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রানুসন্ধান ও আদর্শনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় গ্রন্থখানির সর্ব্বত্রই সুপরিস্ফুট। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। চিত্রগুলি গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। —যুগান্তর।

ঋক্ বেদ থেকে শুরু করে অরবিন্দ, রবীন্দ্র, মহাত্মা-গান্ধীর জীবন দর্শন পর্য্যন্ত এই সর্ব্বকল্যাণময় ঐক্যবোধের অব্যয় ধারা প্রবাহিত হয়ে আস্‌ছে। সেই সনাতন ধারাটি বিভিন্ন মহাপুরুষদের নানা উপলব্ধিতে নানা ব্যাখ্যানে যে সর্ব্বক্ষেত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক আশ্চর্য্য দক্ষতায় সেই সব ব্যাখ্যাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

— আনন্দবাজার পত্রিকা।

গ্রন্থকার মনস্বী পুরুষ। ভগবান্ বুদ্ধ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর বাঙময় অবদানের কুঞ্জকানন হইতে তিনি যে ভাবে অনবদ্য কুসুমরাজি চয়ন করিয়াছেন এবং সুনিপুণ হস্তে মালা গাঁথিয়া পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বাণীর চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন তাহা তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। — দেশ।

আর্য্যসভ্যতার মূলমন্ত্রের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই গ্রন্থের প্রধানতম উদ্দেশ্য। জনসমাজে ভারত-আত্মার যথার্থ বাণী-প্রকাশক এই জাতীয় পুস্তকের একান্ত আবশ্যকতা আছে।

সুদৃশ্য বাঁধাই, মূল্য ৫৲ টাকা —উদ্বোধন

জগদীশবাবুর শ্রীগীতার বিভিন্ন সংস্করণ—

সুবৃহৎ সংস্করণ—মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা-টীপ্পনী, ভাষ্য-রহস্যাদি এবং বিস্তৃত ভূমিকা-সহ প্রায় ৭০০৲ পৃষ্ঠা। মূল্য ৬·০০ টাকা

বৃহৎ পকেট সংস্করণ—শব্দে শব্দে প্রতিশব্দ, সরল অনুবাদ, টীকা-টীপ্পনী, বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপসহ ৫৫০ পৃষ্ঠা। জ্যাকেট-সহ সুদৃশ্য বাঁধাই। মূল্য—২·০০ টাকা

সুলভ পকেট সংস্করণ—মূল, সরল বঙ্গানুবাদ, প্রতি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ, গীতা-মাহাত্ম্য ইত্যাদি সহ। মূল্য ১·০০ টাকা

সুলভ পদ্য-গীতা—শ্লোকে শ্লোকে সরল পদ্যানুবাদ, টীকা-টীপ্পনী, প্রতি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ ও গীতা-মাহাত্ম্য সহ। মূল্য ১·০০ টাকা

বৃহৎ পদ্য-গীতা—সরল পদ্যানুবাদ, টীকা-টীপ্পনী, সার-সংক্ষেপ এবং মূল সংস্কৃত শ্লোক-সহ। মূল্য ১·২৫ নঃ পঃ

নিত্যপাঠ্য গীতা—মূল সংস্কৃত শ্লোক, গীতা-মাহাত্ম্য সহ। মূল্য বাঁধাই ·৫০ নঃ পঃ

প্রকাশক—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্-এ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা
মুদ্রাকর—শ্রীঅজিতচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজগদীশ প্রেস, ৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা
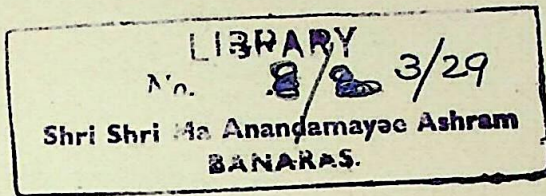
সমর্পণ

যাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদে ও পুণ্যবলে
এই অকৃতী অধমের
শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তনে সুমতি হইয়াছে
সেই
গোলোকগত জনক-জননীর
পবিত্র স্মৃতি
হৃদয়ে ধারণ করিয়া
এই
'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থ
শ্রীভগবানে অর্পণ করিলাম
দয়াময়! তুমি জান।
॥ ওঁ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

ঈশ—ঈশাবাস্যোপনিষৎ। **ঋক্**—ঋগ্বেদ; মণ্ডল, সূক্ত, ঋক্। **কঠ**—কঠোপনিষৎ। **কেন**—কেনোপনিষৎ। **কৌষী**—কৌষীতক্যুপনিষৎ। **গী, গীঃ, বা গীতা**—প্রথম সংখ্যা অধ্যায়জ্ঞাপক, পরবর্ত্তী সংখ্যা শ্লোকজ্ঞাপক। **চৈঃ চঃ**—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত; খণ্ড, অধ্যায়, শ্লোক। **ছান্দোঃ**—ছান্দোগ্যোপনিষৎ। **তৈত্তি**—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। **যোঃ সূঃ বা যোগসূত্র**—পাতঞ্জল যোগসূত্র। **যোঃ বাঃ**—যোগবাশিষ্ঠ। **প্রশ্ন**—প্রশ্নোপনিষৎ। **বৃঃ বা বৃহ**—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। **বিঃ পুঃ**—বিষ্ণুপুরাণ। **বৃহঃ নাঃ পুঃ**—বৃহন্নারদীয় পুরাণ। **ব্রঃ সূঃ বা বেঃ সূত্র**—বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র। **ভঃ রঃ সিঃ**—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। **ভাঃ**—শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ—স্কন্ধ, অধ্যায়, শ্লোক। **মভাঃ**—মহাভারত—পর্ব্ব (প্রথম অক্ষর বা প্রথম দুই অক্ষর পর্ব্ব-জ্ঞাপক; যথা—শাং=শান্তি পর্ব্ব, বন=বন পর্ব্ব), অধ্যায় শ্লোক। **মু বা মুণ্ডক**—মুণ্ডকোপনিষৎ। **মাণ্ডু**—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। **মৈত্র্য**—মৈত্র্যুপনিষৎ। **শ্বেত**—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। **সাঃ সূঃ**—সাংখ্য সূত্র। **সাঃ কাঃ**—সাংখ্য-কারিকা।

এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় বলিয়া এস্থলে লিখিত হইল না। যেমন, শঙ্কর=শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যকৃত গীতাভাষ্যাদি। মনু=মনুস্মৃতি, হারীত=হারীতস্মৃতি ইত্যাদি।

যে স্থলে কেবল সংখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে তথায় এই গ্রন্থ বুঝিতে হইবে।

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবৃতি-সূচী

(এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে যে সকল বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা করা হইয়াছে সে সকলের কতকগুলি বর্ণমালানুক্রমে নিম্নে উল্লিখিত হইল। সংখ্যাগুলি পত্রাঙ্কসূচক।]

ভূমিকা

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

শ্রীকৃষ্ণকথা প্রাচীন পুরাণেতিহাসে এবং পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব শাস্ত্রাদিতে সবিস্তার বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণকথা অবলম্বনে কত ধর্ম্ম-সাহিত্য, লোকসাহিত্য, কাব্য-নাটক, গীতি-কবিতাদি রচিত ও প্রচলিত হইয়াছে তাহার অন্ত নাই।

আধুনিক কালে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও অনেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। এই আধুনিক সমালোচকগণের কেহ কেহ অবতার-বাদ স্বীকার করেন না, কিন্তু অনেকেই অবতার-বাদ ও শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। বঙ্গদেশে বঙ্কিমচন্দ্র এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্যতম। তিনি লিখিয়াছেন—'আমি নিজেও কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।'

অবতারবাদ বিশ্বাসের বস্তু, বিচার-বিতর্কের বিষয় নহে

বস্তুতঃ, অবতার-বাদ ব্যক্তিগত ভক্তি-বিশ্বাসের কথা, উহা যুক্তিতর্ক দ্বারা সপ্রমাণ করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যেমন তর্কের বিষয় নহে, শ্রদ্ধা বা আস্তিক্যবুদ্ধির বিষয়, ঈশ্বরের অবতার-লীলাও তদ্রূপ। ঈশ্বর আছেন, অবতারী-রূপেও তিনি আছেন, অবতার-রূপেও তিনি আছেন, একথা যিনি বলিতে না পারিলেন, তিনি তাঁহাকে কিরূপে উপলব্ধি করিবেন ('অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে'—কঠ)?

যাঁহারা ঈশ্বর মানেন, কিন্তু ঈশ্বরের অবতার মানেন না, তাঁহারা এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন করেন—যিনি ঈশ্বর তিনি আবার মানুষ হইবেন কিরূপে? যিনি নিরাকার তিনি দেহধারণ করিবেন কিরূপে? যিনি জন্মরহিত, তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন কিরূপে, ইত্যাদি। হিন্দুশাস্ত্র কি এতই অল্পদর্শী যে এই অতি স্থূল কথাগুলিও বুঝিতে অক্ষম? হিন্দুশাস্ত্রও বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, কেবল নিরাকার নহেন, তিনি নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি—যাহা অধ্যাত্মতত্ত্বের শেষ কথা। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র একথাও বলেন যে, তিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, অজ, অব্যয় আত্মা হইলেও ('অজোঽপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্'—গী ৪) স্বীয় অচিন্ত্য মায়াযোগে দেহধারণ করিতে পারেন ('সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া')। সুতরাং তিনি মানুষ নহেন, মায়া-মানুষ। মায়া বা প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তিবিশেষ, তিনি মায়াধীশ, তাই বলা হইয়াছে, স্বীয় মায়াযোগে। এই মায়ার স্বরূপ মনুষ্য-বুদ্ধির অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য, উহা যুক্তিতর্কের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না ('অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তান্ ন তর্কেন সাধয়েৎ'—মভা)। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহাতে অসম্ভব কি আছে? তিনি দেহধারণ করিতে পারেন না, একথা বলিলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তাই অস্বীকার করা হয় না কি? ('তাদৃশঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিদ্ধেৎ পরমেশতা')। এদেশের কোটী কোটী নর-নারী শ্রীকৃষ্ণের অবতারে বিশ্বাসী, কৃষ্ণোপাসক, শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত। কিন্তু সেই উপাসকগণেরও সকলে একভাবে তাঁহাদের উপাস্য বস্তুর চিন্তা করেন না, একরূপে তাঁহার উপাসনা করেন না।

মহাভারতে, পুরাণে, বিবিধ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থে ও লোক-সাহিত্যে, সুনিপুণ অনিপুণ বিভিন্ন হস্তের তুলিকা-স্পর্শে, প্রকৃত, অপ্রকৃত, অতিপ্রকৃত ঘটনার সমাবেশে শ্রীকৃষ্ণ-চিত্রটি যেমন কোথাও সুরঞ্জিত, তেমনি কোথাও অতিরঞ্জিত, কোথাও বিকৃত, এমন কি কলঙ্কিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থাদি পর্য্যালোচনা করিলে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্ব্বিধ মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই—

১। মহাভারতের বা ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ

২। গীতার শ্রীকৃষ্ণ

৩। পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ

৪। বৈষ্ণব-আগমের শ্রীকৃষ্ণ

মহাভারতের বা ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ

ইহা এক্ষণে সর্ব্ববাদিসম্মত মত যে মহাভারতে বর্ণিত ভারত-যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা এবং কুরু-পাণ্ডবাদি ও শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কিত মহাভারতীয় বৃত্তান্ত মূলতঃ ঐতিহাসিক। এদেশের প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে মহাভারতই (এবং রামায়ণও) ইতিহাস বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে সে সকলই যে ঐতিহাসিক সত্য তাহা নহে, ইহাতে অনৈতিহাসিক ও অনৈসর্গিক অনেক কথাই আছে। সকল জাতিরই প্রাচীন ইতিহাসে ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক বৃত্তান্তের মিশ্রণ আছে, দৃষ্টান্তস্থলে লিভি, হেরোডোটাস, ফেরেস্তা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান মহাভারত আমরা যে আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এক সময়ের বা এক হস্তের রচিত গ্রন্থ নহে। মহাভারতেই উল্লিখিত আছে যে মহর্ষি বেদব্যাস প্রথমতঃ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে ভারত-সংহিতা বিরচিত করেন এবং উহাই পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান ('চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারত-সংহিতাম্' মভাঃ, আদি ১০১)। শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন এই ভারত-সংহিতাই শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং উহাই জন্মেজয়ের নিকট পঠিত হইয়াছিল। পরে উহাতে বিভিন্ন লেখকের রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়া উহার আকার প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, 'ভারত' মহাভারত হইয়াছে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান মহাভারত কেবল ভারত-যুদ্ধবিষয়ক ইতিহাস-গ্রন্থ নহে, উহা একাধারে কাব্য, ইতিহাস, বেদ-বেদান্ত-ধর্ম্ম-দর্শনাদি বিবিধ শাস্ত্রের বিপুল বিশ্বকোষ। আবার এই মহাগ্রন্থে অনেক আষাঢ়ে গল্পও প্রবেশলাভ করিয়াছে, কেননা পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্তকারগণ সকলে ঋষিও নহেন, সুনিপুণ কবিও নহেন। অনেকে শ্রীকৃষ্ণের গুণাখ্যান-মানসে অনেক উপাখ্যান রচনা করিয়া কৃষ্ণ চরিত্রের অবমাননাই করিয়াছেন—গণেশ গড়িতে বানর গড়িয়াছেন—'বিনায়কং প্রকুর্ব্বাণো রচয়ামাস বানরং।'

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

ভারত ও মহাভারত

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে খাঁটি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত যাহা আছে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। সর্ব্বত্র অধর্ম্ম রাজত্ব করিতেছিল। সে সময়ের ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মহাভারত হইতে আমরা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়াছি (১২৭-১৩১ পৃঃ দ্রঃ)। সমগ্র ভারতে একটা একত্ব স্থাপনের চেষ্টা, অসপত্ন সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস চিরকালই ভারতের শক্তিশালী রাজগণের পুণ্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ইহারই নাম রাজসূয় যজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রাচীন প্রথার অনুবর্ত্তনেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্র করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনে মনন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে প্রবল বাধা-বিঘ্নের সম্ভাবনা ছিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আপনি সম্রাট্‌তুল্য গুণশালী এবং আপনার সম্রাট্‌ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু রাজন্যবর্গের উপর আপনার অধিকার নাই, সে অধিকার আছে জরাসন্ধের। বলপূর্ব্বক রাজগণকে পরাজয় করিয়া জরাসন্ধই এখন প্রকৃতপক্ষে ভারতের সম্রাট্‌ হইয়াছেন ('তস্মাদিহ বলাদেব সাম্রাজ্যং কুরুতে হি সঃ')। আমার বোধ হইতেছে, জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনি কখনই রাজসূয়ানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।"

কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বে দুর্দ্দান্ত অসুরশক্তির আবির্ভাবে অধর্ম্মের রাজত্ব

এই জরাসন্ধ একশত রাজাকে বলিদানপূর্ব্বক এক পাশবিক যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছিল এবং তদুদ্দেশ্যে ৮৬ জন রাজাকে ধৃত ও শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছিল। পশ্চিম ভারতে মথুরায় অত্যাচারী কংস ছিল জরাসন্ধের জামাতা, মধ্যভারতে চেদিরাজ শিশুপাল ছিল তাহার দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ। পূর্ব্বাঞ্চলে শোণিতপুরের বাণ, পুণ্ড্ররাজ্যের বাসুদেব প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজগণ জরাসন্ধের অনুগত ছিল। ইহাদের ভয়ে উত্তর-ভারতের পলায়নপর রাজগণ পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ কংসকে সংহার করেন, তাহাতে জরাসন্ধ অগণিত সৈন্যসহ মথুরা অবরোধ করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণ সহ দ্বারকায় যাইয়া দুর্ভেদ্য দুর্গাদি নির্ম্মাণ করত বসতি স্থাপন করেন। এ সকল ঐতিহাসিক ঘটনা (১২৯ পৃঃ দ্রঃ)। অগণিত সৈন্যবলে এবং প্রবল মিত্রপক্ষের সহায়ে জরাসন্ধ অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে রাজা যুধিষ্ঠিরের এরূপ সৈন্যবল বা মিত্রবল ছিল না। তাঁহার বুদ্ধিবল শ্রীকৃষ্ণ, বাহুবল ভীমার্জ্জুন। পরামর্শ হইল, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন ছদ্মবেশে জরাসন্ধের নিকটে উপস্থিত হইয়া পরিচয় দিয়া তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিবেন। দ্বৈরথ-যুদ্ধে আহূত হইলে সেকালে কোন ক্ষত্রিয় যুদ্ধে বিমুখ হইতেন না।

জরাসন্ধের অত্যাচার শতরাজ-বলির আয়োজন

এই প্রস্তাবে রাজা যুধিষ্ঠির আবার প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি সাম্রাজ্য লাভ করিবার আশায় নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় কেবল সাহসমাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক কি করিয়া তোমাদিগকে তথায় প্রেরণ করি? দ্বন্দ্বযুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাস্ত করিতে পারিলেও তাহার মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় সৈন্যগণ তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে। দুষ্কর রাজসূয়ানুষ্ঠানের অভিলাষ একেবারে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।"

কিন্তু রাজসূয় পরের কথা। আশু শ্রীকৃষ্ণের প্রধান উদ্দিষ্ট কার্য্য হইতেছে রাজন্যবর্গকে আসন্ন মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার করা। তিনি বলিলেন—'বলিপ্রদানার্থ সমানীত ভূপতিগণ রুদ্রের উদ্দেশ্যে

স্নাপিত ও উৎসর্গীকৃত হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতিগৃহে বাস করিয়া অতি কষ্টে জীবনধারণ করিতেছেন। ঐ দুরাত্মা ষড়শীতিজন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দ্দশ জনের অপ্রতুল আছে, ঐ চতুর্দ্দশজন আনীত হইলে এ নৃপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। এই নিমিত্তই আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিতেছি। যদিও আমরা সেই দুরাত্মাকে যুদ্ধে সংহার করিয়া তাহার স্বপক্ষগণ কর্ত্তৃক নিহতও হই তাহা হইলেও কারাগারে আবদ্ধ রাজগণের পরিত্রাণ নিবন্ধন উত্তমা গতি লাভ করিব।"

জরাসন্ধ-বধের পরামর্শ

পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ মতই কার্য্য হইল। জরাসন্ধ দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। (১৩২—৩৩ পৃঃ)।

জরাসন্ধের নিধন এবং বিপন্ন রাজন্যবর্গের উদ্ধারের ফলে পাণ্ডবগণের খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। জরাসন্ধের অনুগত পরাক্রান্ত রাজগণ সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। পরে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন হইল। কিন্তু যজ্ঞটি একেবারে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নাই। যজ্ঞ-সভাস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অর্ঘ্য প্রদানের চিরাচরিত রীতি আছে। তদনুসারে ভীষ্মদেবের পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। শিশুপালের ইহা অসহ্য হইল। সে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিল, পাণ্ডবগণকে তিরস্কার করিল, ভীষ্মদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। কিন্তু কেবল প্রতিবাদ ও নিন্দাবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, সমবেত নৃপতিগণকে উত্তেজিত করিয়া যজ্ঞ নষ্ট করার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। কর্ম্মকর্ত্তা রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেব সমীপে আসিয়া বলিলেন, "পিতামহ, এই মহান্ রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয় তাহার উপায় বিধান করুন।" ভীষ্মদেব বলিলেন,—"যুধিষ্ঠির, ভীত হইও না। উপায় আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি। সিংহ প্রসুপ্ত হইলে কুক্কুর সমাগত ও মিলিত হইয়া চীৎকার করিয়া থাকে, কিন্তু কুক্কুর কখনও সিংহকে হনন করিতে পারে না।" তৎপর ভীষ্মদেব রাজগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে নৃপতিগণ, আমরা গোবিন্দের পূজা করিয়াছি বলিয়া তোমরা চীৎকার করিতেছ, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিতেছ না। তিনি ত সম্মুখেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাহার মরণ-কুণ্ডুতি হইয়া থাকে তিনি তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করুন না কেন, তবেই শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষা হইবে (যস্য বা ত্বরতে বুদ্ধির্ম্মরণায় স মাধবম্ কৃষ্ণমাহ্বয়তামদ্য যুদ্ধে চক্রগদাধরম্)।' একথা শ্রবণ করিয়া কি শিশুপাল স্থির থাকিতে পারে? সে গর্জ্জন করিয়া বলিল—"হে জনার্দ্দন, আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমার সহিত যুদ্ধ কর। আইস, অদ্য তোমাকে পাণ্ডবগণসহ যমালয়ে প্রেরণ করি ('আহ্বয়ে ত্বাং রণং গচ্ছ ময়া সার্দ্ধং জনার্দ্দন। যাবদদ্য নিহন্মি ত্বাং সহিতং সর্ব্বপাণ্ডবৈঃ')।

জরাসন্ধ-বধ—ফলে পাণ্ডবগণের প্রতিপত্তি-বৃদ্ধি

শ্রীকৃষ্ণ এযাবৎ একেবারে নীরব ছিলেন। এই প্রথম কথা বলিলেন, কিন্তু শিশুপালকে কিছু বলিলেন না। যুদ্ধে আহূত হইয়াছেন, আর নিরস্ত থাকিবার পথ নাই। তিনি ভূপতি-বর্গকে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে ('মৃদুপূর্ব্বমিদং বচঃ...উবাচ পার্থিবান্ সর্ব্বান্'—সভাঃ সভা ৪৫) বলিতে লাগিলেন—"এই দুরাচার আমার পিতৃস্বস্রীয় হইলেও সতত আমাদের অপকার করিয়া

থাকে। এই দুরাত্মা আমার অনুপস্থিতিতে দ্বারকাপুর দগ্ধ করিয়াছিল, আমার পিতার যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করিয়াছিল।" শিশুপালকৃত এইরূপ পূর্ব্বাপরাধসকল উল্লেখ করিয়া শেষে বলিলেন—"পিতৃস্বসার দিকে চাহিয়া এতদিন ক্ষমা করিয়াছি, আজ ক্ষমা করিব না।" এই বলিয়া তিনি যুদ্ধার্থ রথারোহণ করিলেন। "কৃষ্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া করুষরাজ প্রমুখ নৃপতিবর্গ চেদিপতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃগের ন্যায় পলায়ন করিলেন, তিনি অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যশ ও মান বর্দ্ধন করিলেন (সভা, উদ্যো)।

রাজসূয় যজ্ঞ—শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক শিশুপাল বধ—যুধিষ্ঠির সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত

অতঃপর নির্ব্বিঘ্নে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। "মহাবাহু বাসুদেব শার্ঙ্গ, চক্র ও গদা ধারণ-পূর্ব্বক আরম্ভ অবধি সমাপন পর্য্যন্ত এ যজ্ঞ রক্ষা করিলেন।" অপর সমাগত সমস্ত নৃপতিগণ যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করিলেন, এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলেন।

কিন্তু এই সাম্রাজ্যপদ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যশ্রী দুর্য্যোধনের ঈর্ষানল প্রজ্জ্বালিত করিল। মাতুল শকুনি উহাতে ইন্ধন যোগাইল। দুর্ব্বলচিত্ত ধৃতরাষ্ট্র বাহ্যতঃ ধর্ম্মকথা বলিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন। মহাভারতে রাজসূয় পর্ব্বাধ্যায়ের পরেই দ্যূত পর্ব্বাধ্যায়। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তৎকালীন ক্ষত্রিয়গণের দুইটি চিরাচরিত রীতির উল্লেখ দেখা যায়। একটি ক্ষাত্র-নীতি ছিল এই—যুদ্ধে আহূত হইলে কেহ যুদ্ধ করিতে বিমুখ হইতেন না। আমরা দেখিয়াছি, এই রীতির অনুসরণেই বিনা লোকক্ষয়ে প্রবলপ্রতাপ জরাসন্ধের সংহার এবং রাজন্যবর্গের উদ্ধার ঘটিয়াছিল। ইহা ব্যক্তিগত বীরত্ব, মহত্ত্ব ও ত্যাগের চরমাদর্শ। কিন্তু তৎকালীন আর একটি ক্ষাত্র-রীতি ছিল বড়ই অদ্ভুত—কোন ক্ষত্রিয় দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হইলেও নিবৃত্ত হইতেন না। বলা বাহুল্য, ইহা একটি ঘোরতর অনর্থকর ব্যসন। এই রীতির সুযোগ লইয়া ধূর্ত্ত শকুনির পরামর্শে দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত-ক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন—'ইহারা ভয়ঙ্কর মায়াবী কপট দ্যূতক্রীড়ক ('মহাভয়াঃ কিতবাঃ সন্নিবিষ্টা মায়োপধা')। ইহাদের সহিত দ্যূত-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে আমি ইচ্ছা করিতেছি না। আহ্বান না করিলে ইহাতে প্রবৃত্ত হইতাম না, কিন্তু যখন আহূত হইয়াছি তখন নিবৃত্ত হইব না, ইহাই আমার সনাতন ব্রত ('আহূতোঽহং ন নিবর্ত্তে কদাচিৎ তদাহিতং শাশ্বতং বৈ ব্রতং মে'—মভাঃ, সভা৫৭)।' এই সর্ব্বনাশা 'সনাতন' ব্রতের ফল—দ্যূতক্রীড়ায় পুনঃ পুনঃ পরাজয়, রাজ্যনাশ, বনবাস, কুরুসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ইত্যাদি সুবিদিত ঘটনা।

দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয়—রাজ্যনাশ, বনবাস

মহাভারতের এই অংশটির রচনা-চাতুর্য্য কাব্যাংশে অতুলনীয়, কিন্তু উহার ঐতিহাসিকতা অতি অস্পষ্ট। আমাদের স্থূলবুদ্ধিতে একটি বিষয় বড়ই রহস্যজনক বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বাপর দেখিতেছি, রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্য করেন না, তিনি স্বয়ংও ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। কিন্তু যখন হস্তিনাপুর হইতে দ্যূতক্রীড়ার আহ্বান পাইলেন এবং উহার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে নিজেও সংশয়াকুল ছিলেন, তথাপি এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং অগ্রণী হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সাম্রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত

করিলেন, কিন্তু সেই সাম্রাজ্য যখন স্বল্পকাল মধ্যেই লোপ পাইতে চলিল, দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণ যখন নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতিত হইতে লাগিলেন,—তখন পাণ্ডব-সুহৃদ্ শ্রীকৃষ্ণ কোথায়?

দুর্ব্বৃত্ত দুঃশাসন সভামধ্যে বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে অসহায়া দ্রুপদনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া অবনতমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন—

'গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব॥
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতাম্॥'

—'হে গোবিন্দ! কৌরবগণ আমার এমন অবমাননা করিতেছে, তুমি কি ইহার কিছুই জানিতেছ না? আমায় রক্ষা কর।'

সেই বিপৎকালে সভামধ্যে দ্রৌপদীর সম্ভ্রম রক্ষার পরোক্ষে একটা ব্যবস্থা মহাভারতকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শন পাণ্ডব-সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে এই সময় আমরা পাই না, পূর্ব্বে যেমন পাইয়াছি, পরেও তেমন পাইব।

ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া ভক্ত-চিত্ত ব্যথিত হয়। তবে, এসম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে কথাটি বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, একই ঘটনা অজ্ঞানে ও জ্ঞানিজনে কিরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করেন। কুন্তীদেবী হস্তিনাপুরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া পুত্রবধূ ও পুত্রগণের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা বর্ণন করিয়া অনেক কান্নাকাটি করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"পাণ্ডবগণ নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম ও রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখ-সম্ভোগে সন্তুষ্ট আছেন। সেই মহাবল-পরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হয়েন না। ধীর ব্যক্তিরা অতিশয় ক্লেশ, না হয়, অত্যুৎকৃষ্ট সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে, আর ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যবিত্তাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু উহা দুঃখের আকর, রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।"

রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান—শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য বাণী

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'রাজ্যলাভ বা বনবাস'—এ কথা আধুনিক-হিন্দু বুঝে না, বুঝিলে দুঃখ থাকিত না। যেদিন বুঝিবে সেদিন আর দুঃখ থাকিবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। অতি-আধুনিক হিন্দু উহা বুঝিয়াছে। রাজ্যলাভ বা বনবাস, বা কারাবাস—এই মহামন্ত্র মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় যেদিন ভারত-বাসী গ্রহণ করিয়া দুঃখবরণ শিক্ষা করিল, সেই দিন হইতেই ভারতের দিন ফিরিল।

মহাভারতে দেখি, সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর বনবাসকালে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সহিত তিন বার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহাতে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য কোন বিবরণ নাই। ইহার পরে পাণ্ডব সম্পর্কিত ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণকে ঘনিষ্ঠভাবে সংলিপ্ত দেখি অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে, বিরাটরাজ-ভবনে। তথায় শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের শ্বশুর দ্রুপদরাজ এবং অন্যান্য কুটুম্ব রাজগণ সমবেত হইলে পাণ্ডবরাজ্যের পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে পরামর্শ হইল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"রাজা যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় শকুনি কর্ত্তৃক যেরূপ শঠতাপূর্ব্বক পরাজিত, হৃতরাজ্য এবং বনবাসের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। পাণ্ডুপুত্রগণ পৃথিবীমণ্ডল বলপূর্ব্বক স্বায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াও কেবল সত্য-পরায়ণতা প্রযুক্ত ত্রয়োদশ বৎসর এই দুরনুষ্ঠেয় ব্রত স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহারা সত্যে স্থিত, সত্যই ইহাদের ব্রত ('শক্তৈর্ব্বিজেতুং তরসা মহীঞ্চ সত্যে স্থিতৈঃ সত্যরথৈর্যথাবৎ'—মভা, উদ্যোঃ ১)। ইহারা প্রতিজ্ঞাত সময় পালন-পূর্ব্বক সত্যের অনুসরণ করিয়াছেন ; কিন্তু কৌরবেরা ইঁহাদিগের প্রতি সতত বিপরীত ব্যবহার করিতেছেন। এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের যাহা হিতকর হয় আপনারা তাহাই চিন্তা করুন। যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন, এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করুন।"

প্রতিরোধে সমর্থ হইয়াও কেবল সত্যরক্ষার্থই পাণ্ডবগণের দুঃখবরণ

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমাবধিই সন্ধির পক্ষপাতী

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-শিষ্য মহাবীর সাত্যকির এ কথা ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন—'মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী হইয়াছেন, অথচ পাপাত্মারা সতত কহিয়া থাকে, পাণ্ডবেরা ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যেই পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। তাঁহাদের রাজ্যাপহরণ-বাসনা নাই কিরূপে বলা যাইবে ? কি নিমিত্ত তিনি পৈতৃক-রাজ্য অধিকারার্থ প্রার্থনা করিতে যাইবেন ? হয় আজি কৌরবগণ সম্মানপূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার পৈতৃক রাজ্য প্রদান করুক, নতুবা তাহারা আমাদিগের শরজালে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া ধরাশায়ী হউক। আমি স্বীয় শরনিকরে সেই দুরাত্মাদিগকে বশীভূত করিয়া ধর্ম্মরাজের চরণে পাতিত করিব, সন্দেহ নাই।" সাত্যকি শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ, পাণ্ডবপক্ষীয়গণের মধ্যে অর্জ্জুন ও অভিমন্যুর পরেই তাঁহার নাম। সুতরাং ইহা কেবল বৃথা দম্ভোক্তি নহে, তাঁহার বাক্যও যুক্তিযুক্ত, ক্রোধও মার্জ্জনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধের অতীত, দুষ্টের দণ্ডদাতা হইলেও ক্ষমাগুণের পূর্ণাদর্শ, কৌরব-পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই হিতৈষী, তাই তিনি প্রথমেই সন্ধির প্রস্তাবই উত্থাপন করিলেন। বৃদ্ধ দ্রুপদ-রাজও সাত্যকির মতাবলম্বী। তিনি বলিলেন—"সুহৃদ্‌ভাবে মিষ্টকথা বলিলে দুর্য্যোধন কদাচ রাজ্য দিবে না ('নহি দুর্য্যোধনো রাজ্যং মধুরেণ প্রদাস্যতি)।' দুরাত্মাকে সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করা একান্ত অবিধেয়, মৃদুতা অবলম্বন করিলে সে বশীভূত হইবে না। যে তাহার সহিত সান্ত্ব (সামনীতিসম্মত) ব্যবহার করে, সে তাহাকে শক্তিহীন বলিয়া বোধ করে। অতএব এক্ষণে আমাদের সৈন্যসংগ্রহ করা এবং সত্বর মিত্রগণের নিকট দূত প্রেরণ করা আবশ্যক। তবে দুর্য্যোধনের নিকটও সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত প্রেরণ করা হউক। কিন্তু অগ্রেই আমরা সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করি।

একথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—দ্রুপদরাজ পাণ্ডবরাজের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যে প্রস্তাব করিলেন তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু কুরু ও পাণ্ডবগণের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ ; যদি দুর্য্যোধন ন্যায়তঃ সন্ধিস্থাপন করে, তাহা হইলে আর কুরুপাণ্ডবের সৌভ্রাত্রনাশ বা কুলক্ষয় হয় না। যদি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহা না করে, তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে

আহ্বান করিবেন।" এ কথার তাৎপর্য্য এই বুঝা যায় যে, এ যুদ্ধে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ নাই, যুদ্ধ যাহাতে না ঘটে সেই জন্যই সচেষ্ট। দুর্য্যোধন দুরাচার হইলেও তিনি কুরুপাণ্ডবে সমদর্শী এবং যুদ্ধে পক্ষাবলম্বন করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে এই কথাই প্রমাণিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ কুরু-পাণ্ডবে সমদর্শী

এদিকে উভয়পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অর্জ্জুন দ্বারকায় আসিলেন। দুর্য্যোধনও সেই উদ্দেশ্যে একদিনেই এক সময়েই তথায় উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি এ যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না। তিনি কিরূপে, উভয় পক্ষের সমতা রক্ষা করিয়া উভয়কেই তুষ্ট করিলেন তাহা মহাভারত হইতে বিস্তারিত এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে (১২৩-১২৪ পৃঃ দ্রঃ)।

ওদিকে দ্রুপদ-রাজের পরামর্শানুসারে তাহার পুরোহিত ঠাকুরকে সন্ধির প্রস্তাব সহ ধৃতরাষ্ট্র সভায় প্রেরণ করা হইল। পুরোহিত ঠাকুর কোন যুক্তি-তর্কের অবতারণা না করিয়া স্পষ্টতঃ বলিলেন—"পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতেছেন, কিন্তু লোকহিংসা ব্যতিরেকে ন্যায্য অংশ লাভ করাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। আপনারা তাঁহাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করুন, এখনও ইহার কাল অতীত হয় নাই।" রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"ইহা বেশ ভাল কথা, আমি পাণ্ডবদিগের নিকট অমাত্য সঞ্জয়কে প্রেরণ করিতেছি।"

পুরোহিত ধৌম্যের দৌত্য

সঞ্জয় যে দৌত্যগিরি লইয়া আসিলেন, তাহা বাস্তবিক সন্ধির প্রস্তাব নয়। কৃষ্ণার্জ্জুনকে ধৃতরাষ্ট্রের বড় ভয় (১২৪-১২৫ পৃঃ দ্রঃ), যুধিষ্ঠির যাহাতে যুদ্ধ না করেন মিষ্ট কথায় এই অনুরোধ। তিনি বলিলেন—"অর্জ্জুন, বাসুদেব, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একমাত্র দুর্য্যোধনের অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া যেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ না করেন, যাহাতে যুদ্ধানল প্রজ্জলিত না হয়, হে সঞ্জয়, তুমি রাজগণ মধ্যে সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবে।" সঞ্জয় পাণ্ডব-সভায় আসিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায়ানুসারে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিলেন তাহা এই—"হে ধর্ম্মরাজ! আপনার সমুদয় কার্য্য ধর্ম্মানুগত বলিয়া লোকমধ্যে বিশ্রুত ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব আপনি ক্রোধভরে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইবেন না। কৌরবগণ বিনা যুদ্ধে আপনাকে রাজ্য প্রদান করিবেন না। কিন্তু আমার মতে যুদ্ধে রাজ্যলাভ করা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদরপূর্ত্তি করাও শ্রেয়স্কর। বিবেচনা করিয়া দেখুন, মনুষ্যের জীবন ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখময়। বিশেষতঃ আপনি যেরূপ যশস্বী, কুরুকুলের হিংসা করা আপনার বিধেয় নহে। আপনি এই পাপানুষ্ঠানে বিরত হউন। যুদ্ধ হইলে দুর্য্যোধনের সহিত ভীষ্মদ্রোণাদি সকলকে বিনাশ করিতে হইবে। তাহা হইলে আপনার কি সুখলাভের সম্ভাবনা? অতএব যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করুন, জ্ঞাতিবধরূপ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইবেন না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

সঞ্জয়ের দৌত্য

আমরা ন্যায্য রাজ্যাংশ দিব না, কিন্তু তোমরা যুদ্ধ করিও না, উহা বড় অধর্ম্ম!

ধর্ম্মরাজ বলিলেন—"আমি তো যুদ্ধের অভিলাষী নহি, সন্ধিরই প্রয়াসী। যাহা হউক, মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মফলপ্রদাতা, নীতি ও কর্ম্মনিশ্চয়জ্ঞ, উনিই বলুন যে আমি যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই তবে জ্ঞাতিবধ জন্য নিন্দনীয় হই, আর যদি নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়, এ স্থলে আমার কি কর্ত্তব্য?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে সঞ্জয়, আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ,

সমৃদ্ধি ও হিত এবং ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধি-সংস্থাপন হয়, ইহাই আমার অভিপ্রায়। আমি ইহা ব্যতীত তাঁহাদিগকে অন্য পরামর্শ প্রদান করি না। কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ অতিশয় স্বার্থলোভী। সুতরাং সন্ধি-সংস্থাপন হওয়া দুষ্কর। মহারাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্ম্ম-সাধনোদ্যত, উৎসাহসম্পন্ন, স্বজনপরিচালক রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে? এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্ম্ম-পালন ও কর্ম্ম-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, উহার কিয়দংশ এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে (১২০-১২১ পৃঃ দ্রঃ)।

সন্ধিবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহ

অন্যথায় যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের অভিমত

শ্রীগীতায় দেখি, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে 'ধর্ম্মসংমূঢ়' অর্জ্জুন 'জ্ঞাতিবধজনিত পাপপঙ্কে নিমগ্ন হওয়া অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তিও শ্রেয়স্কর' ইত্যাদি 'ধর্ম্মকথা' বলিয়া অস্ত্রত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অপূর্ব্ব ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশদ্বারা তাঁহার মোহ অপনোদন করেন। এস্থলেও সঞ্জয়ের অনুরূপ 'ধর্ম্মকথার' উত্তরে সেই ধর্ম্মতত্ত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহাভারতের বিভিন্ন স্থলে শ্রীকৃষ্ণোক্তিতে সর্ব্বত্রই গীতোক্ত ধর্ম্মাদর্শই উপদিষ্ট এবং মহাভারতে বর্ণিত তাঁহার লীলায়ও সেই কর্ম্মাদর্শই পরিস্ফুট।

শ্রীগীতোক্ত ধর্ম্মাদর্শের উপদেশ

শ্রীকৃষ্ণ পরে সঞ্জয়কে কিছু সঙ্গত তিরস্কার করিলেন। তিনি কহিলেন—"হে সঞ্জয়, তোমরা এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ। কিন্তু ভীষ্ম প্রভৃতি সকলেই পাণ্ডবপত্নী দ্রুপদ-নন্দিনীকে সভামধ্যে বাষ্পাকুল লোচনে রোদন করিতে দেখিয়াও উপেক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অন্যায় ও গর্হিত হইয়াছে। তাঁহারা যদি আবালবৃদ্ধ সকলে সমবেত হইয়া এই অত্যাচার নিবারণ করিতেন তাহা হইলে আমার এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণেরও একান্ত প্রিয়ানুষ্ঠান হইত। দুরাত্মা দুঃশাসন যৎকালে সভামধ্যে শ্বশুরগণ সমক্ষে দ্রৌপদীকে আনয়ন করিল তখন একমাত্র বিদুর ব্যতিরেকে সভাস্থ আর কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।"

কুরুবৃদ্ধগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গত তিরস্কার

তৎপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থহানি না হয় এবং কৌরবেরাও সন্ধিস্থাপনে সম্মত হন এক্ষণে তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে। আমি এই বিপদ্বহ কার্য্য করিবার জন্য হস্তিনাপুরে গমন করিব। তাহা হইলে সুমহৎ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় এবং কৌরবগণ মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

সন্ধিস্থাপনে শ্রীকৃষ্ণের শেষ প্রচেষ্টা স্বয়ং হস্তিনায় গমন

লোকহিতার্থ, লোকক্ষয় নিবারণার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপযাচক হইয়া এই সুদুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। মনুষ্যশক্তিতে ইহা 'বিপদ্বহ' অর্থাৎ ইহাতে বিপদ ঘটিতে পারে, কেননা পাণ্ডবেরা তাঁহাকে যুদ্ধে বরণ করিয়াছেন, সুতরাং কৌরবেরা তাঁহার সহিত শত্রুবৎ আচরণ করিতে পারে। বলা বাহুল্য, মায়া-মানুষ মানবধর্ম্মশীল; মানবীয় ভাবেই এ সকল কথা বলিতেছেন এবং লীলা করিতেছেন ('মনুষ্যধর্ম্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ'—বিষ্ণুপুঃ); নচেৎ লোকশিক্ষা হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার অভ্যর্থনার্থ বিপুল আয়োজন-উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। উচ্চতর ধ্বজাপতাকা সকল উত্থাপিত হইল, রাজমার্গ জলসিক্ত হইল, পরম রমণীয় সভাগৃহসমূহ নির্ম্মিত হইল, তাঁহাকে উপঢৌকন দিবার জন্য হস্ত্যশ্ব-রথ ও মণিমাণিক্য সংগৃহীত হইল।

"কিন্তু মহাত্মা কেশব সেই সকল সভাগৃহ ও রত্নজাতের প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া কুরু-সভায় গমন করিলেন।" সভাস্থ ব্যক্তিগণের যে যেমন যোগ্য তাঁহার সঙ্গে সেইরূপ সৎসম্ভাষণাদি করিয়া সম্বন্ধোচিত পরিহাস ও কথোপকথনাদি করিতে লাগিলেন। পরে সেই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি মহাত্মা বিদুরের কুটীরে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার পিতৃষ্বসা পাণ্ডব-জননী কুন্তীদেবী থাকিতেন। দীনবন্ধু সেই দীনভবনে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ ও বিদুরে অনেক কথোপকথন হইল। বিদুর তাঁহাকে বলিলেন—"আপনার কৌরবরাজ্যে আগমন করা উচিত হয় নাই। এ দুরাত্মা কখনই আপনার শ্রেয়স্কর বাক্য গ্রহণ করিবে না। দুর্য্যোধনাদি অশিষ্টগণের মধ্যে আপনার গমন করা এবং তাহাদের ইচ্ছার বিপরীত বাক্য প্রয়োগ করা আমার মতে শ্রেয়স্কর নহে।"

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহা অমূল্য। সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।— "হে বিদুর, যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বান্ধবকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নবান্ না হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে নৃশংস বলিয়া কীর্ত্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইবেন। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিভেদ সময়ে সৎপরামর্শ প্রদান না করে, সে কখনও আত্মীয় নহে। যদি তিনি আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার প্রতি শঙ্কা করেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। প্রত্যুত আত্মীয়কে সদুপদেশ প্রদান করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন নিমিত্ত পরম সন্তোষ ও আনৃণ্য লাভ হইবে। আমি শান্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হইলেও মূঢ়গণ বা আত্মীয়গণ বলিতে পারিবে না যে কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও এই অনর্থ নিবারণ করিল না।"

সন্ধির প্রচেষ্টা বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য কথা

"যিনি অশ্ব-কুঞ্জর-রথ-সমবেত বিপর্য্যস্ত পৃথিবীকে মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়।"

বর্ত্তমান যুগেও ট্যাঙ্ক-টর্পেডো-বোমাবিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত পৃথিবীর প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা প্রত্যক্ষই পাইয়াছি। ঈদৃশ ধ্বংসলীলার নিবারণোদ্দেশ্যেই কুরু-সভায় শ্রীকৃষ্ণের গমন। তিনি পাঁচখানি মাত্র গ্রাম পাইলেও শান্তিস্থাপনে প্রস্তুত ছিলেন।

পরদিন মহতী সভার অধিবেশন। দেবর্ষি নারদ, ব্রহ্মর্ষি জামদগ্নি প্রভৃতিও সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরম বাগ্মিতার সহিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সন্ধিস্থাপনের কর্ত্তব্যতা বুঝাইতে লাগিলেন। ঋষিগণও তদ্রূপ করিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—'আমি স্বাধীন নহি; আমার ইচ্ছামত কোন্ কার্য্য হয় না। আপনারা দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে শান্ত

সন্ধির সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল

করিতে চেষ্টা করুন।" তৎপর শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি দুর্য্যোধনকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন। মহাভারতে বর্ণিত এই সকল বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা সঙ্কলন করিলে একখানি সুবৃহৎ সারগর্ভ নীতি-শাস্ত্র হয়। কিন্তু দুর্য্যোধন নীতিকথা শুনিবার লোক নহেন। তিনিও শাস্ত্র উদ্ধৃত করিতে ত্রুটি করিলেন না; কহিলেন, "মতঙ্গ মুনি বলিয়াছেন—'বরং মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়া যাইবে তবু ইহ জীবনে কাহারও নিকট নত হইবে না (অপ্যপর্ব্বণি ভজ্যেত ন নমেদিহ কস্যচিৎ)'। উহাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। বরং যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব, জীবন থাকিতে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও পাণ্ডবগণকে প্রদান করিব না।"

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বৃদ্ধগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক একটি হিতকরী স্পষ্টোক্তি করিয়া সভাত্যাগ করিলেন। তিনি বলিলেন—"আপনারা কুরুবৃদ্ধগণ ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত দুরাচার দুর্য্যোধনকে শাসন না করিয়া নিতান্ত অন্যায়াচরণ করিতেছেন ('সর্ব্বেষাং কুরুবৃদ্ধানাং মহানয়মতিক্রমঃ,' মভাঃ উদ্যোঃ)। দশজনকে রক্ষা করিবার জন্য আবশ্যক হইলে একজনকে বধ করিতে হয়। দেখুন, আমি জ্ঞাতিবর্গের হিতার্থে স্বীয় মাতুল অত্যাচারী কংসকে সমরে সংহার করিতে বাধ্য হইলাম। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য আমি তাহা প্রায় স্থির করিয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিলে শ্রেয়লাভ হইতে পারে।" শেষে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"হে রাজন্, দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করুন। আপনার দোষে যেন ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল না হয়।"

কুরুবৃদ্ধগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্টোক্তি

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক উপপ্লব্যনগরে পাণ্ডবগণ সমীপে গমন করিলেন। কুন্তীদেবীকে বলিলেন—কালবশে দুর্য্যোধনের অনুগত সকলেরই শেষ দশা সমুপস্থিত হইয়াছে, ইহারা কালপক্ক হইয়াছে ('কালপক্কমিদং সর্ব্বং সুযোধনবশানুগম্'—মভা উদ্যোঃ ১৩২)।

মহাভারতীয় এই উদ্যোগ পর্ব্বের প্রধান নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি প্রথমাবধিই তাঁহার প্রচেষ্টা, যুদ্ধোদ্যোগে নহে, সন্ধির উদ্যোগে। এইজন্য তিনি পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক যুদ্ধে বৃত হইয়াও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ং হস্তিনাপুরে আসিলেন। তিনি জানিতেন, এই দৌত্যকার্য্যে সিদ্ধিলাভ হইবে না, তথাপি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য, তাহা সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া ফলাফলে অনাসক্ত থাকিয়া করিতে হইবে, ইহা তাঁহারই উপদেশ। হস্তিনায় গমনের পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন—"দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। ইহা জানিয়া যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় সে কর্ম্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত বা কর্ম্মসিদ্ধি হইলে সন্তুষ্ট হয় না। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু দৈবের উপর আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।"

অবশ্যকর্ত্তব্য-বোধে সন্ধির প্রচেষ্টা

সন্ধির সকল প্রচেষ্টা যখন বিফল হইল, তখন যুদ্ধই একমাত্র অনুষ্ঠেয় অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া ('সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা') যুদ্ধ করিতেই উপদেশ দিলেন। কর্ত্তব্য-বিমূঢ় বিমনস্ক অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'। স্বয়ং পার্থ-সারথিরূপে যুদ্ধের নায়কতা করিয়া ক্ষত্রিয়কুলনিধনে ব্রতী হইলেন।

অবশ্য-কর্ত্তব্য-বোধে যুদ্ধেরও প্রেরণা

কেন এই ধ্বংসলীলা ? পাণ্ডবগণের রাজ্যলাভই মুখ্য কথা নহে, উহা উপলক্ষ্য মাত্র, মূল কথা হইতেছে, সমাজরক্ষা—লোকরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা। রজোগুণপ্রধান দম্ভমানমদান্বিত ক্ষাত্রতেজ যদি সত্ত্ব-সংযুক্ত না হয় তবে উহা ভয়াবহ হইয়া উঠে। সময় সময় পৃথিবীর বহুলাংশে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ক্ষাত্র-শক্তি উদ্দীপ্ত হইয়া ধ্বংসলীলা আরম্ভ করে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন—এই সকল অহিতকারী, ক্রূরকর্ম্মা অসুরগণ জগতের ক্ষয়ের জন্যই আবির্ভূত হয় ('প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ—গীঃ ১৬।৯)। কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বে ভারতে এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতিকে নিধন করিয়া এবং রাজসূয়-যজ্ঞোপলক্ষে অন্যান্য অত্যাচারী নৃপতিগণকে রাজা যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করাইয়া দেশে অনাবিল শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পাণ্ডবগণের বনবাসকালে এই নৃপাসুরগণ পুনরায় দুরাচার দুর্য্যোধনের পতাকাতলে মিলিত হইলেন। এই সম্মিলিত মিত্রশক্তির সাহায্য লাভ করিয়া মদমত্ত দুর্য্যোধন দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠেন এবং সন্ধির সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। এই উদ্দীপ্ত প্রচণ্ড ক্ষাত্র-শক্তিকে নির্ম্মূল না করিলে ভারতে শান্তি স্থাপিত হইত না, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইত না, শ্রীকৃষ্ণের আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত থাকিত।

এ ধ্বংসলীলা কেন—লোকরক্ষার্থ, ধর্ম্মরক্ষার্থ

শান্তি স্থাপনের অন্য একমাত্র উপায় ছিল কুরু-পাণ্ডবে সন্ধি স্থাপনপূর্ব্বক মৈত্রীবদ্ধ যুক্ত কুরু-পাণ্ডব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া উচ্ছৃঙ্খল উৎপথগামী নৃপতিগণকে স্বায়ত্ত করা। মহানীতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ঠিক এইরূপ প্রস্তাবই উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"রাজন্, কুরুকুলে ঘোরতর আপদ্ সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনি ইহাতে উপেক্ষা করিলে ইহা পরিশেষে সমস্ত পৃথিবী বিনষ্ট করিবে। ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপালেরা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়াছেন। আপনি ইহাদিগকে মৃত্যুপাশ হইতে রক্ষা করুন, প্রজাকুল রক্ষা করুন। কুরুপাণ্ডবের শান্তি আপনার ও আমার অধীন। আপনি আপনার পুত্রগণকে শান্ত করুন, আমি পাণ্ডবগণকে নিরস্ত করিব। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে সতত ধর্ম্মপথাবলম্বী বলিয়া জানিবেন। তিনি স্বপ্রভাবে সমস্ত ভূপতিগণকে বশীভূত করিয়া আপনারই অধীন করিয়াছিলেন, আপনার মর্য্যাদা কখনই অতিক্রম করেন নাই। কৌরবগণ আপনার সহায় আছে, এক্ষণে পাণ্ডবগণকে সহায় করুন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ মিলিত হইলে আপনি অনায়াসে সমগ্র লোকের অধীশ্বরত্ব ও অজেয়ত্ব লাভ করিতে পারিবেন। স্বীয় পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণসহ পাণ্ডবগণের অর্জ্জিত ভূমিও ভোগ করিতে পারিবেন।" মভাঃ, উদ্যোঃ ১৪।

এমন সুসঙ্গত হিতকর প্রস্তাবেও কোন ফল হইল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীকে বলিয়াছিলেন, ইহারা সকলেই কালপক্ক হইয়াছে। এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তিনিই সেই লোকক্ষয়করী কালরূপে প্রকট হইলেন—'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ'—গীঃ—১১।১০।

কুরুক্ষেত্রে তিনি লোকক্ষয়করী কাল

ইহাই কুরুক্ষেত্রের অর্থ। ইহাই মহাভারতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ অবতারের উদ্দিষ্ট কর্ম্ম—সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ—ধর্ম্ম-সংরক্ষণ। ধর্ম্ম-সংরক্ষণের অন্য একটি দিক্ও আছে—সেটি গীতাজ্ঞান-প্রচার।

গীতার শ্রীকৃষ্ণ

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপক, গীতার শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব ধর্ম্মোপদেষ্টা, ধর্ম্ম-সংস্কারক। এই সময়ে অত্যাচারী নৃপাসুরগণের আবির্ভাবে রাষ্ট্রক্ষেত্রে যেমন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, পরস্পর-বিরোধী মতবাদের আবির্ভাবে ধর্ম্মক্ষেত্রেও গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। বহু উপধর্ম্ম-অপধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল, বিবিধ দার্শনিক মতবাদের বাগ্-বিতণ্ডার মধ্যে সত্য-নির্ণয় দুঃসাধ্য হইয়াছিল। অসংখ্য আখ্যান-উপাখ্যান-সমন্বিত মহাভারত গ্রন্থখানি বিচার-বুদ্ধিসহ অধ্যয়ন করিলে এই সকল বিভিন্ন মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু কোন্‌টি গ্রাহ্য কোন্‌টি ত্যাজ্য তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না। (মভাঃ-শাং, ৩৫৩, ৩৫৪, অশ্ব ৪৯)। প্রধানতঃ বৈদিক কর্ম্মযোগ, বৈদান্তিক জ্ঞানযোগ, কাপিল সাংখ্যমত ও পাতঞ্জল রাজযোগ, এই সকল মত তৎকালে সুপ্রতিষ্ঠ ছিল। এ সকলের মধ্যে ভক্তির কোন প্রসঙ্গ নাই। বস্তুতঃ শ্রীগীতার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে ভক্তি শব্দটি পারিভাষিকরূপে কোথায়ও ব্যবহৃত দেখা যায় না অর্থাৎ ভক্তিযোগ বলিয়া কোন বিশিষ্ট সাধনপ্রণালী তৎকালে প্রচলিত ছিল না। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ এই সকল প্রাচীন মতের যাহা সারতত্ত্ব তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার সহিত ভক্তি সংযুক্ত করিয়া একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন, এইরূপে সনাতন ধর্ম্মের সংস্কার সাধিত হইয়াছে। এ বিষয়ে গ্রন্থমধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এই ধর্ম্ম-সংস্কারের প্রয়োজন হইল কেন, প্রাচীন ধর্ম্মে কি ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অভাব ছিল, সে বিষয়ে কয়েকটি কথা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

ধর্ম্মক্ষেত্রে গ্লানি—পরস্পর-বিরোধী মতবাদের উদ্ভব

(১) শাস্ত্রে আছে, সনাতন-ধর্ম্ম বেদমূলক। বেদের দুইভাগ—কর্ম্মকাণ্ড (বেদ-সংহিতা) ও জ্ঞানকাণ্ড (উপনিষৎ)। কর্ম্ম ও জ্ঞান—এ দুইএর মধ্যে আবার বিষম বিরোধ পূর্ব্বাবধিই চলিতেছিল। তাহা হইলে সনাতন-ধর্ম্ম কর্ম্মমূলক, না জ্ঞানমূলক? কোন্‌টি সত্য? শ্রীগীতা এই বিরোধ ভঞ্জন করিয়া বলিয়াছেন—উভয়ই সত্য। এ কথাটি পরে স্পষ্টীকৃত হইবে।

কর্ম্মকাণ্ডাত্মকবেদ-অবলম্বনে পুরাকালে ত্রিবিধ সূত্রগ্রন্থসকল প্রণীত হইয়াছিল—শ্রৌত সূত্র (যজ্ঞের বিবরণ), গৃহ্যসূত্র (গৃহ্য অনুষ্ঠানসমূহের বিবরণ), এবং ধর্ম্মসূত্র (পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা)। কালে কালে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনহেতু ধর্ম্মসূত্রগুলির নানারূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া মন্বাদি বিবিধ ধর্ম্ম-সংহিতাসকল প্রণীত হয়, ইহাই স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্র। প্রত্যেক সনাতনধর্ম্মীর এই সকল শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম কর্ত্তব্য, কেননা এ সকল বেদমূলক। ধর্ম্ম বেদমূলক, এ কথার ইহাই অর্থ।

বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বিবিধ যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে, এবং এই সকল বিহিত প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইলে ইহলোকে ভোগৈশ্বর্য্য ও পরলোকে স্বর্গলাভ হয় এইরূপ ফলশ্রুতিও আছে। কালক্রমে এইরূপ একটি মত প্রবল হইয়া উঠে যে, বেদের কর্ম্মকাণ্ডই সার্থক, যজ্ঞই একমাত্র ধর্ম্ম, উহাতেই পরম নিঃশ্রেয়স, ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া কিছু নাই। ইহা অপধর্ম্ম, বেদের অপব্যাখ্যা, সনাতন ধর্ম্মের গ্লানি, সন্দেহ নাই। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ এই কর্ম্মবাদিগণকেই 'বেদবাদরতাঃ' 'নান্যদস্তীতিবাদী' ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই মতের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

তবে কি বেদোক্ত এই সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে?—না, তাহা নহে, বেদবিহিত কর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত ভাবে ধরিলে ত্যাগ, সংযমশিক্ষা, চিত্তশুদ্ধি; সমষ্টিগত ভাবে ধরিলে লোকস্থিতি, জগতের হিত (২১০-২১১ পৃঃ, অপিচ গীঃ ৩।১০—১৩ দ্রঃ)।

কাম্যকর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম ত্যাজ্য, কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে

শ্রীভগবান্ বলিলেন—যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে, কর্ত্তব্য; কিন্তু ঐ সকল কর্ম্মও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে করিতে হইবে, ইহাই আমার মত (গীঃ ১৮।৫-৬)। ইহকালে ভোগৈশ্বর্য্য ও পরকালে উর্ব্বশী পারিজাতাদির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে কিরূপে, আর তাহাতে লোকহিতই বা সাধিত হইবে কিরূপে?

এইরূপে শ্রীগীতা কাম্যকর্ম্মাত্মক বৈদিক ধর্ম্মের সংস্কার সাধনপূর্ব্বক উহার গ্লানি দূর করিলেন।

(২) সনাতন ধর্ম্ম বেদমূলক, একথার অপর অর্থ এই যে, বেদের উপনিষৎ ভাগে বা বেদান্তে যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, উহাই এই ধর্ম্মের মূল। বেদান্তের ব্যাখ্যায় মতভেদহেতু বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু বেদান্ত সকল সম্প্রদায়েরই মান্য। বেদান্তের ব্যাখ্যায় একটি দার্শনিক মত বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, উহা মায়াবাদ (৪ পৃঃ দ্রঃ)। এই সৃষ্টি, এই জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা, মায়ার বিজৃম্ভণ, সংসারের যে কর্ম্মকুহক উহা মায়া বা অজ্ঞান-প্রসূত।

সন্ন্যাসবাদ নিরসন জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয় শিক্ষা

আলো ও অন্ধকার যেমন একত্র থাকিতে পারে না সেইরূপ কর্ম্ম ও জ্ঞানে সমুচ্চয় সম্ভবেনা। কর্ম্মত্যাগ না করিলে জ্ঞান বা মোক্ষলাভ সম্ভবপর নয়, সংসারে থাকিলে কর্ম্মত্যাগও সম্ভবপর নয়; সুতরাং সংসার-ত্যাগ বা সন্ন্যাসই মোক্ষলাভের একমাত্র পথ। বলা বাহুল্য, এই সন্ন্যাসবাদ সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইলে বিশ্বময়ের বিশ্ব-লীলারই লোপ হয়। শ্রীভগবান্ এই সন্ন্যাসবাদের প্রতিবাদ করিয়া জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়মূলক নিষ্কাম কর্ম্মযোগ শিক্ষা দিয়াছেন (১৭৬-১৭৮ পৃঃ দ্রঃ)। এইরূপে শ্রীগীতা-প্রচারে শ্রীভগবান্ প্রচলিত ধর্ম্মের আর একটি ত্রুটির নিরাকরণ করিয়াছেন।

(৩) বৈদিক কর্ম্মযোগে বা বৈদান্তিক জ্ঞানযোগে ভক্তির প্রসঙ্গ নাই। ভক্তের ভগবান্ বলিয়া কোন পরতত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু শ্রীগীতা আদ্যোপান্ত ঈশ্বরবাদ ও ভক্তিবাদে সমুজ্জ্বল। শ্রীগীতা কর্ম্ম ও জ্ঞানের সহিত ভক্তির সমন্বয় করিয়া পূর্ণাঙ্গ যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মে ভক্তিবাদের আবির্ভাবে উহার পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে (১৭৬-১৮০ পৃঃ দ্রঃ)।

জ্ঞান ও কর্ম্মের সহিত ভক্তির সমন্বয়ে ধর্ম্মের পূর্ণতা সাধন

গীতোক্ত ধর্ম্মে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির যে সমন্বয় করা হইয়াছে তাহার মূলে যে দার্শনিক বিচার-বিতর্ক আছে, তাহা সকল পাঠকের বোধগম্য হইবে না। সহজ কথায় তত্ত্বটি এইরূপে বিশদ করা যায়।—

জ্ঞানযোগ ও রাজ-যোগের দার্শনিক ভিত্তি, মায়াবাদ—দুঃখবাদ

এই সৃষ্টিকে, এই জগৎ-প্রপঞ্চকে যদি আমরা মায়া-মরীচিকা মনে করি, সংসারে জন্মটাই অপার দুঃখের কারণ মনে করি, জীবনটা যদি প্রকৃতই স্বপ্নবৎ অলীক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই সংসার হইতে আমরা দূরে চলিয়া যাইতেই চাহিব, জগতের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া এ সকলের অতীত অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য কোন-কিছুর মধ্যে মিশাইয়া যাওয়াই পরম নিঃশ্রেয়স মনে করিব।

ইহাই যাঁহাদিগের মত তাঁহাদিগের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনপথও তদনুরূপ—জ্ঞানযোগ যাহাতে ব্রহ্মসিদ্ধি বা রাজযোগ যাহাতে কৈবল্য-সিদ্ধি। ইহাদের লক্ষ্য আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি। দার্শনিক পরিভাষায় ইহাকেই মায়াবাদ, দুঃখবাদ ইত্যাদি বলা হয়।

অপর পক্ষে, যদি আমরা মনে করি যে এই জীবন মিথ্যা-মায়া নয়, জীবন স্বপ্ন নয়, সংসার কেবল দুঃখের আগার নয়, জগৎ সত্য, জীবন সত্য, জগতে সচ্চিদানন্দেরই প্রকাশ, সেই সৎস্বরূপের সত্তায়ই আমাদের সত্তা, সেই চিৎস্বরূপের চিতিতেই আমাদের চেতন, সেই জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞানেই আমাদের জ্ঞান, সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দেই আমাদের রসানুভূতি, সেই প্রেমস্বরূপের প্রেমেই আমাদের প্রেমানুভূতি—জীবের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, জ্ঞানবুদ্ধি, স্নেহ-প্রীতি, রসানুভূতি সকলই তাঁহা হইতে, ইহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তবে জীবন অস্বীকার করিব না, জীবন অঙ্গীকার করিয়াই উহাকে সার্থক করিবার প্রয়াস পাইব; কর্ম্মে, জ্ঞানে, প্রেমে সেই সচ্চিদানন্দের দিকেই অগ্রসর হইব (২১৪ পৃঃ দ্রঃ)।

ঈশ্বর, জীব, জগৎ সম্বন্ধে এইরূপ যে মত তাহাকেই পরিণামবাদ বলে। এই দার্শনিক তত্ত্বের উপর যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত তাহাই ভাগবত ধর্ম্ম, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি-মিশ্র গীতোক্ত যোগধর্ম্ম।

গীতোক্ত উচ্চতম ভক্তিবাদ

এস্থলে 'জ্ঞান' অর্থ সর্ব্বভূতে ভগবৎসত্তার অনুভব, সর্ব্বভূতে ভগবান্ আছেন এই জ্ঞান, পরোক্ষ জ্ঞান নহে,—প্রত্যক্ষ অনুভূতি। ইহা যাঁহার হইয়াছে তাঁহার কর্ম্ম হয় সর্ব্বভূতের সেবা—দয়া নয়, সেবা, আর তাঁহার ভক্তি হয় সর্ব্বভূতে প্রীতি। ভগবদ্ভক্তি ও ভূত-প্রীতি এক হইয়া যায়। এরূপ উচ্চতম ভক্তিবাদ জগতের ধর্ম্ম-সাহিত্যে আর কোথাও দেখা যায় না।

শ্রীগীতা ও শ্রীভাগবতে ভাগবতধর্ম্ম বর্ণন প্রসঙ্গে এ সকল কথা সর্ব্বত্রই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

'সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ' (১৯১ পৃঃ)
'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ' (২৪৩ পৃঃ)
'মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্‌কায়বৃত্তিভিঃ' (২২৫ পৃঃ)
'মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্' (২২৫ পৃঃ)
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ ভূমাবশ্বচাণ্ডাল গোখরম্। (২২৫ পৃঃ)
'অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্' (১৯২ পৃঃ)
'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি' (গীঃ ৬।৩০)
'সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে' (গীঃ ৫।৭)
'যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি' (গীঃ ৪।৩৫)
'মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ' (২২৫ পৃঃ, ভাঃ ১১।১৯।২১)

এ সকল শাস্ত্রবাক্য বেদান্তমূলক, 'এ সমস্তই ব্রহ্ম' ('সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'), এই বেদান্ত-বাক্যের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা বা ভক্তির বেদান্তমূলক ব্যাখ্যা। ইহা ব্যবহারিক বেদান্ত। তাই শ্রীভাগবতে দেখি, শ্রীভগবান্ প্রিয়শিষ্যকে এই ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া শেষে বলিলেন—'আমি

তোমাকে যে ধর্মোপদেশ দিলাম ইহাতে ব্রহ্মবাদের সারকথা আছে ('ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ' ২২৫ পৃঃ, ভাঃ ১১।২৯)। তাই শ্রীশুকদেব এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইহা ভক্তিরূপ আনন্দ সমুদ্রের সহিত একীকৃত জ্ঞানামৃত ('এতদানন্দসমুদ্রসংভৃতং জ্ঞানামৃতং'—২২৬ পৃঃ দ্রঃ) এবং এই ধর্ম্মের যিনি উপদেষ্টা সেই পরমপুরুষের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত স্তুতিবাক্যে এই ধর্ম্মোপদেশ প্রকরণ সমাপন করিয়াছেন —

নিগমকর্ত্তা আদি-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই বেদান্ত-মূলক ভাগবত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক

'যিনি বেদসাগর হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানময় বেদসারসুধা উদ্ধার করিয়া ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়াছিলেন, সেই নিগমকর্ত্তা ('নিগমকৃদুপজহ্রে') কৃষ্ণাখ্য আদি পুরুষকে আমি প্রণতি করি (পুরুষঋষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি'—২২৬ পৃঃ দ্রঃ)।

সেই নিগমকর্ত্তা আদি পুরুষকেই আমরা 'গীতার শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে প্রিয় শিষ্য ও সখা অর্জ্জুনকে এই ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন (শ্রীগীতা); পরে লীলাবসানের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রিয় শিষ্য ও সখা উদ্ধবকে এই ধর্ম্মই শিক্ষা দেন (ভাঃ ১১।২৯ অঃ, অপিচ ২২৪।২২৬ পৃঃ দ্রঃ)।

পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ

মহাভারত মুখ্যতঃ কুরুপাণ্ডবের ইতিহাস, সুতরাং পাণ্ডব-সম্পর্কিত শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথাই উহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সমগ্র লীলাকথা উহাতে নাই। তাহা হরিবংশে এবং বিবিধ পুরাণগ্রন্থে আছে। মহাভারতের এই অভাব পূরণার্থই শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হয়, একথা ঐ গ্রন্থেই ব্যাস-নারদ সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদকে বলিলেন, 'আমি মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্রাদি রচনা করিয়াও যেন নিজকে অকৃতার্থ বোধ করিতেছি, কিছুতেই আমার আত্মা তৃপ্তিবোধ করিতেছে না ('তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতি মে'), ইহার কারণ বুঝিতে পারি না। দেবর্ষি বলিলেন – 'ব্যাস, তুমি ভারতাদিতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছ, কিন্তু বাসুদেবের মহিমা সেরূপ সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন কর নাই। যে গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকেই অনন্তকীর্ত্তি ভগবানের নাম-কীর্ত্তন থাকে, সেইরূপ গ্রন্থই লোকসমূহের পাপ নাশ করিতে সমর্থ। হরিভক্তির সহিত মিলিত না হইলে ব্রহ্মজ্ঞানও শোভা পায় না। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি নিখিল কর্ম্মনিবৃত্তিদ্বারা পরমেশ্বরের নির্ব্বিকল্প স্বরূপ জানিতে পারেন, কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহা দুঃসাধ্য। অতএব তুমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেহাভিমানী জনগণকে ভগবৎলীলা দর্শন করাও।' এই ভূমিকা হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত রচনার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন স্পষ্ট উপলব্ধ হয়।

যে সকল পুরাণগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের মর্য্যাদা সর্ব্বাধিক; কবিত্বে, পাণ্ডিত্যে, গাম্ভীর্য্যে, মাধুর্য্যে,—সর্ব্বোপরি শ্লোকে শ্লোকে ভগবদ্ভক্তিরসোচ্ছ্বাসে এই

মহাগ্রন্থ অতুলনীয়। আমরা প্রধানতঃ এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই পুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

পুরাণকথার তাৎপর্য্য প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পৌরাণিক বর্ণনা-রীতির যে সকল বিশিষ্ট লক্ষণ আছে তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সেগুলি এই—

(১) পুরাণে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত কিংবা আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক তত্ত্বাদি প্রায়ই বিবিধ আখ্যান-উপাখ্যান, গল্প-উপন্যাসের আবরণে বর্ণিত হয়।

পৌরাণিক বর্ণনা-রীতির বৈশিষ্ট্য

(২) ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনাও অত্যুক্তি ও অলঙ্কারদ্বারা অনেক সময় অতিরঞ্জিত করা হয়।

(৩) ঐশ্বরিক লীলার বর্ণনা বলিয়া অবাধে অনৈসর্গিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার অবতারণা করা হয়।

পৌরাণিক বর্ণনার এই সকল লক্ষণ মনে রাখিয়া বিচারবুদ্ধিসহ পুরাণপাঠ করিলে উহা হইতে অমূল্য রত্নরাজি লাভ করা যায়, কেবল গল্পপাঠে বিশেষ ফললাভ হয় না, বরং অনেক সময় ভ্রমাত্মক মতের সৃষ্টি হয়।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলার ত্রিবিধ বিভাব

শ্রীভাগবত-পুরাণে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ত্রিবিধ বিভাবে দেখিতে পাই— ১। প্রতাপঘন অসুর-নিসূদন শ্রীকৃষ্ণ, ২। প্রেমঘন রসময় শ্রীকৃষ্ণ, ৩। প্রজ্ঞাঘন পরমজ্ঞানগুরু শ্রীকৃষ্ণ।

১। পুরাণে অসুর-নিসূদন চক্রধর শ্রীকৃষ্ণ

পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্য ও কার্য্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—এই সময় বহুসংখ্যক অসুর ধরাতলে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, ইহারা দেবাসুর যুদ্ধে নিহত অসুর। ইহাদের অত্যাচারে প্রপীড়িতা খিন্না পৃথিবী, গাভীরূপ ধারণ করিয়া, করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার শরণ লইলেন (১৩১ পৃঃ দ্রঃ)। ব্রহ্মা দৈববাণী শুনিয়া বলিলেন— 'ভগবান্ পৃথিবীর বিপদ বিদিত আছেন। তিনি শীঘ্রই বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাভার হরণ করিবেন।' পূর্ব্বে যে মহাভারতীয় ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে (ভূঃ ৩ পৃঃ) তাহাই পুরাণে গাভীরূপ-ধারিণী ধরিত্রীর রোদন বলিয়া বর্ণিত হইল।

এই হইল কৃষ্ণলীলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পুরাণের উপক্রমণিকা। গ্রন্থমধ্যেও বহুলাংশে অসুর-নিধন ও ভূভার-হরণের বিস্তারিত বর্ণনা—ব্রজলীলায় শৈশবে পুতনা-বধ, কৈশোরে বৎস-বক অঘাসুর ইত্যাদি বধ; মথুরা-দ্বারকা-লীলায় কংস-শিশুপাল-জরাসন্ধ-নরক-বাণ-পৌণ্ড্রক প্রভৃতি বহু নৃপাসুর বধ; পরে কুরুক্ষেত্রে পার্থ-সারথিরূপে সমগ্র ক্ষত্রিয়কুলের নিপাত সাধন। পরিশেষে পুরাণকার শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনার এইরূপে পরিসমাপ্তি করিয়াছেন—ভূমণ্ডলের ভারস্বরূপ রাজগণ

অসুর-সংহারী ভূভার-হারী শ্রীকৃষ্ণ

ও তাহাদের সৈন্যনিচয় নাশ করিয়া ভূভার হরণ করত ('হত্বা নৃপান্ নিরহরৎ ক্ষিতিভারমীশঃ') অপ্রমেয় ভগবান্ চিন্তা করিলেন—'দেখিতেছি ভূমণ্ডলের ভার যাইয়াও যেন যায় নাই ('গতোঽপ্যগতং হি ভারং'), কেননা উৎপথ-গামী উদ্ধত যাদবকুল এখনও বর্ত্তমান আছে। সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ এইরূপ স্থির করিয়া ব্রহ্মশাপচ্ছলে স্ববংশ ধ্বংস করিয়া স্বধামে গমন করিলেন—ভাঃ ১১।১।

৩—

কিন্তু যাঁহার ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধিত হয়, কতকগুলি অসুর নিধনের জন্য তাঁহার ধরায় অবতরণ এবং এত আয়াস স্বীকার কেন? অবশ্য তাঁহার অবতারের অন্য উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ শ্রীভাগবত তাঁহার অন্য লীলাবর্ণন প্রসঙ্গে সে উদ্দেশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, সে অপূর্ব্ব লীলাবর্ণনা ধর্ম্ম-সাহিত্যে অতুলন। তাহা এখন সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

২। পুরাণে প্রেমঘন মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অসুর-নিধনাদি ঐশ্বর্য্য-লীলাকথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুরাণে শ্রীভগবানের আর একটি লীলাকথা বিস্তারিত বর্ণিত আছে, উহা তাঁহার মাধুর্য্যলীলা—রসলীলা, প্রেমলীলা। পুরাণে তিনি কেবল চক্রধর নহেন, তিনি মুরলীধরও। তাঁহার অধরে মুরলী কেন? তিনি কে? শ্রীভাগবত তাঁহার পরিচয় দিলেন—যিনি যদুবংশে অবতীর্ণ হইলেন তিনি বিশ্বাত্মা ('অবতীর্য্য যদোবংশে কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা'—ভাঃ ১০।১।৩), এই কৃষ্ণকে যাবতীয় আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে ('কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বম্ আত্মানমখিলাত্মনাম্')। ভাঃ ১০।১৪

তিনি তো কেবল জগৎপতি নন, তিনি জগদাত্মা। তিনি সকলেরই আত্মার আত্মা। আত্মা সকলেরই প্রিয়—পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল প্রিয় বস্তু হইতে প্রিয় ('প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ স্যাৎ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ'; 'প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি')। সেই প্রিয়তম, সেই সুন্দরতম, প্রেমধাম বৃন্দাবনে প্রকট হইয়া বেণুবাদন করিতেছেন—সে বেণুরব কিরূপ?—যাহাতে সর্ব্বভূতের মন হরণ করে ('ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূত-মনোহরং' ভাঃ ১০।২১), সেই মোহন মুরলীরবে তিনি ত্রিজগতের মন আকর্ষণ করিতেছেন ('ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ')। সে বেণুরবে নরনারী প্রমোদিত, পশুপাখী পুলকিত, তরুলতা মুকুলিত, যমুনা উচ্ছ্বসিত।'—সখি! দেখ, দেখ, আজ বৃন্দাবনের কি শোভা!—গোবিন্দের বেণুরবশ্রবণে মত্ত হইয়া ময়ূরগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে ('গোবিন্দবেণুমনুমত্ত-ময়ূরনৃত্যং'), বেণুরবে মুগ্ধচিত্ত কৃষ্ণসার-গেহিনী হরিণীগণ কৃষ্ণের সমীপে ছুটিয়া আসিয়া ('কণিত-বেণুরবঞ্চিতচিত্তাঃ কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ') প্রণয়দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার পূজা বিধান করিতেছে ('পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ')। গাভীসকল উৎক্ষিপ্ত কর্ণপুটে শ্রীকৃষ্ণের মুখবিনির্গত বেণুগীতসুধা পান করিয়া ('গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযূষমুত্তম্ভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্তঃ') অশ্রুপূর্ণ লোচনে দণ্ডায়মান আছে; স্তনক্ষরিত ফেণগ্রাস দুগ্ধপানে প্রবৃত্ত বৎসগণের মুখেই সংলগ্ন রহিয়াছে ('শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবালা'), তাহাদিগের নয়নেও অশ্রুকণা।—সখি, এই বনে যে সকল বিহঙ্গ আছে তাহারা মুনি হইবার যোগ্য ('প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্'), ঐ দেখ, উহারা অন্য রব পরিত্যাগ করিয়া মুদিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের সুস্বর বেণুগীত শ্রবণ করিতেছে ('কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং শৃণ্বন্ত্যমীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ')। ফলপুষ্পভারে প্রণতশাখা তরুলতা প্রেমে পুলকিতাঙ্গ হইয়া পুষ্পফল হইতে মধুধারা বর্ষণ করিতেছে ('বনলতাস্তরবঃ পুষ্পফলাঢ্যাঃ প্রণতভারবিটপাঃ মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম')

শ্রীজগন্মানসাকর্ষী মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ

সচেতনের কথা দূরে থাকুক, নদীসকলও মুকুন্দের গীত শ্রবণ করিয়া আবর্ত্তচ্ছলে ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছে (ভাঃ ১০।২১ ; অপিচ, ৬০—৬৩ পৃঃ দ্রঃ)।

কি অপূর্ব্ব দৃশ্য !

ইহা ব্রজে, জগতে অখিলাত্মার প্রকাশ। অখিলাত্মা তো সর্ব্বত্রই আছেন। কিন্তু তিনি যে সকলের আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ, তিনি যে প্রেমঘন, প্রিয়তম, রসঘন, 'রসানাং রসতমঃ,' তাহা তো বহির্ম্মুখ জীব বুঝিতে পারে না। শ্রীভাগবতকার প্রেমধাম, আনন্দধাম বৃন্দাবনে সেই রসময়ের প্রেমময়ের প্রত্যক্ষ প্রকাশ প্রদর্শন করিতেছেন। ব্রজের সকল লীলাই রাসলীলা, আনন্দলীলা। রাসলীলা উহার একটি বিশেষ অভিব্যক্তি। শ্রীভাগবতের সে লীলা-বর্ণন আরও মধুর।

পূর্ব্বে বেণুরবের বর্ণনায় দেখিয়াছি উহা 'সর্ব্বভূতমনোহরম্'—সর্ব্বভূতের চিত্তহরণকারী, রাসলীলার পূর্ব্বে যে বেণুবাদন তাহা 'বামাদৃশাং মনোহরম্'—বামাগণের চিত্ত-বিমোহনকারী, এইটুকু বিশেষত্ব। সেই বেণুরব শ্রবণমাত্র ব্রজকামিনীগণ সেই বংশীধ্বনির অনুসরণে ধাবিত হইলেন, এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব সহিল না—পতি, পুত্র, গৃহ, দেহ, গৃহকর্ম্ম, দেহধর্ম্ম সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেল। সকলে যাইয়া রাসে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন (৮৮-৮৯ পৃঃ দ্রঃ)।

এই যে মিলন, রস-লীলা, প্রেম-লীলা—ইহা যে কেবল রাসমণ্ডলেই হইয়াছিল তাহাও নহে। এস্থলে শ্রীভাগবত আরও একটি লীলা-কথার অবতারণা করিয়াছেন, যাহা অত্যুত্তম রহস্য—কয়েকটি গোপিকা স্বজন-কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে রাসে যাইতে পারিলেন না। তাঁহারা কি করিলেন ? তাঁহারা তন্ময়চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন। তৎপর ধ্যানপ্রাপ্ত কান্তের আলিঙ্গনসুখলাভ করিয়া গুণময় দেহ ত্যাগ করিলেন ('ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনিবৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলা··· জহুর্গুণময়ং দেহং' (৬৮ পৃঃ)।

সুতরাং দেখা গেল, শ্রীভাগবত দ্বিবিধ রাসলীলা বর্ণন করিতেছেন—

দৈহিক ও আধ্যাত্মিক রাসলীলা

(১) রাসমণ্ডলে প্রিয়তমের সহিত গোপীগণের মিলন—ইহা দৈহিক রাসলীলা।

(২) গৃহে শ্রীকৃষ্ণধ্যানে নিরত গোপীগণের প্রিয়তমের সহিত মানসে মিলন—ইহা আধ্যাত্মিক রাসলীলা।

বস্তুতঃ, গোপীজন বা ভক্তজন যে প্রেমরস আস্বাদন করেন, সেই গোপীজন বলিতে তাহাদের দেহ বুঝায় না, আর প্রেমরস বলিতে দৈহিক সুখও বুঝায় না। মানবাত্মাই প্রেমরস আস্বাদন করেন, আর প্রেমের বিষয় হইলেন শ্রীকৃষ্ণ—পরমাত্মা। এই লীলা-বর্ণনায় শ্রীভাগবত এই তত্ত্বই প্রদর্শন করিলেন। ইহা কেবল আমাদের স্বকল্পিত ব্যাখ্যা নহে, আর একটি লীলা-বর্ণনায় ইহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে।

বিশ্বাত্মার সহিত জীবাত্মার এই যে প্রেম-লীলা, ইহা নিত্য-লীলা। ব্রজে এই লীলা প্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরা গেলেন তখনই কি লীলা শেষ হইল ? তাহা নহে। —শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে শ্রীউদ্ধবের সহিত গোপীদিগকে যে বার্ত্তা পাঠাইলেন তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা গেল, শ্রীকৃষ্ণ দৃশ্যতঃ দূরস্থ হইলেও গোপীগণের অন্তরস্থই ছিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন—

"কল্যাণীগণ! তোমাদের সহিত আমার কখনও বিয়োগ হয় নাই, কারণ আমি সর্ব্বাত্মা ("ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ"—ভাঃ ১০।৪৭।২৮)। "আমি তোমাদের নয়নের প্রিয় হইলেও তোমাদের নিকট হইতে দূরে আছি, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মনে মনে নিয়ত আমার ধ্যান করিয়া চিত্তে আমাকে আরও নিকটতম-রূপে লাভ করিবে ('মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং')। প্রিয়তম দূরে থাকিলে স্ত্রীগণের চিত্ত তাহাতে যেরূপ আবিষ্ট থাকে, নিকটে ও চক্ষুর গোচরে থাকিলে সেরূপ হয় না। আমাতে চিত্ত নিয়ত আবিষ্ট করিয়া আমার ধ্যান করিতে করিতে অচিরেই তোমরা আমাকে প্রাপ্ত হইবে। রাসমণ্ডলে যাহারা আমার সহিত মিলিত হইতে পারে নাই তাহারাও তন্ময়চিত্তে আমার ধ্যান-নিরত হইয়া আমার সহিত মিলিত হইয়াছে।"—

রাসলীলার আধ্যাত্মিকতা

'যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্। মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া ॥
যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ততে। স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষগোচরে ॥
ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ। অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥'
(ইত্যাদি ভাঃ ১০।৪৭।৩৪-৩৭)

রাসলীলার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কি তাহা শ্রীভাগবত এস্থলে স্পষ্টই উল্লেখ করিলেন। সুতরাং উহার স্থূল আদিরসাশ্রয়া যে বর্ণনা তাহা রসশাস্ত্রের ভাষায় ভগবৎপ্রেমোচ্ছ্বাসেরই বর্ণনা, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কিন্তু তিনি এ লীলা করেন কেন? অসুর-নিধনাদি ঐশ্বর্য্যলীলার উদ্দেশ্য লোকহিত, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এ লীলার উদ্দেশ্য কি?—ইহারও উদ্দেশ্য লোকহিত—প্রেমধর্ম্মশিক্ষা। রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—শ্রীভগবান্ আপ্তকাম, তাঁহার এ রাসলীলাদির অভিপ্রায় কি? উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন—

'অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥' ভাঃ ১০।৩৩।৩৬

—'জীবের মঙ্গলার্থই তিনি মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া এই সকল লীলা করিয়া থাকেন, যাহাতে বহির্ম্মুখ জীব এই সকল লীলাকথা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে।'

৩। পুরাণে পরমজ্ঞানগুরু শ্রীকৃষ্ণ

পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যলীলা ও মাধুর্য্যলীলার কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। এতদ্ব্যতীত শ্রীভাগবতে তাঁহার আরও একটি লীলাকথা বর্ণিত আছে—সে স্থলে তিনি পরম জ্ঞানগুরু, প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম্মোপদেষ্টা। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বিবিধ লীলাকথা এবং একাদশ স্কন্ধে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত ধর্ম্মোপদেশের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। লীলাবসানের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীউদ্ধবকে এই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। এই ধর্ম্ম ও শ্রীগীতোক্ত ধর্ম্ম মূলতঃ একই, এস্থলে ইহাকে ভক্তিযোগ বলা হইয়াছে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-কথিত ভাগবত ধর্ম্ম (২১৫-২১৬ পৃঃ দ্রঃ)।

পরমজ্ঞানগুরু ধর্ম্মোপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ

অধুনা পুরাণপাঠকগণ ও কথকগণ বিশেষ ভাবে শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধোক্ত পুণ্যলীলা-কথার ব্যাখ্যা-বিবৃতি সততই করিয়া থাকেন, কিন্তু একাদশ স্কন্ধোক্ত তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত এই পরম ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় তাঁহাদের সেরূপ আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু প্রাচীনগণের নিকট উহা অতি সমাদরণীয় ছিল। শ্রীভাগবতে রক্ষিত এই ভগবদ্‌বাণী লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে—

'কৃষ্ণস্য বাঙ্ময়ী মূর্ত্তিঃ শ্রীমদ্ভাগবতং মুনে।
উপদিশ্যোদ্ধবং কৃষ্ণঃ প্রবিষ্টোঽস্মিন্ ন সংশয়ঃ॥'

—'শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশ প্রদান করিয়া ভাগবতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সংশয় নাই। শ্রীশুকদেব এই ধর্ম্মোপদেশ-প্রকরণ সমাপনান্তে বলিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণ-কথিত ভক্তি-সংযুক্ত এই জ্ঞানামৃত অল্প মাত্র পান করিলেও জগৎ মুক্তিলাভ করে' (২২৬ পৃঃ ও ভূঃ ১৬ পৃঃ দ্রঃ)।

বৈষ্ণবাগমের শ্রীকৃষ্ণ

ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি বৈষ্ণবতন্ত্রে এবং পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ একটি বিশিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। বসুদেব-গৃহে যিনি জন্মপরিগ্রহ করিলেন শ্রীমদ্ভাগবত দেবকী-স্তবে তাঁহার এইরূপ পরিচয় দিতেছেন—

'রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং সত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥—ভাঃ ১০।৩।২১
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্॥—ভাঃ ১০।৩।১১

পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণিত

—'ভগবন্! বেদে যাঁহা আদ্য, ব্রহ্মজ্যোতিঃ, অব্যক্ত, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, একমাত্র সৎ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন আপনি সেই বিষ্ণু; আপনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী অধ্যাত্মদীপ, অনুভবে আনন্দস্বরূপ' অর্থাৎ আপনি সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ।

উপনিষদে ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ উভয়বিধ ভাবেরই বর্ণনা আছে।

—'দ্বিরূপং হি ব্রহ্ম অবগম্যতে—নামরূপভেদোপাধিবিশিষ্টং তৎবিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধি-বিবর্জ্জিতম্'—শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য।—দ্বিরূপ ব্রহ্মই উপদিষ্ট হইয়াছেন, এক নামরূপভেদ-উপাধিবিশিষ্ট, অপর সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত। নামরূপভেদোপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই বিষ্ণু, ইনি নির্গুণ, নিরাকার হইয়াও সগুণ সাকার; সগুণ-নির্গুণ ভিন্ন তত্ত্ব নহে, একেরই দুই বিভাগ—'সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুঃ'। নির্গুণ ব্রহ্মই লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন (লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ' —ভাঃ ৩।৭।২)। ইনিই সচ্চিদানন্দ—পূর্ব্বোক্ত ভাগবত-শ্লোকে ইঁহারই বর্ণনা।

লীলায় তিনি কেবল ক্রিয়াযুক্ত হয়েন না, রূপযুক্তও হয়েন। কংস-কারাগারে তিনি যে রূপ লইয়া আবির্ভূত হইলেন তাহাও এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে—

বসুদেব দেখিলেন—

'তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্' ॥—ভাঃ ১০।৩।৮

—'সেই বালক বড়ই অদ্ভুত। তাঁহার নয়ন কমলতুল্য, তিনি চতুর্ভুজ, তাহাতে শঙ্খ-গদাদি অস্ত্রসকল উদ্যত; তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন শোভা পাইতেছে; গলদেশে কৌস্তুভমণি, পরিধানে পীতবসন; বর্ণ নিবিড় মেঘের ন্যায় মনোহর।' ইহা পৌরাণিক শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি। কংসভয়ে ভীতা দেবকীদেবী বলিলেন—'বিশ্বাত্মন্, আপনি আপনার এই অলৌকিক রূপ সংবরণ করুন। তখন ভগবান্ মাতাপিতার সমক্ষেই প্রাকৃত শিশুরূপ ধারণ করিলেন ('পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যোঃ বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ)।

ব্রজলীলায় তিনি দ্বিভুজ, মুরলীধর। শ্রীভাগবত নানা স্থানে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন, সে বর্ণনা অতুলন। একটি চিত্র এই—

'বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তী চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণুরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ ॥'—ভাঃ ১০।২১।৫

শিখিপুচ্ছচূড়া শিরে, কর্ণযুগে কর্ণিকার,
কনক-কপিশবাস, গলে বৈজয়ন্তীহার,
অধরসুধায় করি বেণুরন্ধ্র বিপ্লাবিত
নটবরবরবপু, বৃন্দারণ্যে উপনীত।
(বেদান্তরত্ন ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-অনূদিত)

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত অনুরূপ বর্ণনা রক্ষিত আছে—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নর-লীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নর-লীলার হয় অনুরূপ।

'কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন' (ইত্যাদি ৬৬ পৃঃ দ্রঃ)

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যলীলা। তাঁহার মধুররূপ 'লাবণ্যসারং অসমোর্দ্ধং অনন্যসিদ্ধম্'—লাবণ্যের সার, অসম, অনূর্দ্ধ; উহার সম কিছু নাই, উহার অধিক কিছু নাই, উহা অনন্যসিদ্ধ (৬৫ পৃঃ দ্রঃ)। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিতেন—'কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যসিন্ধু'।

—যিনি রসস্বরূপ, রসময়, প্রেমময়, তিনিই মর্ত্ত্য-লীলায় ব্রজে প্রকট, সুতরাং সে রূপ—

'কেবল রস-নিরমাণ'—গোবিন্দদাস
'কেবল রসময় মধুর মূরতি
পীরিতিময় প্রতি অঙ্গ'—নরোত্তমদাস।

এই যে ব্রজলীলা ইহা নিত্যলীলা—অনাদি অনন্তকাল এই লীলা গোলোকে বর্ত্তমান। ব্রহ্মার একদিনে অর্থাৎ এক কল্পে একবার এই প্রেমলীলা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়, উহাই পুরাণ-বর্ণিত ব্রজলীলা। এই ব্রজলীলা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণের কারণ—'অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্'। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার নহেন, তিনি কাহারও অবতার নহেন, তিনি সর্ব্ব-অবতারী স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণলোকের নাম গোলোক, বিষ্ণুলোকের নাম বৈকুণ্ঠ; গোলোক, বৈকুণ্ঠাদি দেবলোকসমূহের উর্দ্ধে অবস্থিত। আনন্দস্বরূপ যে শক্তি সহায়ে এই আনন্দ লীলা করেন তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীরাধা মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি। শক্তি ব্যতীত লীলা হয় না। সুতরাং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে শ্রীরাধা ভিন্ন কৃষ্ণ নাই। যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণই পরমস্বরূপ। গোপীগণ শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ-স্বরূপ, লীলার সহায়িকা (৯৮ পৃঃ দ্রঃ)।

বৈষ্ণবাগমে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব-অবতারী পরতত্ত্ব, তিনি বিষ্ণু-অবতার নহেন

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব যেভাবে ব্যাখ্যাত হইল, ইহা বৈষ্ণবাগম ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় গোস্বামিশাস্ত্রানুমত। ব্রহ্মসংহিতা, চরিতামৃত প্রভৃতি মূলগ্রন্থাদি হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।—

'আনন্দ-চিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥'—ব্রহ্মসংহিতা

—আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা স্বীয় হ্লাদিনী শক্তিবৃত্তিভূতা প্রেয়সীবর্গের সহিত যিনি গোলোকে বাস করেন সেই অখিলাত্মভূত আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি (ব্রহ্মার উক্তি)।

শ্রীকৃষ্ণ অখিলাত্মা, তিনিই আদি পুরুষ। তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহার আনন্দাংশভূতা শক্তিসমূহই গোপীজন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলেরই আত্মস্বরূপ, সকল প্রিয় বস্তু হইতে প্রিয়তম ('প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি')। কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাই তাঁহাদের জীবনের সার। শ্রীধাম গোলোকে লীলা-পরিকর গোপীজন সহ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আনন্দলীলা। এই অপ্রকট নিত্য-লীলাই ব্রজে প্রকট। গোলোক, গোকুল, ব্রজ, বৃন্দাবন একই—ইহাকে শ্বেতদ্বীপও বলা হয়। এই ভগবদ্ধাম চিন্ময়, অপ্রাকৃত, প্রপঞ্চাতীত—

গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলা

'সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥
সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু—কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে—নাহিক নিয়ম ॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায় ॥

চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তার প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ-গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥'
—চৈঃ চঃ আদি, ৫।১৪-১৮;

'সর্ব্বোপরি' অর্থাৎ পরব্যোমস্থ বৈকুণ্ঠাদি ধামের ঊর্দ্ধে শ্রীগোকুল বা শ্রীকৃষ্ণলোক অবস্থিত। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীগোলোক নামক কোন সীমাবদ্ধ স্থানে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করিয়া তিনি লীলা করিতেছেন, ইহাই কি সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরম পুরুষের স্বরূপ?—না, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু; তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই লীলাতে তিনি সসীম দেহধারী বলিয়া প্রতীয়মান হন। সেইরূপ তাঁহার লীলাস্থান গোকুলও সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, তাহা কিছুর উপরে বা নিম্নে অবস্থিত একথা বলা যায় না, তাহা সর্ব্বব্যাপী, কেননা যিনি অনন্ত তাঁহার ধাম বা স্থিতিস্থান সান্ত, সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই অপ্রকট গোকুল ব্রহ্মাণ্ডে সীমাবদ্ধ স্থানরূপে প্রকটিত হইলেন। চর্ম্মচক্ষুতে উহা প্রাপঞ্চিক বস্তুর ন্যায় সীমাবদ্ধ মাটিময় স্থান বলিয়াই বোধ হয়; চিন্ময়, চিন্তামণিময় বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যখন সাধনবলে ভগবৎ-কৃপায় চিত্তমালিন্য দূর হইয়া যায়, চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের উদ্ভব হয়, তখন ভক্তের হৃদয়স্থ ভক্তি ভগবৎ-প্রেমে পরিণত হয়। তখনই—এই প্রেমলীলা ভক্তহৃদয়ে স্বস্বরূপে উদিত হয়েন।

এই প্রেমলীলা শুদ্ধচিত্ত ভক্ত-ভাবুকের ভাবগম্য

এই সকল ভাব-রাজ্যের কথা, প্রেমার্দ্রচিত্ত ভাবুক ভক্তের স্বানুভূতিগম্য, শুষ্ক বিচার-বুদ্ধির বিষয় নহে।—

'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥'—ব্রহ্ম-সংহিতা

—প্রেমাঞ্জন-পরিলিপ্ত ভক্তি-লোচনে সাধুগণ সততই নিজ হৃদয়েই সেই অচিন্ত্যরূপগুণ-স্বরূপ শ্যামসুন্দরকে দর্শন করেন।

শ্রীকৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বন্ধে চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের সিদ্ধান্ত এই যে, ভূভার-হরণ শ্রীকৃষ্ণাবতারের কারণ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু ভূভারহরণ শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম নহে, উহা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশাবতার বিষ্ণুর কার্য্য। এই দুই অবতার এক সময়ে এক দেহাশ্রয়েই লীলা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্ব-অবতারী।

শ্রীকৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত

'স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার কাল।
ভার হরণকাল তাতে হইল মিশাল॥

পূর্ণ ভগবান্ অবতার যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥'—চৈঃ চঃ আদি ৪।৭-১২

তবে শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের মূল কারণ কি?—প্রেমরস আস্বাদন ও রাগমার্গ-ভক্তি প্রচার।

'আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।
যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥
... ...
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥
এই বাঞ্ছা হেতু কৃষ্ণ-প্রাকট্য কারণ।
অসুর-সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন॥—চৈঃ চঃ আদি ৪, ১৩-৩২

শ্রীচৈতন্য অবতারের অনুরূপ কারণ ও উদ্দেশ্য

শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ সম্বন্ধেও চরিতামৃতে এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা আছে। নাম-সংকীর্ত্তন ও রাগানুগা ভক্তি প্রচারই শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ বলা হয় বটে, কিন্তু উহা বহিরঙ্গ কারণ; অন্তরঙ্গ কারণ—প্রেমরস আস্বাদন।

'রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে, রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে—চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥

—চৈঃ চঃ আদি ৪, ৫২, ৪৯-৫০

শ্রীচৈতন্য শ্রীরাধাভাবে ভাবিত শ্রীকৃষ্ণ—'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।'

'জয় নিজ কান্তা-কান্তি-কলেবর,
নিজ প্রেয়সী ভাব-বিনোদ।'

সনাতন ধর্ম্ম-সাহিত্যে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের স্থান

সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক চৈতন্য-যুগ পর্য্যন্ত ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার ক্রম-বিকাশ পর্য্যালোচনা করিলে দেব-বাদ, ব্রহ্মবাদ, ঈশ্বরবাদ, অবতারবাদ ইত্যাদি সনাতন

ধর্ম্মের বিভিন্ন মতবাদের তাৎপর্য্য, পৌর্ব্বাপর্য্য ও পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝা যায় এবং শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে যুগে যুগে নানাভাবে রূপায়িত হইয়াছেন সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে কয়েকটি কথা উল্লেখ করিতেছি।

বেদ-সংহিতা—দেববাদ কর্ম্মপ্রধান—বিষ্ণু অন্যতম দেবতা

১। সনাতন ধর্ম্মের আদিস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই দেব-বাদে। প্রাচীন আর্য্যগণ ইন্দ্র, অগ্নি, বিষ্ণু, বরুণ আদি দেবগণের উদ্দেশ্যে বেদমন্ত্রদ্বারা যাগযজ্ঞ করিয়া অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেন। এই ধর্ম্ম কর্ম্ম-প্রধান ছিল, যজ্ঞই ছিল উহার প্রধান অঙ্গ, কিন্তু যজ্ঞাদি শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন হইত এবং অর্চ্চনা, বন্দনা, নমস্কার আদি ভক্ত্যঙ্গযুক্ত ছিল (১৬১ পৃঃ দ্রঃ)।

উপনিষৎ—ব্রহ্মবাদ, জ্ঞানপ্রধান—দেবগণ প্রায় লুপ্ত

২। দেবতা অনেক থাকিলেও তাঁহারা যে এক ঐশী শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ এ তত্ত্ব তখনও অবিদিত ছিল না। কালক্রমে এই এক-তত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করে এবং জ্ঞানমূলক ব্রহ্মবাদ সুপ্রতিষ্ঠ হয়। (১৬৫ পৃঃ দ্রঃ)।

৩। শ্রুতিতে নির্গুণ-সগুণ উভয়বিধ ব্রহ্মেরই বর্ণনা আছে (৩৯ পৃঃ)। নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে ভক্তির স্থান নাই, দেবগণেরও কোন স্থান নাই। সগুণ তত্ত্বেই ভক্তির সমাবেশ হয়। সুতরাং পরবর্ত্তী কালে ভক্তিবাদ যখন সুপ্রতিষ্ঠ হইল, অব্যক্তের স্থলে যখন ব্যক্ত উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইল, তখন প্রাচীন বৈদিক দেবগণই পরব্রহ্মের স্থলে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু দেবতা একাধিক, সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে অর্থাৎ তাঁহাদের উপাসকগণের মধ্যে পরব্রহ্মের স্থান লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নানারূপ মতভেদ উপস্থিত হইল এবং তত্তৎ মতের পরিপোষক বিবিধ পুরাণ, উপপুরাণাদি গ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল। এইরূপে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। এই হেতু পৌরাণিক দেব-তত্ত্ব পরস্পর-বিরোধী মতবাদে নিতান্ত জটিল হইয়াছে (১৭৩ পৃঃ দ্রঃ)।

বিবিধ পুরাণ—ভক্তিবাদ —বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি পর-ব্রহ্ম

৪। বৈদিক দেবগণের মধ্যে প্রথমতঃ ইন্দ্রেরই প্রাধান্য ছিল। কোন কোন সূক্তে বিষ্ণুকে ইন্দ্রের যোগ্য সখাও বলা হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে ইন্দ্রের প্রাধান্য খর্ব্ব হইতে থাকে এবং বিষ্ণুই পরতত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হন। পুরাণে ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতামাত্র এবং বিষ্ণু-অবতার শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হতমান হইয়া পরব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার স্তব-স্তুতি করেন। 'বিষ্ণু' অর্থ সর্ব্বব্যাপী দেবতা, সর্ব্বব্যাপিত্ব ব্রহ্মের লক্ষণ; শ্রুতিতে বিষ্ণু ও ব্রহ্ম একই তত্ত্ব এবং উহাই পরতত্ত্ব (১৭৩ পৃঃ দ্রঃ)।

বৈষ্ণব পুরাণ—বিষ্ণুই পর-ব্রহ্ম

৫। সুতরাং অবতার-বাদ প্রবর্ত্তিত হইলে মৎস্য-কূর্ম্মাদি এবং রামকৃষ্ণাদি সকলই বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, পূর্ব্বে দেবকীস্তবের যে ভাগবত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (ভূঃ ২১ পৃঃ) তাহাতে নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম, বিষ্ণু, কৃষ্ণ—সকলই একই তত্ত্ব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

অবতারবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার

৬। কিন্তু পুরাণেই অনেকস্থলে বিষ্ণু ও কৃষ্ণে পার্থক্যও করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে 'ত্র্যধীশ' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর এই তিনের অধীশ্বর। প্রকাশভেদে বিষ্ণুরও বিভিন্ন বিভাবে বিভিন্ন নাম আছে; যেমন—মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকশায়ী। বৈষ্ণবাগমে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব-অংশী, পরতত্ত্ব, ইঁহারা তাঁহার অংশ—'এহো কলা অংশ যার কৃষ্ণ অধীশ্বর।'—চৈঃ চঃ

বৈষ্ণবাগমে কৃষ্ণই পরতত্ত্ব—বিষ্ণু তাঁহার স্বাংশ

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
সর্ব্বাদি সর্ব্ব-অংশী কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥—চৈঃ চঃ

তিনি অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব হইলেও তত্ত্বমাত্র নহেন, তিনি পুরুষ—'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ (উপনিষৎ)।' তিনিই আবার রসস্বরূপ ('রসো বৈ সঃ')। বেদের সেই রসব্রহ্মই ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন কিশোর-শেখর। ব্রজলীলা রসময়ের রসলীলা, প্রেমলীলা।

গৌড়ীয় গোস্বামি-শাস্ত্রে শ্রীচৈতন্য—রাধাভাবে ভাবিত শ্রীকৃষ্ণ

৭। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-লীলার বর্ণনা সকল শাস্ত্রেরই অভিধেয়, কিন্তু লীলাময়ের মাধুর্য্য-লীলার সংবাদ পাই আমরা কেবল শ্রীভাগবতের ব্রজলীলায় আর গৌড়ীয় গোস্বামি-শাস্ত্রে রক্ষিত চৈতন্য-লীলায়। 'প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপগ্রহণ করিয়াছিল—তাহা এই বঙ্গদেশে'—এ উক্তি যাঁহার সম্বন্ধে করা হইয়াছে তিনিই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য—রাধাভাবে ভাবিত শ্রীকৃষ্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ-চরিত্র'

মহাভারতে, পুরাণে, বৈষ্ণবাগমে ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। বর্ত্তমানকালে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বিবিধ শাস্ত্র অতি নিপুণভাবে বিচার করিয়া সারগর্ভ গবেষণামূলক 'কৃষ্ণচরিত্র' নামক উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, আমার যতদূর সাধ্য, আমি পুরাণ-ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সকল উপাখ্যান জন-সমাজে প্রচলিত আছে তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় উপন্যাসসকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি, ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বপাপসংস্পর্শশূন্য আদর্শ-চরিত্র আর কোথাও নাই, কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।'

বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শপুরুষ-তত্ত্ব

'আমি নিজে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি, কিন্তু এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানব-চরিত্রই সমালোচনা করিব। শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের আসল কথা—'ধর্ম্ম-সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'। এই ধর্ম্ম-সংরক্ষণ কেবল সম্পূর্ণ আদর্শ প্রচার দ্বারাই হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ-পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ, ইহা ভাবিলে তাঁহার সকল কার্য্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্রস্বরূপ রত্নভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শ-পুরুষতত্ত্ব।'

বঙ্কিমচন্দ্রের মহনীয় কৃষ্ণ-স্তুতি

'ধর্ম্ম-পরিবর্দ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে এরূপ আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপুস্তকেই নাই, কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই।—কিন্তু সর্ব্বোপরি হিন্দুর এক আদর্শ আছেন, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশ মাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমময় চরিত্র কখনও মনুষ্য ভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই।'

'যিনি একাধারে পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্য্যে ও শিক্ষায়, কর্ম্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্ম্মে, দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্যরূপেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ। ইহাই Hindu Ideal.—যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। যেদিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল, সেই দিন হইতে আমাদের সমাজের অবনতি। এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগ্রত করিতে হইবে। ভরসা করি, এই কৃষ্ণ-চরিত্রের ব্যাখ্যায় সে কার্য্যে কিছু সাহায্য হইতে পারিবে' (১৩৮-১৩৯ পৃঃ এবং ১৮২-১৮৫ পৃঃ দ্রঃ)।

শ্রীকৃষ্ণই হিন্দুর জাতীয় আদর্শ

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এ আহ্বানে আধুনিক হিন্দু কর্ণপাত করে নাই, তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। তিনি মহাভারতের প্রামাণ্য অংশ ও শ্রীগীতার আলোকে অনৈসর্গিক ও অতি-প্রাকৃত আখ্যান-উপাখ্যানাদি বর্জ্জন করিয়া আধুনিক রুচিসম্মত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কৃষ্ণ-চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা উচ্চ শিক্ষিতগণের নিকট সমাদরণীয় হইবার কথা, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই। এই উপাদেয় গ্রন্থখানি তেমন লোকপ্রিয় ও সুপ্রচলিত হয় নাই। ইহার কারণ, আধুনিক শিক্ষিতগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-কথা শুনিবার সুমতির বড়ই অভাব, তাঁহার নিষ্কাম বিশুদ্ধ ধর্ম্মাদর্শ ও জীবনাদর্শ দ্বারা স্বীয় জীবন অনুশাসিত করিবার সঙ্কল্প তো অনেক দূরের কথা। যে বৈষ্ণব ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-কথা শুনিতে সতত আগ্রহশীল এবং শ্রদ্ধা সহকারে লীলা-গ্রন্থাদি পাঠ করেন, তাঁহারাও এ গ্রন্থের বিশেষ সমাদর করেন না, না করিবারও হেতু আছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ মহাভারতের ও শ্রীগীতার কৃষ্ণেরই আলোচনা করিয়াছেন, আমরা বৈষ্ণবাগমের কৃষ্ণ বলিয়া যে তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার আলোচনায় তিনি প্রবেশ করেন নাই। অথচ ব্রজের কৃষ্ণই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য, ব্রজেই কৃষ্ণ পূর্ণতম, অন্যত্র কৃষ্ণ পূর্ণতর, পূর্ণ, এমন কি ব্রজের কৃষ্ণ ও যাদব-কৃষ্ণ বিভিন্ন, এরূপ কথাও গোস্বামি-শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় (৫৫ পৃঃ দ্রঃ)। তাঁহারা ব্রজের ভাবে ভাবুক, ইহাই তাঁহাদের অন্তরঙ্গ সাধনার বস্তু।

ব্রজের ভাব কি? রাগানুগা ভক্তি। পরম আত্মীয়ভাবে—প্রভুভাবে, সখাভাবে, পুত্রভাবে, কান্তভাবে শ্রীভগবানের ভজনা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাব, এ সকল ব্রজেই সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল—তন্মধ্যে 'কান্তভাব সাধ্য-শিরোমণি'। ইহা নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ হইলেও ধর্ম্মজগতের অত্যুত্তম রহস্য। ইহার মূল বেদান্তে (১০১ পৃঃ)। ইহাই ব্রজের নির্ম্মল রাগ। কিন্তু চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল না হইলে এই অপ্রাকৃত পরম-পবিত্র ধর্ম্মের ব্যভিচারে নানারূপ অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। 'কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় পাপোপাখ্যান' ইত্যাদি কথায় বঙ্কিমচন্দ্র এই সকল উপধর্ম্মই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত রাগানুগা ভক্তি বা প্রেম-ধর্ম্মের আলোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হন নাই, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন।

তবে সে সম্বন্ধে তিনি যে ধারণা পোষণ করিতেন তাহা আনন্দমঠে সন্তান-সম্প্রদায়ের নায়ক সত্যানন্দের মুখে যে কথা দিয়াছেন তাহা হইতে অনেকটা অনুমান করা যায়—"চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন, তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়, সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব, কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব।"

অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন—ধর্ম্মের প্রথম সোপান বহু দেবের উপাসনা; দ্বিতীয় সোপান সকাম ঈশ্বরোপাসনা; তৃতীয় সোপান নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনা বা বৈষ্ণবধর্ম্ম অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। **ধর্ম্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা**। তাঁহার মতে কৃষ্ণোপাসনার উদ্দেশ্য ও ফল, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত স্বভাব-প্রাপ্তি, উহাই মোক্ষ। কৃষ্ণ-চরিত্র গ্রন্থে তিনি এই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীগীতার 'মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ', 'মদ্ভাবমাগতাঃ' ইত্যাদি কথা স্মর্তব্য (১৮৬ ও ২১৩ পৃঃ দ্রঃ)।

উপনিষদের শ্রীকৃষ্ণ

এই গ্রন্থের আলোচনা বেদান্তমূলক, সুতরাং সর্ব্বব্যাপক। ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ, গীতার শ্রীকৃষ্ণ, পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ, বৈষ্ণবাগমের শ্রীকৃষ্ণ—সকলই এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। অন্য কথায় বলা যায়, ইনি উপনিষদের শ্রীকৃষ্ণ ('নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে')। উপনিষদে যে পর-তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছেন, ঋষি-প্রজ্ঞান তাঁহার নাম দিয়াছেন সচ্চিদানন্দ। পরম পুরুষের এরূপ সর্ব্বতঃপূর্ণ সার্থক নাম আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। এই সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই আমাদের আলোচনার বিষয়। শ্রুতি বলেন,—সচ্চিদানন্দের স্বভাব-সিদ্ধ ত্রিবিধ শক্তি—ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি (৪৯ পৃঃ)। শাস্ত্রে ইহাদের পারিভাষিক নাম—সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী। সদংশে সন্ধিনী, যাহার প্রকাশ কর্ম্মে; চিদংশে সংবিৎ, যাহার প্রকাশ জ্ঞানে; আনন্দাংশে হ্লাদিনী, যাহার প্রকাশ প্রেমে। সেই সচ্চিদানন্দকে যদি আমরা ক্রিয়াশীল, লীলাময় মনে করি, তবেই আমরা বুঝিতে পারি এই সৃষ্টি-রহস্য, তাঁহার এই জগৎ-লীলা। এই যে জীবের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি জীব-জগতের কর্ম্ম-প্রবাহ, ইহার মূলে তাঁহার সন্ধিনী শক্তি। এই শক্তির এক বিন্দু লাভ করিয়া মানব সুখ-সমৃদ্ধি-শিল্প-সম্ভারপূর্ণ বিচিত্র সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার সংবিৎ শক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া মানুষ শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্ম্ম-দর্শনাদির অনুশীলন করিয়া মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির বিকাশেই মানব-চিত্তে সৌন্দর্য্যবোধ, আনন্দবোধ, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা, মানবের মুখে হাসি।

আর যাঁহার এই জগৎ সৃষ্টি, জগৎ-লীলা সেই সচ্চিদানন্দই জগতের হিতার্থ আত্ম-মায়াযোগে দেহধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন, ইহা যদি আমরা বিশ্বাস করি তবে আমরা পাই শ্রীকৃষ্ণ—'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ', শ্রীকৃষ্ণ সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। ত্রিবিধ বিভাবে তাঁহার ত্রিবিধ শক্তি—সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী। উহাদের প্রকাশ—কর্ম্মে, জ্ঞানে ও আনন্দে; ফল—অখণ্ড প্রতাপ, অতর্ক্য প্রজ্ঞান ও অজস্র প্রেম। তিনি একাধারে প্রতাপঘন, প্রজ্ঞানময়, প্রেমঘন। তাঁহার সমগ্র লীলায় আমরা এই ত্রিবিধ শক্তিরই পরিচয় পাই। বিশেষভাবে ব্রজলীলায় তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ, মথুরা-দ্বারকালীলায় সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ, এবং গীতাজ্ঞান প্রচারে তাঁহার সংবিৎ শক্তির পরিচয়।

ব্রজলীলায় তিনি রসময়, আনন্দময়, প্রেমঘন। মথুরা-দ্বারকা-লীলায় তিনি সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ, প্রতাপঘন; গীতা-গুরুরূপে তিনি সর্ব্ববিৎ প্রজ্ঞানঘন। এই সকল তত্ত্বই আমরা এই গ্রন্থে প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানগুরুরূপে স্বীয় শিষ্য ও সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি যে অপূর্ব্ব যোগধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়াছেন, যাহা ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, সেই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-তত্ত্বটিও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমরা অনধিকারী ; সাধনশক্তিহীন, ভক্তিহীন, কামনা-বাসনার দাস, সংসার-কীট আমরা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব কিরূপে বুঝিব আর তাঁহার উপদিষ্ট নিষ্কাম কর্ম্ম ও নির্গুণা ভক্তির মর্ম্মই বা কি বুঝিব, আর কি বুঝাইব ? তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া নিজ শিক্ষার জন্য এ সকল আলোচনা করি। সুধী ভক্তগণ আমাদের এই অনধিকার চর্চ্চা ক্ষমা করিবেন।

কৃপা-ভিখারী
শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

এই গ্রন্থ-প্রণয়নে বেদোপনিষৎ, পুরাণ-ইতিহাসাদি প্রাচীন ঋষিশাস্ত্র এবং পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণবশাস্ত্রাদি ব্যতীতও আধুনিক কালে প্রকাশিত বহু ধর্ম্মগ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি পাঠে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এতৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র, ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘগুরু শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, বেদান্ত-রত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক-প্রবর ভাগবতকুমার শাস্ত্রী ও শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ প্রমুখ বহু ধর্ম্মাচার্য্য ও ধর্ম্ম-সাহিত্যিকগণের পুস্তক প্রবন্ধাদি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। এই সকল গ্রন্থের প্রকাশকগণের ঔদার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন কোন গ্রন্থ হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেও সাহসী হইয়াছি। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চির-ঋণে আবদ্ধ আছি। —শ্রীজঃ

ওঁ তৎসৎ

ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকর্ম্মিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥

প্রথম অধ্যায়

সচ্চিদানন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্ব্বশাস্ত্রের সারতত্ত্ব—সচ্চিদানন্দ

প্রঃ। মানব-জীবনের লক্ষ্য কি? ভাগবত জীবন কাহাকে বলে?

উঃ। শাস্ত্রালোচনা কর, উত্তর পাইবে। সকল শাস্ত্রেই এই কথারই উত্তর। শাস্ত্রালোচনার তুই দিক্—এক তত্ত্ব-নির্দ্দেশ, আর সাধন-নির্দ্দেশ অর্থাৎ দর্শন ও আচরণ। আর্য্য ঋষিগণ অধ্যাত্মসাধনা বলে যে অমূল্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ তাঁহারা গ্রন্থাকারে রাখিয়া গিয়াছেন। আত্মার স্বরূপ কি, ঈশ্বরের স্বরূপ কি, ঈশ্বরের সহিত জীবজগতের সম্বন্ধ কি, জীবের জন্ম-মৃত্যুর অর্থ কি, অমৃতত্ব কি, ভূমানন্দ কি, মানব-জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য কি, কিরূপে সে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে হয়, এ সকল বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে—উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণ-ইতিহাসে, সর্ব্বোপরি সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূতা শ্রীগীতায় যেরূপ সর্ব্বতোমুখী সুগভীর তত্ত্বালোচনা আছে, অন্য কোন ধর্ম্মসাহিত্যে তাহা দেখা যায় না। গীতা-বেদান্তাদি শাস্ত্র জগতের নানাভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই তাত্ত্বিকগণকর্ত্তৃক সমাদৃত হইতেছে। আমরা ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা বলিয়া কত গৌরব অনুভব করি। কিন্তু এ সকল শাস্ত্রের সহিত প্রকৃষ্ট পরিচয় শিক্ষিতগণের মধ্যেও অতি অল্প লোকেরই দেখা যায়। ইহা তুঃখের বিষয়।

প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনা

প্রঃ। কিন্তু সে শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া তত্ত্বামৃত উত্তোলন করা সহজ কথা নহে। বেদ-সংহিতায় এক কথা, উপনিষদে অন্য কথা, দর্শনশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন কথা,

বিবিধ পুরাণে বিভিন্ন কথা, মহাভারতে না আছে এমন কথাই নাই, শ্রীগীতাতেও প্রায় তাই; আর এই সকল গ্রন্থের উপর কুশাগ্রবুদ্ধি পণ্ডিতগণের এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাচার্য্যগণের কত ভাষ্য টীকা টীপ্পনী, কত রকম বাদ-বিতণ্ডা—সে গহন শাস্ত্রারণ্যে প্রবেশ করিলে দিশাহারা হইতে হয়। কিরূপে বুঝিব সে বস্তু কেমন? একটা ধর্ম্মের মধ্যে এত বিভিন্ন মতবাদ জগতের অন্য কোন ধর্ম্মসাহিত্যে দেখা যায় না।

হিন্দুশাস্ত্রের বৈচিত্র্য

উঃ। একটা ধর্ম্ম কি বল। হিন্দুধর্ম্ম বলিতে শ্রীষ্টীয়াদি ধর্ম্মের ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন মহাপুরুষ-প্রবর্ত্তিত একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মমত বুঝায় না। ইহাতে ঐরূপ নানা ধর্ম্মমতের সমাবেশ আছে। শাস্ত্রসমুদ্র যে বলিতেছ সে কথা ঠিক। যুগ যুগ ব্যাপিয়া ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা নানারূপ ঋজু বক্র বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়া হিন্দুশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। বৈচিত্র্যই উহার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই বিচিত্রতার মধ্যে তত্ত্বতঃ বিরোধ নাই, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আছে। সকলই এক পরতত্ত্বে মিলিত হইয়াছে। সেই পরতত্ত্ব, এই সকল বিভিন্ন শাস্ত্রের সারমর্ম্ম, কেবল হিন্দুশাস্ত্রের নয়, জগতের সকল দেশের, সকল কালের সকল অধ্যাত্ম শাস্ত্রের যাহা সারতত্ত্ব তাহা ঋষি-প্রজ্ঞান একটি কথায় বলিয়া দিয়াছেন। সে কথাটি বুঝিলে সকল শাস্ত্রই অধিগত হয়। কেননা সকল শাস্ত্রেই তাহারই বিস্তার, ব্যাখ্যা ও বিবৃতি।

সকল শাস্ত্রেরই এক মূল তত্ত্বই লক্ষ্য

প্রঃ। একটি মাত্র কথায়! সে কথাটি কি? শুনিলে কিছু বুঝিব কি?

উঃ। শোনা তো বোধ হয় আছেই; সে কথাটি **সচ্চিদানন্দ**। বস্তুতঃ একটি কথাও নয়, এখানে তিনটি কথা—সৎ, চিৎ, আনন্দ।

প্রঃ। তিনটিই হউন আর একটিই হউন, কিছুই কিন্তু বুঝিলাম না। 'সচ্চিদানন্দ' কথাটি তো গ্রন্থে পড়ি, বক্তার মুখে শুনি, নিজেও আবৃত্তি করি, কিন্তু তত্ত্বটির যে সুস্পষ্ট জ্ঞান হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না।

উঃ। তত্ত্বের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভব যাহাকে শাস্ত্রে অনেক সময় বলা হয় বিজ্ঞান, তাহা কেবল শাস্ত্রপাঠে বা শ্রবণে হয় না। শ্রবণের পরেও চাই সাধন, মনন, আর সর্ব্বোপরি তাঁহার কৃপা। তবে কতকটা পরোক্ষ জ্ঞান শাস্ত্র-পাঠ বা শাস্ত্রার্থ শ্রবণেই হয়। সে সম্বন্ধে কিছু বলা যায় মাত্র।

সৎ-চিৎ-আনন্দ অস্তি-ভাতি-প্রিয়

তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। এই তিনটি বিভাব—'অস্তি' 'ভাতি' 'প্রিয়' এই তিন কথায়ও প্রকাশিত হয়। তিনি সৎস্বরূপ তাই 'অস্তি', তিনি চিৎস্বরূপ তাই 'ভাতি', তিনি আনন্দস্বরূপ, তাই 'প্রিয়'। একটি একটি করিয়া আলোচনা করা যাউক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিনি সৎস্বরূপ, সত্যস্বরূপ—সত্যং

প্রথম কথা হইল, তিনি সৎ, অস্তি, আছেন।

প্রঃ। তিনি আছেন, থাকুন। তাহাতে আমার কি, কাহার কি? জীব-জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি? এ কথায় ঈশ্বর-তত্ত্ব আর বেশী কি বলা হইল?

উঃ। প্রায় সবই বলা হইল। তিনি আছেন। কি ভাবে আছেন? কোথায় আছেন? আমি এখানে আছি, তুমি ওখানে আছ, তিনি স্বর্গে আছেন (ওঁরা যেমন বলেন, God is in Heaven), এইরূপ কি? না, তা নয়। তিনি আছেন অর্থ তিনিই আছেন—আমাতে, তোমাতে, জগতে, সর্ব্বত্রই তিনিই আছেন, তাঁহা ছাড়া কিছু নাই। তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন ('যেন সর্ব্বমিদং ততম্'—গীঃ ১০।৪৬, ৯।৪)। সমস্তই তাঁহাতেই গাথা আছে, 'যথা সূত্রে গাঁথা মণিচয়' ('ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব'—গীঃ ৭।৭)। ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকতা, সর্ব্বানুগতা (Immanence of God) হিন্দুশাস্ত্রের একটি মূলতত্ত্ব, আর যা কিছু এই মূলতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সর্ব্বত্রই এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রুতি বলেন, এ সমস্তই ব্রহ্ম ('সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'); বিষ্ণুপুরাণ বলেন, জগৎ বিষ্ণুময় ('সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ'), শ্রীগীতা বলেন, বাসুদেবই সমস্ত ('বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি'—গীঃ ৭।১৯)। সর্ব্বত্রই বিভিন্ন ভাষায় একই কথা।

ঈশ্বরের সর্ব্বানুগতা
ভূমাবাদ

আর এক কথা এই, যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন তিনিই সৎ, সত্য; আর যা কিছু তাহা অসৎ। অস্ ধাতু হইতে সৎ এবং 'অস্তি' শব্দ আসিয়াছে। অস ধাতুর অর্থ থাকা। যাহা থাকে তাহাই সৎ, নিত্য। যাহা থাকে না, আসে যায় তাহা অসৎ। যাহা সৎ তাহার কখনও অভাব হয় না ('নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' —গীঃ ২।১৬), তাহা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে, অর্থাৎ ইহা নিত্য, তিন কালেই সত্য ('ত্রিসত্যং'—ভাঃ)। আর যাহা অসৎ তাহার ত্রৈকালিক অস্তিত্ব নাই, তাহার সম্বন্ধে 'অস্তি' আছে, এ কথা বলা চলেনা ('নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' —গীঃ ২।১৬)। কাজেই সৎ বা 'অস্তি' এই লক্ষণের দ্বারা সেই পরম সত্যই লক্ষ্য করা হয়, কেননা তাঁহা ছাড়া অন্য কিছুর পারমার্থিক সত্তা নাই।

প্রঃ। এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ, জীব-জগৎ যাহা দেখিতেছি তাহা কি অসৎ, মিথ্যা বলিতে হইবে? যাহা চাক্ষুষ দেখিতেছি তাহা কি নাস্তি, নাই বলিতে হইবে?

উঃ। এ সম্বন্ধে দুইটি শ্রুতিবাক্য আছে—

১। 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'—ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়।

২। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এ সমস্তই ব্রহ্ম।

এই দুইটি শ্রুতিবাক্য সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু ইহাদের ব্যাখ্যায় বৈদান্তিকগণের মধ্যে মর্ম্মান্তিক মতভেদ আছে।

একপক্ষে বলেন, ব্রহ্ম কেবল এক নহেন, তিনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ তাহা ভিন্ন অন্য কিছু নাই। তাহা অদ্বৈত তত্ত্ব, সমস্ত দ্বৈতবর্জ্জিত, তাহাতে নানাত্ব নাই ('নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—কঠ), তিনি ভূমা। এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ, এই বহু-বিভক্ত জগৎ যাহা আমরা দেখি, ইহার বাস্তবিক সত্তা নাই, ইহা মিথ্যা। এক ব্রহ্মই আছেন, তিনিই একমাত্র সৎ, সত্য বস্তু। ভ্রমবশতঃ সেই ব্রহ্ম বস্তুতেই জগতের অধ্যাস হয়, যেমন ঈষৎ অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, যেমন মরীচিকায় জল ভ্রম হয়। এই ভ্রমের কারণ মায়া বা অজ্ঞান। অজ্ঞান দূর হইলে ব্রহ্ম উদ্ভাসিত হয়েন। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন অলীক, স্বপ্ন ভাঙ্গিলে আর উহার বোধ থাকে না, এই জগৎও সেইরূপ স্বপ্নবৎ অলীক, অজ্ঞান দূর হইলে উহার জ্ঞান থাকে না। ('অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোঽয়ং অখিলং জগৎ'—পঞ্চদশী)। ইহাকে বলে **মায়াবাদ** বা **বিবর্ত্তবাদ**।

মায়াবাদ ও পরিণামবাদ

অপর পক্ষ বলেন, ব্রহ্ম অদ্বিতীয় তাহা ঠিক, ব্রহ্মই এই সমস্ত হইয়াছেন। ('তৎ সর্ব্বমভবৎ'), তিনি আপনিই আপনাকে এইরূপ করিয়াছেন ('তদাত্মানং স্বয়মকুরুত'—তৈত্তি ২।৭), তিনি আপনাকে জগৎরূপে পরিণত করিয়াছেন। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নহে, জগৎ ব্রহ্মের শরীর ('জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে')। ইহাকে বলে **পরিণামবাদ**। এই জগৎ অসৎ এই অর্থে যে, ইহা নশ্বর, ইহার ত্রৈকালিক অস্তিত্ব নাই। ('জগৎ তো মিথ্যা নয় নশ্বর মাত্র কয়'—চৈঃ চৈঃ)। বস্তুতঃ এইরূপ বিচারে বলা যায় সত্তা ত্রিবিধ—প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক, পারমার্থিক। মায়াবাদীদের মতে জগতের যে সত্তা তাহা পারমার্থিক তো নহেই, ব্যবহারিকও নহে, উহা প্রাতিভাসিক (apparent) অর্থাৎ মিথ্যা। পরিণামবাদীদের মতে জগতের সত্তা ব্যবহারিক (phenomenal)। উহা অসৎ, কেননা উহা বিনষ্ট হয়। এই সমস্ত বিনষ্ট হইলেও যে সত্তা থাকে, ('বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং'—গীঃ ১৩।২৭) তাহাই পারমার্থিক সত্তা। সেই সত্তা যাঁহার তিনিই সৎ, সত্যস্বরূপ।

সৎ ও অসৎ

প্রঃ। তিনিই যখন সমস্ত, তিনিই যখন সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহা ছাড়া যখন কিছু নাই, তখন তিনি সৎ এবং জীব-জগৎ অসৎ, এ কথাই বা বলা কিরূপে চলে? এক বস্তুই সৎ ও অসৎ, সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বাতিরিক্ত কিরূপে হন?

উঃ। ঠিক কথাই বলিয়াছ। শ্রীমদ্ভাগবতে একটি সুন্দর উপমাদ্বারা এই কথারই উত্তর দেওয়া হইয়াছে।—

একস্ত্বমেব সদসদ্দ্বয়মদ্বয়ঞ্চ স্বর্ণং কৃতাকৃতমিবেহ ন বস্তুভেদঃ। ভাঃ ৮।১২।৮

এক অদ্বয় বস্তুই অজ্ঞানতাবশতঃ সৎ ও অসৎ এই দুই রূপে কল্পিত হয়, কৃতাকৃত স্বর্ণের ন্যায়; কৃত অর্থাৎ কঙ্কণ-কুণ্ডলাদিরূপে নির্ম্মিত স্বর্ণ এবং অকৃত অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিত স্বর্ণ (আস্ত সোনা) রাসায়নিকের নিকট বা পোদ্দারের নিকট এক বস্তুই, কিন্তু মেয়েদের নিকট বিভিন্ন। সবই এক কিন্তু যতক্ষণ অজ্ঞানতাবশতঃ পার্থক্যবোধ আছে ('অজ্ঞানতস্ত্বয়ি জনৈর্বিহিতো বিকল্পঃ'—ভাঃ ৮।১২।৮), ততক্ষণই সৎ ও অসৎ, ক্ষর ও অক্ষর, এই ভেদ অবলম্বন করিয়াই তত্ত্বালোচনা করিতে হয়। বস্তুতঃ, তত্ত্বদৃষ্টিতে সৎ (নিত্য, অক্ষর আত্মা) এবং অসৎ (অনিত্য, ক্ষর জগৎ) উভয়ই তিনি; তাই শ্রীগীতায় ভগবদুক্তি—অর্জ্জুন, সৎ ও অসৎ উভয়ই আমি ('সদসচ্চাহমর্জ্জুন'—গীঃ ৯।১৯)। সর্ব্বত্রই এক সত্তা, এক আত্মা, এক পূর্ণ প্রাণের নর্ত্তন ('প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি'—মুঃ ৩।১।৪)।—

'এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গ-মালা রাত্রিদিন ধায়,
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দ তান লয়ে
নাচিছে ভুবনে—' রবীন্দ্রনাথ।

জীব সেই নিত্য সত্য অনন্ত অফুরন্ত পূর্ণ প্রাণের এক কণা। তাই জীবও পূর্ণ হইতে চায়, অফুরন্ত হইতে চায়, অমর হইতে চায়, সৎ হইতে চায়। (অস্ ধাতু হইতে সৎ, অস্ ধাতুর অর্থ থাকা) জীব থাকিতেই চায়, বাঁচিতেই চায়, মরিতে কে চায়? লোকে অতি দুঃখে পড়িলেও বলে, মরিলেই বাঁচি—মরিয়াও বাঁচিতেই চায়। দেহ জরাজীর্ণ, মৃত্যু আসন্ন, তখনও তাহার জীবনের আশা বলবতীই থাকে। ('যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী'—ভাঃ ১০।১৪।৫৩)। জীবের এই যে থাকিবার ঝোঁক, বাঁচিবার ঝোঁক, অমর হইবার আকাঙ্ক্ষা, অফুরন্ত প্রাণ পাইবার প্রেরণা—ইহা জীব পাইল কোথা হইতে? মর জীব, ক্ষর জীব, সে অমর অক্ষর হইতে চায় কোন্ সাহসে?

জীবের অমৃতত্বের বাসনা অন্তরাত্মারই প্রেরণায়

কাহার প্রেরণায়? তাহার অন্তরপুরুষের প্রেরণায়। কারণ সে সেই অক্ষরই, বা অক্ষরেরই অংশ ('ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত'—গীঃ ১৩।২ ; 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'—গী ১৫।৭)। সে অমৃতের পুত্র ('অমৃতস্য পুত্রাঃ'), তাই সে অমৃতের সন্ধান চায়, বিন্দু সিন্ধুতে মিলিতে চায়। 'মহামায়ার ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ি কাঁদে'—এই অনিত্য অসৎ মৃত্যুময় দেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সে ব্যাকুল, তাই সে নিত্য হইতে চায়, আসন্ন মরণের মধ্যে থাকিয়াও চিরজীবন চায়। কিন্তু সে তাহার 'আমি'টাকে দেহের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছে, কাজেই দেহটা লইয়াই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে চায়। ইহার নাম দেহাত্মবোধ। এটিই মায়ার ফাঁদ। কিন্তু 'আমি' তো দেহ নই। আমরা বলি, 'আমার দেহ', 'আমি দেহ' এ কথা তো বলি না। ইহাতেই প্রকাশ পায়, 'আমি' এবং দেহ পৃথক্ বস্তু। দেহ অসৎ, নশ্বর, মৃত্যুময়। 'আমি' (আত্মা) সৎ, অবিনশ্বর, অমৃত। এই জ্ঞানের নাম দেহাত্মবিবেক। কিন্তু মায়াবশতঃ দেহাত্মবোধ বিদূরিত না হওয়ায় জীব অসতের মধ্যে আছে, মৃত্যুর মধ্যে আছে। তাই বৈদিক প্রার্থনা মন্ত্র—

কেননা জীব অমৃতের সন্তান

দেহাত্মবোধ ও দেহাত্মবিবেক

অসতো মা সদ্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।

—আমাকে অসৎ হইতে সতে লইয়া যাও। আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

নিত্য হওয়ার, সত্য হওয়ার এই প্রার্থনামন্ত্রটিই আধুনিক ভারতের ঋষি-কবিও অনুপম ভাষায় বিশদ করিয়াছেন :—

আমার চিত্ত তোমায় নিত্য হবে
সত্য হবে—
ওগো সত্য, আমার এমন সুদিন
ঘট্‌বে কবে?
তোমায় দূরে সরিয়ে, মরি
আপন অসত্যে,
কী যে কাণ্ড করি গো সেই
ভূতের রাজত্বে।
আমার আমি ধুয়ে মুছে
তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে,
সত্য, তোমায় সত্য হবো,
বাঁচবো তবে,
তোমার মধ্যে মরণ আমার
ম'রবে কবে।—গীতাঞ্জলি

জীব সৎ হইতে আসিয়াছে, কাজেই সৎ হওয়ার বাসনা তাহার স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু সে সত্যকে ভুলিয়া অসত্যে পড়িয়া মরিতেছে, ভূতের রাজত্বে অর্থাৎ পঞ্চভূতময় অসৎ, অনিত্য দেহটাকে লইয়া এবং দেহটার কামনা-বাসনা লইয়া 'আমি' 'আমার' করিতেছে, আর কত কী কাণ্ড করিতেছে। এই 'আমি', 'আমার' যখন ধুয়ে মুছে যাবে তখনই সত্যপ্রতিষ্ঠা হবে, 'তোমার' মধ্যে 'আমার' মরণ হবে। নবজীবন হবে, চিরজীবন হবে। সে সত্য তো আমার বাহিরে নয়, 'আমার'টি কেবল আবরণ, তাই আরো বিশদ করিতেছেন—

'হে সত্য, আমার এই অন্তরাত্মার মধ্যেই যে তুমি অন্তহীন সত্য—তুমি আছ। এই আত্মায় তুমি যে আছ—দেশে কালে গভীরতায় নিবিড়তায় তার আর সীমা নাই। এই আত্মা অনন্তকাল এই মন্ত্রটি ব'লে আসছে—সত্যং। তুমি আছ—তুমিই আছ। আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা হতে এই যে মন্ত্রটি উঠ্‌ছে—তা যেন আমার মনের এবং সংসারের অন্যান্য সমস্ত শব্দকে ভ'রে সকলের উপর জেগে ওঠে—সত্যং সত্যং সত্যং। সেই সত্যে আমাকে নিয়ে যাও,—সেই আমার অন্তরাত্মার গূঢ়তম অনন্ত সত্যে—যেখানে "তুমি আছ" ছাড়া আর কোনো কথাটি নেই।'

এ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ উপনিষৎ বা বেদান্তশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই এই তত্ত্বালোচনা হইল। এক্ষণে পুরাণশাস্ত্রের আলোকেও তত্ত্বটির আলোচনা করা আবশ্যক। পুরাণে বেদান্তেরই ব্যাখ্যান। শাস্ত্রে পরতত্ত্বের দ্বিবিধ বর্ণনা আছে—নির্গুণ ও সগুণ, অব্যক্ত ও ব্যক্ত, অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত। সংক্ষেপে পরমহংসদেবের কথায়, নিত্য আর লীলা। সগুণ, নির্গুণ—ভিন্ন তত্ত্ব নহে। নিত্যস্বরূপে যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, লীলায় তিনিই গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হয়েন। 'লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ—ভাঃ ৩।৭।২)। স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তৃরূপে তিনি সগুণ ('জন্মাদ্যস্য যতঃ'—ব্রঃ সূঃ)। ইহা তাঁহার জগৎ-লীলা, আবার লোকহিতার্থ অবতার লীলাও আছে। শ্রীগীতায় ভগবদুক্তি আছে—আমি জন্মরহিত হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে (মায়ায়) অধিষ্ঠান করিয়া লোকহিতার্থ আবির্ভূত হই (গীঃ ৪।৬)। তাই পুরাণে দেখি, যিনি নির্গুণ-বিভাবে নির্ব্বিশেষ সত্তামাত্র,—'সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং' (ভাঃ), যিনি অজ, অব্যয়াত্মা, যিনি অব্যক্তরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন (গীঃ ৯।৪) তিনিই যখন কংস-কারাগারে দেবকীর গর্ভে আত্মমায়ায় আবির্ভূত হইলেন, তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং মুনিঋষিগণ দেবকীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার

নিত্য ও লীলা

স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তবের প্রথম শ্লোকেই এই সত্যস্বরূপের অনুপম ব্যাখ্যান।—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যং ঋতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥ ভাঃ ১০।২।২৬

—'ভগবন্, আপনি সত্যব্রত, সত্যই আপনার সঙ্কল্প, সত্যই আপনার প্রাপ্তির সাধন, আপনি ত্রিসত্য (অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনকালেই সত্য, নিত্যবর্ত্তমান) আপনি সত্যের কারণ, সত্যে অধিষ্ঠিত, সত্যের সত্য (অর্থাৎ এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ, জীবজগৎ যাহা সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে, আপনিই ইহার উৎপত্তির কারণ, আপনিই ইহাতে অন্তর্যামিরূপে, নিয়ন্তৃরূপে অধিষ্ঠিত, আপনার সত্তায়ই ইহা সত্তাবান্, আপনিই মূল সত্য); ঋত ও সত্য, আপনিই এই দুইএর নেত্রস্বরূপ। সর্ব্বতোভাবেই আপনি সত্যাত্মক; আমরা সত্যস্বরূপ আপনার শরণ লইলাম।'

যিনি দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হইলেন তিনি কে, কী বস্তু, তাহাই পুরাণকার প্রথমেই বলিয়া দিলেন। উপনিষদে যে পরতত্ত্ব সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত, পুরাণের আখ্যানে তাহাই লীলায়িত করিয়া ব্যাখ্যাত। আখ্যানভাগ যে যেভাবে হয় গ্রহণ করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, তত্ত্বটি বুঝিলেই হয়। এখানে বিশেষভাবে সেই পরমপুরুষের একটি বিভাবের (সৎস্বরূপের) বর্ণনা।

আর একটি পৌরাণিক আখ্যান বলি। এই শ্রীকৃষ্ণবস্তুটির মহিমা পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মা একদিন গোকুলের গোবৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করিয়া স্থানান্তরে মায়াবলে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন? তিনিও তো অদ্বিতীয় মায়াবী, ঐন্দ্রজালিক, মায়াবলে জগৎ-সৃষ্টি করিয়া তাহা শাসন করিতেছেন ('য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ'; 'অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ'—শ্বেত ৩।১, ৪।৯।১০)। তিনিও মায়া বিস্তার করিলেন। বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বর নিজেই ঐ সকল বৎস ও বৎসপাল উভয়ই হইলেন। ('উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ'—ভাঃ ১০।১৩।১৮)। যেটি যেমন ঠিক তেমনি রহিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া যথারীতি ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর (ব্রহ্মার একত্রুটি (পঞ্চক্ষণ) পরিমিত কাল) চলিয়া গেল। তখন ব্রহ্মা আসিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ গোপাল ও গোবৎসগণ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। 'এ সব কোথা হইতে আসিল? আমি যাহাদিগকে হরণ করিয়া নিয়াছি তাহারা তো এখনও মায়া-শয্যায় শায়িত রহিয়াছে, কোন্‌গুলি প্রকৃত আর কোন্‌গুলি মিথ্যা?' ('সত্যাঃ কে কেতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন')—তিনি মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন

এমন সময় সহসা দেখেন আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! গোপাল-গোবৎসাদি সকলেরই বর্ণ ঘনশ্যাম, সকলেরই পরিধানে পীত পট্টবস্ত্র, সকলেই চতুর্ভুজ, সকলেরই হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম; সকলেরই মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে হার ও বনমালা—

ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ॥
চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ॥ ভাঃ ১০।১৩।৪৬।৪৭

ব্রহ্মা যা কিছু দেখেন, সকলই বিষ্ণুমূর্ত্তি, সকলই একরূপ, তাহা সচ্চিদানন্দরূপ, অনন্তরূপ ('সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ')। পরে আবার দেখিলেন, সমস্তই এক হইয়া গেল। যে পরব্রহ্মের জ্যোতিতে এই চরাচর বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, ব্রহ্মা এইরূপে এককালেই অখিল জগৎ তন্ময় দর্শন করিলেন ('এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনাঽখিলান্। যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্')। তখন ব্রহ্মা 'একি!' এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ('কিমিদমিতি বা মুহ্যতি সতি')। সেই মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুত মায়া-যবনিকা তুলিয়া লইলেন। ব্রহ্মা অতি কষ্টে চক্ষু উন্মীলন করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন, পরে অল্পে অল্পে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিত-কলেবরে গদ্গদবাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন—

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥
ভাঃ ১০।১৪।২৩

তুমি অদ্বিতীয়,—তুমিই সত্য, আত্মা, পুরুষ, পুরাণ, অনাদি, অনন্ত, নিত্য, অদ্বয়, অক্ষর (**সৎস্বরূপ**); তুমি স্বয়ংজ্যোতি, নিরুপাধি, নিরঞ্জন (**চিৎস্বরূপ**); তুমি ভূমানন্দ, অমৃত (**আনন্দস্বরূপ**)।

এ শ্লোকে তিনটি বিভাবেরই বর্ণনা আছে।

শ্রীভাগবতের অন্যান্য স্তবের ন্যায় এ সুদীর্ঘ স্তবটিও একাধারে সুগভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ ও শুদ্ধভক্তিরসে সমুজ্জ্বল। তত্ত্বালোচনা-প্রসঙ্গেই এখানে সংক্ষেপে আখ্যানটি সহ একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত হইল। সে তত্ত্বটি কি?—উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে তিনি অদ্বিতীয় মায়াবী, ঐন্দ্রজালিক ('জালবান্')। মায়া-শক্তিদ্বারাই তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সৃষ্টিতে নূতন কিছুর উদ্ভব হয় নাই, তিনি নিজেই নিজকে এইরূপ করিয়াছেন, এক তিনি আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

২—

('তদাত্মানং স্বয়মকুরুত')। এ সমস্তই তিনি ('সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'), জগৎ বিষ্ণুময় ('ইদং বিষ্ণুময়ং জগৎ')। ব্রহ্মার বিষ্ণুমূর্ত্তির দর্শনে এই তত্ত্বটিই পরিস্ফুট।

তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন বলিয়া **কৃষ্ণ** ('ত্রিজগন্মাসাকর্ষিমূরলীকলকূজিতঃ'); সকলের হৃদয় হরণ করেন বলিয়া এবং সর্ব্ব অমঙ্গল হরণ করেন বলিয়া **হরি**; তিনি নারের অয়ন—সর্ব্বদেহীর আত্মা বলিয়া **নারায়ণ** ('নারায়ণস্ত্বং সর্ব্বদেহিনামাত্মা'); তিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া **বিষ্ণু, ব্রহ্ম** (বিষ্‌-বিস্তারে; 'বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম'); তিনি সর্ব্বভূতে বাস করেন বলিয়া **বাসুদেব** ('সর্ব্বভূতাধিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততোহহম্—মভা. শা, ৩৪১।৪১)। সকলই এক তত্ত্ব—যিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিনি চিৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ

যিনি সৎ, তিনিই চিৎ, ভাতি। তাঁহার ভাতিতেই সমস্ত ভাস্বর ('তস্য ভাসা সর্ব্বমেতদ্বিভাতি'—শ্বেত ৬।১৪)। তিনি স্বপ্রকাশ, স্বতঃচেতন, সকলের চেতয়িতা, তাহাদ্বারাই বিশ্ব চেতন হয় ('যেন চেতয়তে বিশ্বং—ভাঃ ৮।১।৯, 'যত এতচ্চিদাত্মকম্'—ভাঃ ৮।৩।২)। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, সেই চিদাত্মার প্রেরণায়ই আমাদের বুদ্ধির প্রেরণা ('ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ')। তিনি আত্মায় অধিষ্ঠিত জ্ঞানদীপ ('অধ্যাত্মদীপঃ'—ভাঃ ১০।৩।২১), সেই জ্ঞানেই আমাদের তমোনাশ, অজ্ঞানের নাশ ('নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা'—গীঃ ১০।১১)।

কিন্তু সেই চিৎস্বরূপের প্রকাশ সর্ব্বত্র একরূপ নয়। উপাধি বা আধারবিশেষে বিভিন্ন রূপ হয়। মনুষ্যের মধ্যে যে চিতির প্রকাশ, জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ, তাহাও অপরিস্ফুট, অপূর্ণ, কারণ উহা প্রকৃতি-জড়িত। প্রকৃতির তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ, মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ('সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং' ইত্যাদি গীঃ ১৫।১৭)। এই তিনটি গুণ পৃথক্ থাকেনা, একত্র মিশ্রিত থাকে। সুতরাং অতি বড় ধীমান্ জ্ঞানী ব্যক্তিরও যে জ্ঞান তাহাও অজ্ঞান-মিশ্রিত, উহা বিজ্ঞান নহে, উহাদ্বারা পরতত্ত্বের উপলব্ধি হয় না। এই হেতু সকল সাধনারই উদ্দেশ্য রজস্তমোগুণ দমিত করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ সাধন করা, 'নিত্যসত্ত্বস্থ' হওয়া (গীঃ ২।৪৫)।

জীব যতদিন প্রকৃতির রজস্তমোগুণের অধীন আছে, ততদিন সে অজ্ঞানের মধ্যে অন্ধকারের মধ্যেই আছে। তাই বৈদিক মন্ত্রে প্রার্থনাবাণী—

'তমসো মা জ্যোতির্গময়'

—আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও।

আর আধুনিক ভারতের ঋষি-কবিও অনুপম ভাষায় সেই প্রার্থনাই বিশদ করিয়াছেন।—

অন্তর মম বিকশিত করো,
অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,
নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।

'হে জ্যোতির্ম্ময়—আমার চিদাকাশে তুমি 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ', —তোমার অনন্ত আকাশের কোটি সূর্য্যালোকে সে জ্যোতি কুলোয় না—সে জ্যোতিতে আমার অন্তরাত্মা চৈতন্যে সমুদ্ভাসিত। সেই আমার অন্তরাকাশের মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমাকে আদ্যোপান্ত প্রদীপ্ত পবিত্রতায় ক্ষালন করে ফেলো—আমাকে জ্যোতির্ম্ময় করো—আমি আমার অন্য সমস্ত পরিবেষ্টনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সেই শুভ্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ জ্যোতিঃশরীরকে লাভ করি।'

তত্ত্বে যিনি চিৎস্বরূপ, ভক্তচিত্তে তিনি চিদ্ঘন, চিন্ময়রূপ—

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন,
কিবা অপরূপ ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।
নব রাগে রঞ্জিত, কোটীশশী বিনিন্দিত,
কিবা বিজলী চমকে, সে রূপ-আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।
হৃদি-কমলাসনে ভাব ঐ চরণ,
দেখ শান্তমনে প্রেম-নয়নে অপরূপ প্রিয়দর্শন।
চিদানন্দরসে ভক্তিযোগাবেশে হওরে চির মগন।

চিৎ ও অচিৎ—জীব ও জড়

প্রঃ। সেই চিৎস্বরূপ তো সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন ('সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি' —গীঃ ১৩।১৩), তাঁহাদ্বারাই বিশ্ব চেতন হয়, কিন্তু জগতে তো দেখি চিৎ ও অচিৎ,

চেতন ও অচেতন, জীব ও জড়—এই দুই স্পষ্ট বিভাগ। সর্ব্বত্রই চিদাত্মার অনুপ্রবেশ হইলে একভাগ সচেতন প্রাণবন্ত, অন্যভাগ অচেতন প্রাণহীন থাকে কিরূপে?

উঃ। জীবে ও জড়ে যে পার্থক্য তাহা প্রাতিভাসিক, বাস্তবিক নহে (apparent, not real)।

প্রঃ। লৌকিক দৃষ্টিতে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও পার্থক্যটা এত সুস্পষ্ট যে উহা অস্বীকার করাটা বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে।

উঃ। তা ঠিক, এই পার্থক্য অবলম্বন করিয়াই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রে পদার্থকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—সাঙ্গ বা সেন্দ্রিয় (organic) এবং নিরঙ্গ বা নিরিন্দ্রিয় (inorganic)। মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ্ (Animal kingdom and Vegetable kingdom) সাঙ্গ বা সেন্দ্রিয়। ধাতু, মৃত্তিকা, পাষাণাদি (Mineral kingdom) নিরঙ্গ বা নিরিন্দ্রিয়।

সৃষ্টিতত্ত্ব—ক্রমবিকাশবাদ

যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইল ইহার সুমীমাংসা করিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের আলোচনা করিতে হয়। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বনামখ্যাত ডার্ব্বিন সাহেবের Descent of Man নামক যুগান্তকারী পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং বিবর্ত্তনবাদ বা ক্রমবিকাশবাদ (The Evolution Theory) প্রচারিত হয়। এই মতবাদ অনুসারে জলের ক্ষুদ্র গোল জন্তুবিশেষ হইতে ক্রম-বিকাশে মানুষের উদ্ভব এবং বানর মানুষের নিকট-পূর্ব্বপুরুষ। এই মত প্রচারিত হইলে খ্রীষ্টীয় পাদরী সমাজে বিষম হুলস্থূল পড়িয়া যায়।

পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদ

কারণ উহা বাইবেল-বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক সমাজে অবান্তর বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও বিবর্ত্তনবাদের মূল তত্ত্বটি এক্ষণে সর্ব্ববাদি-সম্মত এবং বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে উহা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। সত্যের প্রসার অবশ্যম্ভাবী। বলা আবশ্যক, এই সত্যটি প্রকারান্তরে আর্যঋষিরই আবিষ্কার। অতি প্রাচীন কালে, মহাভারত-আদিও রচনার পূর্ব্বে আমাদের দেশে কাপিল সাংখ্যমত প্রচারিত হয়। ডার্ব্বিনের সৃষ্টিতত্ত্ব বা ক্রমবিকাশবাদ এবং সাংখ্যের প্রকৃতি-পরিণামবাদ প্রায় একরূপ, উভয়েই নিরীশ্বর, ঈশ্বরতত্ত্ব বাদ দিয়াই সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন। নিরীশ্বর হইলেও স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে সাংখ্যের অনেক সিদ্ধান্তই অবিকল গৃহীত হইয়াছে।* তাহার

প্রাচ্য প্রকৃতি-পরিণামবাদ

* এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থকার-সম্পাদিত শ্রীগীতা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। সৃষ্টি-রহস্য উদ্‌ঘাটনে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং প্রাচ্যের ঋষি-প্রজ্ঞান কি ভাবে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার তুলনামূলক আলোচনা করিলেই আমরা জড়-জীবের রহস্য অনেকটা বুঝিতে পারিব।

আধুনিক বিজ্ঞান বলেন, সৃষ্টির আদিতে সমস্ত অব্যক্ত, অব্যাকৃত, অবিশেষ, একবস্তুসার (homogeneous) অবস্থায় ছিল। সেই অব্যক্ত, অবিশেষ অবস্থারই ক্রমবিবর্ত্তনে এই ব্যক্ত, ব্যাকৃত, সবিশেষ, বহুবস্তুময় (heterogeneous) বিশ্বের অভিব্যক্তি। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রেও বহুপূর্ব্বে এই তত্ত্বই প্রচারিত হইয়াছিল। ('অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ'—গীঃ ৮।১৮; 'অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ' (সাঃ সূঃ); 'তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ'-বৃহ ১।৪।৭)।

আধুনিক বিজ্ঞান এই অব্যাকৃত বস্তুর নাম দিয়াছেন Protyle, ইহা ইথার সাগর (Uniform space of Ether)। বৈজ্ঞানিকগণ এই ইথার-তরঙ্গ লইয়া বহু বৎসর যাবৎ আলোচনা করিতেছেন এবং উহার সাহায্যে নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু অতি-আধুনিক মত এই যে, এই ইথার-তরঙ্গ খুব সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিকগণের কল্পনাপ্রসূত।

যাহা হৌক, আদিতে অনুরূপ কোন অবিশেষ পদার্থ ছিল এই মত সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহাই আমাদের পুরাণের কারণার্ণব, সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রকৃতি। কিন্তু প্রকৃতি পাশ্চাত্যের protyle হইতেও সূক্ষ্মতর। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে কেবল স্থূল জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা, কিন্তু প্রাচ্য দর্শন স্থূলজগতের পরে সূক্ষ্মজগৎ এবং সূক্ষ্মজগতের পরে কারণ-জগতের কল্পনা করেন। প্রকৃতি এই কারণ-জগতেরই মূল উপাদান-কারণ। ('প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রং')। উহা অনাদি, অসীম, নিরবয়ব বা নির্ব্বিশেষ। উহার অপর নাম অব্যক্ত ('অব্যক্তাদীনি ভূতানি'—গীঃ)। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, এই হেতু উহার নামান্তর ত্রৈগুণ্য ('ত্রৈগুণ্যময়ী প্রকৃতি')। ইনিই পুরাণের আদ্যাশক্তি, বৈজ্ঞানিকের অনাদি Energy.

Protyle—কারণার্ণব প্রকৃতি

বিজ্ঞান বলেন, কোন সময়ে এই নির্ব্বিশেষ ইথার-সাগরে অগণ্য বুদ্‌বুদ্ ভাসিয়া উঠিল, নির্ব্বিশেষ সবিশেষ হইল। এই ইথার বিন্দুগুলিকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ইলেক্ট্রন (Electron, তড়িতাণু)। এই ইলেক্ট্রন দ্বিবিধ—পুং (Positive) ইলেক্ট্রন, উহার নাম প্রোটন (Proton) আর স্ত্রী (Negative) ইলেক্ট্রন, উহার নাম ইয়ন (Ion)। এই দ্বিবিধ ইলেক্ট্রন নানাভাবে সংহত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পরমাণুর সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি নব্বইটি মূল পদার্থের (Elements) সৃষ্টি হইয়াছে। তারপর এই মূল পরামাণুগুলি তাপতাড়িত

আদি জড়শক্তির প্রভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় (Chemical Combination) বহুবিধ যৌগিক পদার্থের (Compounds) সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে নিরঙ্গ বা স্থাবর জগতের (Mineral Kingdom) উদ্ভব হইয়াছে। এই জড়সৃষ্টির মূলে পরমাণুর সংহতি। বিজ্ঞানমতে এই সৃষ্টি প্রাণহীন। তারপর জঙ্গম সৃষ্টি।

বিজ্ঞানমতে জড়সৃষ্টি প্রাণহীন

জঙ্গম সৃষ্টির (Animal & Vegetable kingdom) মূল কিন্তু অন্যরূপ। নিরঙ্গ বা জড়পদার্থের বিশ্লেষণে যেমন মূলে পাওয়া যায় পরমাণু, সাঙ্গ বা সেন্দ্রিয় পদার্থের বিশ্লেষণের মূলে পাওয়া যায় কোষাণু (cell)। এই কোষাণুতে দেখা যায় এক অপূর্ব্ব শক্তির খেলা—এই শক্তিই প্রাণ বা জীবন (Life)। এই হেতুই বৈজ্ঞানিকগণ সাঙ্গ ও নিরঙ্গ (organic and inorganic) পদার্থের স্পষ্ট পার্থক্য করেন।

কিন্তু ক্রম-বিবর্ত্তনে জড় হইতে প্রাণের, চেতনার, চিদ্-অণুর উদ্ভব হইল কিরূপে? প্রাণ আসিল কোথা হইতে? বিজ্ঞান এ প্রশ্নের সদুত্তর এখনও করিতে পারে নাই। বিভিন্ন মতবাদের প্রহেলিকা জটিলতর হইতেছে মাত্র, সমস্যার কোন মীমাংসা হয় নাই।

আমাদের শাস্ত্র বলেন, এ বিষয়ে কোন প্রহেলিকা, কোন সমস্যাই নাই। সজীবে অজীবে, চেতনে অচেতনে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। সকলই চিন্ময়, সকলের মধ্যেই সেই এক বস্তুই আছেন যিনি সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। আধারের পার্থক্যে, উপাধির পার্থক্যে প্রকাশের পার্থক্য হয়। কোথাও অল্প প্রকাশ, কোথাও বেশী প্রকাশ, কোথাও একেবারে অপ্রকাশ। ঐতরেয় আরণ্যকে এবং উহার সায়নভাষ্যে এ বিষয়টির অতি সুন্দর সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত আলোচনা আছে। নিম্নে ভাষ্য হইতে একটু সংক্ষিপ্তাংশ উদ্ধৃত করিলাম—

প্রাচ্যদর্শন মতে জড়-জীবে পার্থক্য নাই

'সচ্চিদানন্দরূপস্য জগৎকারণস্য পরমাত্মনঃ কার্য্যভূতাঃ সর্ব্বেঽপি পদার্থাঃ আবির্ভাবোপাধয়স্তত্রাচেতনেষু মৃৎপাষাণাদিষু সত্তামাত্রমাবির্ভবতি, নচাত্মনো জীবরূপত্বং। যে তু ওষধি বনস্পতয়ঃ জীবরূপাঃ স্থাবরা যে শ্বাসরূপপ্রাণধারিণো জীবরূপা জঙ্গমাঃ তে উভয়ে অতিশয়েনাবির্ভাবস্থানমিতি যো নিশ্চিনোতীত্যধ্যাহারঃ। মনুষ্যা গবাশ্বাদয়শ্চ প্রাণভৃতঃ, তেষাং মধ্যে পুরুষে মানুষে এব অতিশয়েনাত্মাবির্ভাবো নতু গবাশ্বাদিষু। যস্মাৎ সঃ মনুষ্যঃ অত্যন্তং প্রকৃষ্টজ্ঞানেন সম্পন্নঃ।

পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত অংশের মর্ম্ম এই :—

সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই জগৎকারণ এবং জগতের সমস্ত পদার্থেই তিনি অনুস্যূত আছেন। কিন্তু উপাধির পার্থক্যবশতঃ তাঁহার আবির্ভাব বা প্রকাশের পার্থক্য হয়। মৃত্তিকাপাষাণাদি অচেতন পদার্থে তাঁহার সত্তামাত্রের আবির্ভাব। উদ্ভিদ

স্থাবর হইলেও জীব, উহাতে তাঁহার আরো বেশী আবির্ভাব, গবাশ্বাদি প্রাণীতে আরো বেশী আবির্ভাব, মানুষে তাঁহার সর্ব্বাধিক আবির্ভাব, এই জন্য মনুষ্য প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন।

জড়বিজ্ঞান যাহাকে সেন্দ্রিয় (organic) পদার্থ বা প্রাণী বলে, সেই প্রাণীতে প্রাণীতেই কি পার্থক্য কম ? মানুষ ও ইতর প্রাণীতে কত পার্থক্য—ইতর প্রাণীর বাক্‌শক্তি নাই, অর্থাৎ উহাদের বাগিন্দ্রিয়ের সমুচিত গঠন হয় নাই। উদ্ভিদও প্রাণী, উহাদের প্রাণের ক্রিয়া আছে, এবং তজ্জন্য খাদ্য-রস গ্রহণোপযোগী শিরা প্রভৃতি আছে, কিন্তু মনুষ্যাদির ন্যায় অন্য ইন্দ্রিয়াদির সমুচিত গঠন না হওয়ায় অন্য কোন শক্তির প্রকাশ হয় নাই। নিরিন্দ্রিয় (inorganic) বা জড় পদার্থের কোন ইন্দ্রিয়ই গঠিত হয় নাই—চিদ্-অণুর আধার যে কোষাণু তাহাও প্রকৃষ্টরূপে গঠিত হয় নাই। কাজেই উহাদের মধ্যে চিদ্-অণুর প্রকাশ নিরুদ্ধ। কিন্তু একেবারে যে নাই তাহা বলা যায় না। জড়বিজ্ঞানই বলে, পদার্থের পরমাণুসমূহ গতিশীল, প্রত্যেক পদার্থ অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করে, চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ ছুটিয়া যাইয়া তাহাতে সংলগ্ন হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় (chemical affinity) বিভিন্ন জাতীয় বিশিষ্ট পরমাণু-সমূহ বিশিষ্টভাবে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বিবিধ যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। এইরূপ আকর্ষণ বা টানাটানির যে প্রেরণা তাহাকে কি বলিবে ? ইহা কোনরূপ অস্বয়ংবেদ্য বুদ্ধি বা চেতনার কার্য্য ইহা কি বলা যায় না ? জড়ে কি আকর্ষণ করে ? জড়ে কি চলে ? জড়ে কি টানে ? পরমাণু সচল হয় কেন ?

জড়েও চিৎশক্তির ক্রিয়া দেখা যায়

এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং জড়ে চিতির আভাস স্বীকার করিতেছেন। একজন নিরেট জড়বাদী স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলেন—

'Without the assumption of an atomic soul the commonest and the most general phenomena of Chemistry are inexplicable. Pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repulsion must be common to all atoms of an aggregate ; for the movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of a chemical compound can be explained only by attributing to them *sensation and will*'—Haekel.

এ সম্বন্ধে ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বলেন—Modern science itself has been driven to the same conclusion. Even in the mechanical action of an atom there is a power which can only be called an inconscient will and in all the works of nature that pervading will does inconsciently the works of intelligence. What we call mental intelligence is precisely the same thing in essence.

পূর্ব্বোক্ত ইংরেজি কথাগুলির মর্ম্ম এই যে, জড়পদার্থের মূল যে পরমাণু তাহার গতি-প্রকৃতি এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহার মধ্যেও কোনরূপ অস্বয়ংবেদ্য চিৎশক্তির ক্রিয়া বিদ্যমান আছে এই সিদ্ধান্ত না করিয়া পারা যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতও এই সত্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

বস্তুতঃ অতি প্রাচীনকালে প্রাচ্য প্রজ্ঞান যে মহাসত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও তাহারই ক্ষীণ ধ্বনি করিতেছেন। সমগ্র সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সমস্বরে ঘোষণা করিতেছেন, সৃষ্টির মূলে সর্ব্বত্রই একবস্তু—প্রাণীতে অপ্রাণীতে, প্রতি অণুতে পরমাণুতে এক অখণ্ড মহাপ্রাণের খেলা। এমন কিছু নাই যাহা ইহাদ্বারা আবৃত নহে, এমন কিছু নাই যাহাতে ইনি অনুপ্রবিষ্ট নহেন ('নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসাবৃতমং'—বৃহঃ ; 'তৎ স্রষ্ট্বা তদনুপ্রাবিশৎ'-তৈত্তি)। আর্যঋষি তপস্যালব্ধ বোধিদ্বারা (Intuition) যে সত্য প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ বুদ্ধিদ্বারাও (Intellect) সেই সত্যই আবিষ্কার করিয়াছেন। আর এই আবিষ্ক্রিয়ায় ভারতেরই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্ব অসাধারণ। তিনি নিজের উদ্ভাবিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রসাহায্যে উদ্ভিদের এবং ধাতবপদার্থেরও প্রাণস্পন্দন রেখাঙ্কিত করিয়া জগৎকে দেখাইয়াছেন, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন—সমস্তই চিন্ময়। জগদীশচন্দ্রে দেখি একাধারে প্রাচ্যের প্রজ্ঞান ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের একত্র সমাবেশ।

সৃষ্টির মূলে সর্ব্বত্র এক মহাপ্রাণের খেলা

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার —সমস্তই চিন্ময়

সৃষ্টির ক্রম-বিকাশ

ক্রম-বিবর্ত্তনে জঙ্গম বা প্রাণিজগতে কিরূপ ক্রমে জলের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট হইতে মানুষের উদ্ভব হইয়াছে, সে বিষয়েও আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভারতীয় ঋষিশাস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি করিতেছেন। পাশ্চাত্যমতে বিবর্ত্তনের ক্রম এইরূপ—ক্ষুদ্র সরীসৃপ, তাহার পর পক্ষী, পশু, বানর, সর্ব্বশেষ মানুষ। আমাদের শাস্ত্রও বলেন—জীব ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্য জন্ম লাভ করে। মনুষ্য জন্মেই জীব সাধনবলে পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিতে পারে, মনুষ্যত্বের পরবর্ত্তী সোপানই ব্রহ্মত্ব। সুতরাং মনুষ্যজন্ম অতি দুর্ল্ভ।

পাশ্চাত্য আধুনিক বিবর্ত্তনবাদ ঋষিশাস্ত্রেরই পরিপোষক

বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে ৮২ লক্ষ যোনির বিবর্ত্তনের ক্রম এইরূপ আছে—স্থাবরজন্ম ২০ লক্ষ যোনি, জলচর ৯ লক্ষ, কূর্ম্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, বানর ৪ লক্ষ, তৎপর মনুষ্য যোনি। এখানেও বানরকেই মানুষের নিকট-পূর্ব্বপুরুষ বলা হইয়াছে।

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ।

জীবতত্ত্বজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, আমিবা (amoeba) নামক এককোষ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র মৎস্য জাতীয় জীববিশেষ হইতে মনুষ্য জাতির উদ্ভবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী জাতি বা যোনির সংখ্যা ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার বা অবস্থা বিশেষে অনেক বেশীও হইতে পারে। অবশ্য ক্ষুদ্র মৎস্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সজীব জন্তু ধরিলে আরো অনেক বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং স্থাবর জন্ম লইয়া পুরাণের ৮৪ লক্ষ যোনির বিবরণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয় না।

পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রাচীন যুগের মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি অ-মানুষ অবতারের যে ক্রম-পর্য্যায়ের উল্লেখ আছে তাহাও সৃষ্টির এই ক্রম-বিকাশতত্ত্বই সমর্থন করে। আমাদের শাস্ত্রমতে ব্যাপক অর্থে জীবমাত্রেই অবতার, এক ব্রহ্মই আপনাকে বহু জীবরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিকাশ একবারে হয় নাই, ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। প্রথমে জীবাত্মা জলচর মৎস্যরূপ ধারণ করেন। পুরাণে দেখা যায়, এই মৎস্যযুগ নব লক্ষ বৎসর ছিল, সুতরাং এই যুগে পরব্রহ্মের যে অবতার তাহা মৎস্যাবতার। কোন বিশেষ কারণে যদি তিনি দেহ ধারণ করিয়া লীলা করিয়া থাকেন তবে তাহা মৎস্যরূপেই হইবে, যখন মৎস্য ব্যতীত অন্য জীবের জন্মই হয় নাই, তখন অন্যরূপে অবতারের সম্ভাবনা ও সার্থকতা নাই, ইহা সহজেই বুঝা যায়। পুরাণ অনুসারে জলচর মৎস্যের পর উভচর কূর্ম্মযুগ, তখন কূর্ম্মাবতার, তৎপর পশুযুগে বরাহ অবতার, তৎপর অর্দ্ধ-পশু অর্দ্ধ-মানবাকার কোন প্রাণীর যুগে (যাহাদিগকে আমরা দৈত্যদানব বলি) নর-সিংহ অবতার, পরে সকলই নরাবতার।

মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের অর্থ কি

'জগতের কত যুগ গিয়াছে বহিয়া
কে বলিবে ভগবন্! যুগ-উপযোগী
চরম উন্নতি অবতারণ যখন
ঘটিয়াছে, সে যুগের সেই অবতার।
প্রথম সলিলে মৎস্য। এই নীতি বলে
সলিল পঙ্কিল যবে, কূর্ম্ম অবতার।

পঙ্ক দৃঢ়তর যবে আচ্ছন্ন উদ্ভিদে
হইল বরাহ-সৃষ্টি। প্রাণীর শৃঙ্খল
ক্রমশঃ উন্নতিচক্রে হয়ে দীর্ঘতর,
নর-সিংহ অবতার। বিস্ময় মূরতি
অর্দ্ধপশু, অর্দ্ধ নর!'—নবীনচন্দ্র

এই সকল অবতার সম্বন্ধে নানারূপ আখ্যান পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে। উহাদের মূলে সত্য নিহিত আছে। কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, বা ঐতিহাসিক ঘটনা বা ভগবানের লীলামাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে নানারূপ আখ্যান রচনা পুরাণশাস্ত্রের রীতি। ঐ সকল আখ্যানের মূলগত তত্ত্ব না বুঝিলে উহা উপাখ্যান হইয়া পড়ে।

যেমন, মৎস্যাবতারে তিনি বেদ রক্ষা করিয়াছেন।

'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং—কেশব ধৃতমীনশরীর।'

আমাদের শাস্ত্রমতে সৃষ্টি অনাদি—সৃষ্টি—প্রলয়, প্রলয়—সৃষ্টি, এইরূপ পুনঃ পুনঃ চলিতেছে। প্রলয়ে সমস্ত বিনষ্ট হয়, পূর্ব্বকল্পের জ্ঞানবীজ ও কর্ম্মবীজ পরব্রহ্মে রক্ষিত থাকে। উহাই বেদ, উহা হইতেই পুনরায় সৃষ্টি হয়। এইটি তত্ত্ব।

যাহা হউক, সৃষ্টির ক্রমবিকাশতত্ত্ব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যমতে অনেকটা একরূপ হইলেও একটি বিষয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য প্রজ্ঞানে মর্ম্মান্তিক প্রভেদ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনা দেহগত বা আধিভৌতিক, প্রাচ্য দর্শনের আলোচনা জীবগত বা আধ্যাত্মিক।

প্রঃ। ক্রম-বিকাশ বা ক্রম-বিবর্ত্তন হয় দেহের, সুতরাং এ আলোচনা তো দেহসম্বন্ধীয় বা আধিভৌতিকই হইবে। ইহাতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বটা আবার কি?

জীবাত্মার ক্রম-বিকাশ

উঃ। তবে আর এত কথা বলিতেছি কেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কেবল দেহ লইয়াই আছেন, দেহেরই পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন এবং উহার চর্চ্চা করেন।

দেহ ও দেহী

কিন্তু প্রাচ্য দর্শন বলেন, এখানে দুইটি তত্ত্ব—দেহ আর দেহী, শরীর ও আত্মা। প্রত্যেক পদার্থেই এই দুইটি আছে, তা স্থাবর বা জড়ই হউক, কি জঙ্গম বা প্রাণীই হউক। ইহাই বেদান্ত ও শ্রীগীতার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, অপরা ও পরা প্রকৃতি (গীঃ ৭।৪-৫, ১৩।১-২), সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি।

শ্রীগীতা বলিতেছেন—

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ। গী ১৩।২৬

—'স্থাবর জঙ্গম যতকিছু পদার্থ আছে তাহা সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে হইয়া থাকে, জানিবে।' ক্ষেত্র বলিতে বুঝায় দেহ আর ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে বুঝায় জীব বা জীবাত্মা। জীব ব্রহ্মেরই অংশ বা ব্রহ্মই ('মমৈবাংশো জীবভূতঃ'; 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বভূতেষু ভারত'(-গীঃ ১৫।৭,১৩।২)।

প্রাণী অপ্রাণী সকলেরই আত্মা আছে

ব্রহ্ম অনন্তশক্তির আধার, জীবেও অনন্তশক্তি নিহিত আছে। সেই শক্তির বিকাশই ক্রম-বিকাশ (Evolution)। এই বিকাশের ক্রমানুসারেই জন্মে জন্মে জীবের নূতন নূতন দেহ প্রাপ্তি হয় ('নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে' বৃহঃ ৪।৪।৪)। এইরূপে প্রচ্ছন্নশক্তিসমূহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীব ক্রমোন্নতি-লাভ করিতে থাকে। জঙ্গমের পূর্ব্বে স্থাবর সৃষ্টি, কাজেই জীব প্রথমে স্থাবররূপে জন্ম লাভ করে। এই জন্মে চিৎশক্তি প্রায় নিরুদ্ধ থাকে। পরে জীব জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হয়। উদ্ভিদে প্রাণশক্তির বিকাশ হইলেও মনের বিকাশ হয় না। পশুযোনিতে মনোবৃত্তি কিঞ্চিন্মাত্র বিকশিত হয়। পরে ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে মানবদেহ ধারণ করিয়া জীব জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী হয়। তাই বলিতেছিলাম, এই ক্রম-বিকাশ জীবগত; অর্থাৎ জীবাত্মার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের আত্মশক্তির প্রেরণায়ই দেহেরও আনুষঙ্গিক বিকাশ হইতে থাকে।

অন্তঃশক্তির প্রেরণায় আত্মার ক্রমোন্নতি হয়

জীবাত্মার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেহের ক্রম-বিকাশ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকে এক্ষণে এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বেরই পোষকতা করিতেছেন। স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বার্গসঁ (Bergson) বলেন, জীবের ক্রম-বিকাশ কেবল বাহ্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর প্রভাবে হয় না, জীবের মধ্যে যে অখণ্ড প্রাণশক্তি (Life or Elan Vital) আছে তাহার প্রেরণায়ই দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রম-পরিবর্ত্তন ঘটে। আবেষ্টনী সাহায্য করে মাত্র। এই প্রাণশক্তিই আত্মশক্তি। আমরা দেখিয়াছি এই শক্তি জড়েও আছে, কিন্তু নিরুদ্ধ।

সুতরাং তত্ত্ব হইল এই—এক ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্মই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিকাশ ক্রম-বিকাশ। আমাদের শাস্ত্রমতে সৃষ্টির অর্থ নূতন কিছুর উৎপত্তি (Creation) নহে, যাহা আছে তাহারই বহুরূপে ক্রম-বিকাশ (Evolution)। এই বিকাশের ক্রম কিরূপ? প্রথমে জড়সৃষ্টি, পরে জড়ে প্রাণক্রিয়ার উদ্ভব অর্থাৎ ইতর প্রাণীর উদ্ভব হইল, ক্রমে মনের উদ্ভব অর্থাৎ মননশীল জীব মানবের উদ্ভব ইত্যাদি। ইহা আমাদের মনঃকল্পিত ব্যাখ্যা নহে, নানাভাবে উপনিষৎ শাস্ত্রে এ তত্ত্বের উল্লেখ আছে।* একটি স্পষ্ট শ্রুতিবাক্য এই—

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্। মুঃ ১।১।৮।

* এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থকার-সম্পাদিত শ্রীগীতাগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

—ব্রহ্ম তপঃশক্তি (সৃজনোন্মুখী স্বীয় ইচ্ছাশক্তি) দ্বারা আপনাকে স্ফীত করিলেন, জড়ীভূত করিলেন, তাহাতে অন্নের উদ্ভব হইল, অন্ন হইতে প্রাণের উদ্ভব হইল, প্রাণ হইতে মনের উদ্ভব হইল (মানব সৃষ্টি) এবং ক্রমে লোকসমূহের উদ্ভব হইল।

এ তত্ত্ব শ্রুতিসিদ্ধ

'অন্ন' শব্দটি উপনিষদাদি গ্রন্থে অনেক সময় জড়পদার্থের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই শ্রুতিবাক্যের এইরূপ মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন।—

'By energism of consciousness, Brahma is massed, from that Matter is born and from Matter, Life and Mind and the other worlds'.

জড়শক্তি ও চিৎশক্তি

জড়শক্তিসমূহের অন্যভাবে আলোচনার ফলেও আধুনিক বিজ্ঞান এই বৈদান্তিক অধ্যাত্মতত্ত্বের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বিশ্বময় আমরা দেখি বিবিধ বিচিত্র শক্তির খেলা। এই সকল শক্তির ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ উহাদিগের কয়েকটি বিভাগ করিয়াছেন—গতি (Motion), তাপ (Heat), আলোক (Light), তাড়িত (Electricity), চৌম্বক (Magnetism) ও রসায়নশক্তি (Chemism)। এগুলি জড়শক্তি।

বিভিন্ন জড়শক্তি

এতদ্ব্যতীত জগতে আরো দুইটি শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে—একটি প্রাণশক্তি (Vital force), আর একটি জীবশক্তি (Psychic force)।

পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল, পূর্ব্বোক্ত জড়শক্তিসমূহ মূলতঃ বিভিন্ন, প্রত্যেকটিই একটি স্বতন্ত্র মৌলিক শক্তি। এক্ষণে এই ধারণা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। হারবার্ট স্পেনসার প্রমুখ আধুনিক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলে কোন অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য শক্তি (Power) রহিয়াছে যাহা রূপান্তরিত, ভাবান্তরিত হইয়া এই সকল বিভিন্ন শক্তিতে পরিণত হয়। মূল শক্তি একই, তাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, কেবল আছে বিবিধ ভাবে রূপান্তর। ইহা তো প্রায় বেদান্তেরই প্রতিধ্বনি—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে'—সেই পরমপুরুষেরই এই সকল বিবিধ শক্তি।

মূলশক্তি একই

'এই মহাশক্তি জড় নহে—চিন্ময়। জগৎ অন্ধ জড়শক্তির খেলা নহে, ইহা চিন্ময়ের লীলা-বিলাস। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এখন

উহা জড়শক্তি নহে

এ তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন। সেই জন্য তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জড় জগতে আমরা যে শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাই তাহা চেতন শক্তিরই ভাবান্তর। সেই জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ শক্তিকে এখন আর force না বলিয়া power বলিতে চান।*

উহা চিন্ময়

বাস্তবিক বিশ্বময় সেই এক অদ্বিতীয় মহাশক্তিরই উৎস উৎসারিত হইতেছে—জড়ে, জীবে, স্থাবর জঙ্গমে সর্ব্বত্রই শক্তি-প্রস্রবণ সহস্রধারায় প্রসৃত হইতেছে—সে মহাশক্তি কি ?—তিনি আমাদের চির-পরিচিত ভূমা—তিনি ভারত ঋষির সাধন-সম্পদ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই তিন শব্দেই তিনি আখ্যাত হন। তিনি সচ্চিদানন্দ।

ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণ লৌকিক ধারণা এই যে, তিনি জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন। কিন্তু হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন, তিনি সর্ব্বভূতময়, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তাঁহার সত্তায়ই সকলে সত্তাবান্, তাঁহার শক্তিতেই সকলে শক্তিমান্, তাঁহার জ্যোতিতেই সকল জ্যোতিষ্মান্। এই তত্ত্বই সমস্ত উপনিষদে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে এবং শ্রীগীতা, ভাগবত আদি ভক্তিশাস্ত্রে নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ এই তত্ত্বই বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন—

সলিলে আমি রস, অনলে আমি তেজ, আকাশে আমি শব্দ, পৃথিবীতে আমি পুণ্যগন্ধ, মনুষ্যে আমি পৌরুষ ইত্যাদি (গীঃ ৭।৭—১২)। সূর্য্যে, চন্দ্রে, অগ্নিতে যে তেজ (আলোক ও তাপ—Light and Heat) তাহা আমারই ("তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্—গীঃ ১৫।১২)। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ যে শক্তি ভূতগণকে স্ব স্ব স্থানে বিধৃত রাখিয়াছে (মাধ্যাকর্ষণ, gravitation) সে শক্তি আমিই ('গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা'—গীঃ ১৫।১৩)।

তিনিই জড়শক্তির উৎস

তিনি কেবল এই সকল জড়শক্তি (অচিৎ)র উৎস নন, প্রাণ-শক্তিরও উৎস। তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—উদ্ভিদ্ যে শক্তিবলে রসগ্রহণ করিয়া প্রাণধারণ করে, জীবগণ যে শক্তিবলে খাদ্য পরিপাক করিয়া প্রাণধারণ করে, সে শক্তি আমিই ('পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ' ; 'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধং'—গীঃ ১৫।১৩—১৪)।

তিনিই প্রাণশক্তির উৎস

তাই বলিতেছিলাম, জীবে ও জড়ে, চিৎ ও অচিৎএ যে পার্থক্য তাহা ব্যবহারিক, মূলতঃ সর্ব্বত্রই এক মহাশক্তির বিলাস।

সুতরাং জড়ে ও জীবে পার্থক্য ব্যবহারিক, পারমার্থিক নহে।

* বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
The power which manifests itself in consciousness is but a differently conditioned form of the power which manifests itself beyond conciousness—Herbert Spencer.

যিনি অনন্ত অব্যক্তস্বরূপে অখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই স্বগুণ স্বরূপে চিৎ-অচিৎ শক্তিযুক্ত হইয়া জগতে লীলা করিতেছেন—তিনিই সকল শক্তির প্রস্রবণ, তাঁহাকে নমস্কার—

অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততং
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ। ভাঃ ৭।৩।৩৪

তিনি কেবল সকল শক্তির প্রস্রবণ নহেন, সকল জ্ঞানের উৎস নহেন, তিনি সকল আনন্দেরও প্রস্রবণ। (সে কথা পরে)।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি প্রিয়

যিনি সত্যস্বরূপ, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই আনন্দস্বরূপ। ('বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম'; 'সত্যং শিবং সুন্দরং')।

তিনি রসস্বরূপ, সেই রসলাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়,—('রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি'—তৈত্তিঃ ২।৭; 'স এব রসানাং রসতমঃ'—ছান্দোঃ ১।১।২-৩)

আনন্দস্বরূপ আছেন, তাই জীবের আনন্দ আছে, তিনিই জীবকে আনন্দিত করেন ('এষ হ্যেবানন্দয়তি—তৈত্তিঃ ২।৭)

আনন্দ হইতেই ভূতসমূহ জন্মিয়াছে, আনন্দদ্বারাই তাহারা জীবিত রহিয়াছে, আনন্দের দিকেই তাহারা গমন করিতেছে, অন্তে আনন্দেই প্রবেশ করিতেছে।

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রত্যয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি'—তৈত্তিঃ ৩।৬)

পরমেশ্বরের অনুভব শুদ্ধ আনন্দের অনুভব, কেননা তিনি আনন্দস্বরূপ, ('কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ'—ভাঃ ৭।৬।২৩)।

তিনি প্রিয়, সমস্ত প্রিয় বস্তুর মধ্যে তিনি প্রিয়তম ('প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি'—ভাঃ ৩।৯।৪২)। দেহাদি যে সকলের এত প্রিয় তাহা তাঁহার জন্যই ; তিনি প্রিয় বলিয়াই দেহাদি প্রিয় ('দেহাদির্যৎকৃতে প্রিয়ঃ'—ভাঃ ৩।৯।৪২)।

এই সকল শ্রুতিবাক্য, শাস্ত্রবাক্য।

প্রঃ। কথাগুলি বড়ই হৃদ্য, হৃদয় স্পর্শ করে। কিন্তু স্পর্শ করিয়াই তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিতে চায়, হৃদয়ে প্রবেশ করে না। এ সকল কথা সুষ্ঠুরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

উঃ। কেন ?

প্রঃ। তিনি রসস্বরূপ, রসেই আনন্দ সুতরাং তিনি আনন্দের প্রস্রবণ। তাহা হইতে উৎসারিত আনন্দধারায় জীব-জগৎ প্লাবিত, আনন্দিত। সেই আনন্দ উপভোগ করিয়াই জীব সকল জীবিত আছে। এ সকল কথায় বোধ হয়, সংসারে জীবের সঙ্গে যেন তাঁহার আনন্দ-লীলা।

উঃ। তাই তো ঠিক কথা, আবার যেন কেন। শুন কবি কি বলেন—

'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।'

'আমার মাঝে তোমার লীলা হবে, তাই তো আমি এসেছি এ ভবে।'

প্রঃ। এ সকল কথা, কবিত্ব হিসাবে বেশই মনোজ্ঞ। কিন্তু বাস্তব জগতে কি দেখি ?—কেবল দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ। শাস্ত্রগ্রন্থাদিতেও—দর্শনে, পুরাণে, আখ্যানে ব্যাখ্যানে, কেবল শুনি দুঃখের কাহিনী। জীবের যত রকমে দুঃখ জন্মিতে পারে শাস্ত্রকারগণ তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং তাহার নাম দিয়াছেন 'ত্রিতাপ'।—ব্যাঘ্রাদি হিংস্র বন্য জন্তু এবং কুম্ভীরাদি জলজন্তু হইতে গৃহকোণের মশক, শয্যার ছারপোকা পর্য্যন্ত মানুষের শত্রু—সর্ব্বোপরি মানুষ মানুষের প্রবল শত্রু,যুদ্ধাদিতে ভীষণ ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ বিষয়, এ সকল আধিভৌতিক তাপ ; ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রপাত ইত্যাদিও আধিভৌতিকের মধ্যেই ধরা যায়। দৈবদুর্য্যোগ, গ্রহবৈগুণ্য ইত্যাদি আধিদৈবিক তাপ ; আধি-ব্যাধি (ক্রোধাদি মানসিক পীড়া ও রোগাদি শারীরিক পীড়া)—আধ্যাত্মিক তাপ—এই ত্রিতাপ, 'ত্রিবিধ তাপেতে তারা, নিশিদিন হতেছি হারা'—এই তো অবস্থা। অবস্থাদৃষ্টে শাস্ত্রে নানারূপ ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। সে সকলের মূল কথা হইতেছে—সংসার দুঃখময়, প্রাক্তন কর্ম্মফলে জীবের এখানে জন্ম, জন্মিয়াই দুঃখভোগের আরম্ভ, মৃত্যুতেও শেষ নাই, আবার জন্ম, দুঃখভোগ, মৃত্যু আবার জন্ম। জীব এই দুঃখময় জন্মমৃত্যুর চক্রে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। ইহারই নাম কর্ম্মবন্ধন। চাই এই বন্ধন হইতে মুক্তি—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, যার শাস্ত্রীয় নাম মোক্ষ।

সংসারটা দুঃখের আগার, কারাগার। এই কারাগার হইতে মুক্তিলাভের জন্যই হিন্দু সাধকের কাতর ক্রন্দন—

'তারা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে আছি বল।'

সর্ব্বত্রই তো এই সুর, এ তো অপার দুঃখের চিত্র। পূর্ব্বোক্ত সুখের চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত।

উঃ। অন্য সুরও আছে। একটি ভক্ত একদিন শঙ্করাচার্য্যের একটি স্তব আবৃত্তি করিয়া পরমহংসদেবকে শুনাইতেছিলেন। ঐ স্তবের প্রত্যেক শ্লোকের শেষ পংক্তিতে এই কথাটির পুনরুক্তি আছে—'সংসারদুঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ।' স্তবপাঠ শেষ হইলে পরমহংসদেব বলিলেন—'সংসার কূপ, সংসার গহন, কেন বল? ও প্রথম প্রথম বলতে হয়। তাঁকে ধর্‌লে আর ভয় কি, তখন—

এই সংসার মজার কুটি,
আমি খাই দাই আর মজা লুটি।
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসে ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক্ দুদিক্ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মধ্যে দুই মত আছে। এক মত এই যে—মানব-জীবন দুঃখময়, সংসারে জন্মটাই অপার দুঃখের হেতু, সময়ে স্বাভাবিক জরামৃত্যু তো আসিবেই, জীবিতকালেও আধি-ব্যাধি, আকস্মিক আপদ-বিপদ্ ইত্যাদি কত রকম দুঃখই যে জীবের ভোগ করিতে হয় তাহার অন্ত নাই। এ সকল অনিবার্য্য, জীবের ইহা নিবারণের সাধ্য নাই। কেননা এ সকল তাহার প্রাক্তন কর্ম্মের ফল। আবার ইহজন্মের কর্ম্মের ফলও পরজন্মে ভোগের জন্য সঞ্চিত হইতে থাকে। কর্ম্মই তাহার পুনঃ পুনঃ সংসারে বন্ধনের কারণ, সুতরাং এই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তির একমাত্র উপায়—সংসার-ত্যাগ, সন্ন্যাস-গ্রহণ, সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ। এই হেতু এই সকল শাস্ত্রে জীবনের অনিত্যতা,সংসারের অসারতা, দুঃখমূলতা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর উপদেশ আছে এবং শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যাদি সন্ন্যাসবাদী ধর্ম্মাচার্য্যগণ নানাভাবে নির্ব্বন্ধসহকারে সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—

১-শাস্ত্রের দ্বিবিধ মত

'নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।'
—এ জীবন অতি চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী, যেমন পদ্মপত্রে জল।
'যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ'।

—যেই জীবের জন্ম হইল, অমনি মৃত্যু তাহার পশ্চাদগামী হইয়াছে। আবার যেই মৃত্যু হইল, অমনি পুনরায় জননী জঠরে প্রবেশ করিতে হইতেছে। জন্ম—মৃত্যু, মৃত্যু—জন্ম, এই তো সংসারের দোষ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। হে মানব, ইহাতে তোমার সন্তোষের বিষয় কি আছে? অতএব,

সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য

'সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ'॥

—দেবমন্দিরে বা তরুতলে বাস, ভূমিতলে শয্যা, মৃগচর্ম্ম পরিধান, সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ ও ভোগসুখ ত্যাগ,—এই প্রকার বৈরাগ্য কাহাকে সুখী না করে? সুতরাং 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ'—কৌপীনধারিগণই প্রকৃত ভাগ্যবান্। কেননা, 'দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ'—দণ্ডগ্রহণমাত্রেই নর নারায়ণ হয়।। এই যে সন্ন্যাসের ডাক, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-সঙ্কুল দুঃখময় মানবজীবনের অসারতা, কর্ম্মত্যাগের মাহাত্ম্য, এ সকল মধ্যযুগে আমাদের দেশে অতি প্রবলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাকে বলে **দুঃখবাদ বা সন্ন্যাসবাদ**। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন তাঁহাদিগকে বলা হয় দুঃখবাদী, সন্ন্যাসবাদী।

(১) দুঃখবাদ—সন্ন্যাসবাদ

কিন্তু মানব-জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ দুঃখবাদাত্মক ও সন্ন্যাস-বাদাত্মক মত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। ইহার বিপরীত বাদও আছে। তাহাকে বলা যায় **সুখবাদ বা জীবনবাদ**। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন তাঁহারা বলেন—জীব-জগতে সচ্চিদানন্দেরই প্রকাশ। সেই সৎস্বরূপের সত্তায়ই সকলে সত্তাবান্, সেই চিৎস্বরূপের চিতিতেই সকলে সচেতন, সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দেই সকলে আনন্দময় ('এষ হ্যেবানন্দয়তি'), তিনি লীলাময়, সৃষ্টি তাঁহারই লীলা। তিনিই সুখদুঃখের মধ্যদিয়া জীবকে লইয়া এই খেলা খেলিতেছেন। বলা বাহুল্য, লীলা শব্দের অর্থ খেলা। সংসার ত্যাগ করিবার জন্যই জীব সংসারে আসে নাই। লীলাময়ের লীলাপুষ্টির জন্যই জীব সংসারে আসিয়াছে। সেই লীলাময় আনন্দস্বরূপ, সুতরাং সংসারে আনন্দ আছে। এই জগৎ-লীলা আনন্দ-লীলা। তাই কবি বলেন,—

(২) সুখবাদ—লীলাবাদ জীবনবাদ

জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ,
ধন্য হলো, ধন্য হলো, মানব-জীবন।

পরে বলিতেছেন,

'তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
বাজাই আমি বাঁশী'।

তাই তো তাঁর 'গীতাঞ্জলি,' যে গীতে জগৎ মুগ্ধ।

৪—

জীব এই আনন্দ-লীলার সাথী, সে যদি এইটি বুঝে তবেই তাহার মানব-জীবন সার্থক হয়।

প্রঃ। কিন্তু জীবের তো দুঃখের অন্ত নাই। সে সতত দুঃখদহনে দগ্ধ হইতেছে, সে আনন্দময়ের আনন্দ-লীলার মর্ম্ম বুঝিবে কিরূপে আর তার সাথীই বা হইবে কিরূপে?

উঃ। তা তো ঠিকই। যে কেবল দুঃখ দুঃখ করে, সর্ব্বদা মুখ ভার করিয়া থাকে, সর্ব্বদা এটা নাই সেটা চাই—এই যার ভাব, সে কখনও আনন্দধামের সন্ধান পায় না। আনন্দস্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে, আনন্দময়ের আনন্দ-লীলা বুঝিতে হইলে সংসারটাকে কিরূপ ভাবে দেখিতে হয়, চিত্তটাকে কিরূপ সরস রাখিতে হয়, তাহাই এখানে বলা হইতেছে। এই যে দৃষ্টিভঙ্গী, চিত্তের এই যে সরসতা, ভক্তিশাস্ত্রে ইহাকে বলে—প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা। যাহার চিত্তে এই ভাব কিছু আছে তিনি ভাগ্যবান্। এই ভাব যত দৃঢ় হইবে, যত বেশী স্থায়ী হইবে, ততই তিনি আনন্দময়ের নিকটবর্ত্তী হইবেন।

প্রঃ। এই ভাব দৃঢ় করা এবং স্থায়ী করা বড় সহজ বলিয়া বোধ হয় না। ইহজীবনে দুঃখটাও তো বাস্তব পদার্থ। ত্রিতাপ তো শাস্ত্রের মিথ্যা কল্পনা নয়। দুঃখবিপত্তি যখন আসে, তখন স্বভাবতঃই লোকে মুহ্যমান হয় এবং সেই দয়াময়ের নিকটই দুঃখমোচনের জন্য প্রার্থনা করে। তিনি তো কারুণ্যের আধার, করুণা-ভিখারী আর্ত্ত কি তাঁহার ভক্ত নয়?

উঃ। আর্ত্তও তাঁহার ভক্ত ('আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ'—গীঃ ৭।১৬), কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত, নিষ্কাম ভক্ত নহেন। জ্ঞানী ভক্ত হা-হুতাশ করেন না, তাঁহার প্রার্থনাটাও অন্য রকম হয়।—

"বিপদে মোরে রক্ষা করো,
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমার মুখ লইব চিনে,
দুঃখের রাতে নিখিল ধরা
যে-দিন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয়"—গীতাঞ্জলি

'তোমারে যেন না করি সংশয়'—ইহাই মুখ্য কথা। সংসার কেবল দুঃখময় নয়, জগৎ সুখ-দুঃখময় ('সুখং দুঃখং ইহোভয়ং'-মভা)। সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-দ্বেষ, শুভাশুভ, জীবন-মরণ এই সকল দ্বন্দ্ব লইয়াই সৃষ্টি। জীবের এই দ্বন্দ্ববুদ্ধি দূর হইলে যাহার অনুভূতি হয় তাহাই অদ্বয় আনন্দ, অমৃত—'আনন্দরূপমমৃতং,' 'সত্যং শিবং সুন্দরং'। যতদিন সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব বোধ আছে ততদিন আমরা সেই অদ্বয় তত্ত্বের অনুভব করিতে পারিনা, আমাদের মনে এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্ব্বকল্যাণগুণোপেত, তবে তাঁহার সৃষ্টিতে দুঃখ কেন, অশুভ কেন? যখন সুখ পাই তখন তাহা তাঁহার দয়ার দান বলিয়া নম্রশিরে গ্রহণ করি, কিন্তু যখন নিদারুণ দুঃখে পড়ি তখন তাহাও যে তাঁহার দয়ার দান, তাহাও যে মঙ্গলময়েরই মঙ্গল ইচ্ছা, ইহা মনে করিতে পারি না, কাজেই দুঃখে ম্রিয়মাণ হই। কিন্তু সেই আনন্দস্বরূপের অস্তিত্বে যদি অটুট বিশ্বাস থাকে, তাহাতে যদি অবিচলা, অব্যাহতা ভক্তি থাকে, তবে নিদারুণ দুঃখে পড়িলেও তাহা দুঃখ বলিয়াই মনে হয় না। প্রহ্লাদ-চরিত্রে পুরাণকার এই তত্ত্বই প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পৌরাণিক কথা বা নাই তুলিলাম, এই তো সে দিনও দেখিলাম, ঠাকুর হরিদাস বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত খাইয়াও সুখে হরিনাম করিতে লাগিলেন, প্রভু শ্রীনিবাস আচার্য্য গৃহাঙ্গনে মৃতপুত্র রাখিয়া কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইলেন। নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও তাঁহাদের দুঃখবোধ নাই—সকল অবস্থায়ই বিমল আনন্দ, কেননা বিশুদ্ধা ভক্তি আনন্দ-স্বরূপিণী। এস্থলে নিম্নপ্রকৃতি পরাস্ত—আঘাতে আহত করে না, অনলে দগ্ধ করে না, সলিলে সিক্ত করে না, শোকে সন্তপ্ত করে না। এ সকল অলৌকিক বোধ হইতে পারে, কিন্তু সত্য কেবল আমাদের লৌকিক জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে।

চাই শ্রদ্ধা—অবিচলা ভক্তি

ভক্তি আনন্দ-স্বরূপিণী

প্রঃ। সে কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু ইহা তো অতি উচ্চ স্তরের অবস্থা। অতি নিম্ন স্তরের জীব আমি, সংসার-কীট, ভক্তিহীন, শক্তিহীন আমি, আমার সাধ্য কি যে প্রকৃতিকে পরাস্ত করি, পঙ্গু কিরূপে গিরি লঙ্ঘন করিবে? শোকতাপ দুঃখবিপত্তি যখন চিত্তকে অভিভূত করে, তখন কিরূপে আমি চিত্তপ্রসাদ লাভ করিব, সতত প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা রক্ষা করিব?

উঃ। বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত-সংযত করার উপায় সম্বন্ধে সকল শাস্ত্রেই বিস্তর উপদেশ আছে। সে সকলের পুনরাবৃত্তি করিয়া লাভ নাই। শ্রীগীতাগ্রন্থে শ্রীভগবান্ নানাবিধ সাধনপথের উল্লেখ করিয়া সর্ব্বশেষে প্রিয় ভক্ত অর্জ্জুনকে 'সর্ব্বগুহ্যতম' সার উপদেশ দিয়াছেন 'সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ'—গী-১৮।৬৪')—আমাতে চিত্ত রাখ, আমাকে ভক্তি কর, নানা মতপথ বিধিনিষেধ ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও, আমিই তোমাকে সকল

ভগবৎ-শরণাগতি

পাপতাপ-শোকদুঃখ হইতে মুক্ত করিব, দুঃখ করিও না ('মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ' 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, মা শুচঃ')। ইহার নাম ভগবৎ-শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ যোগ। প্রধান কথাই হইতেছে 'মন্মনা' হও, আমাতে চিত্ত রাখ, তবেই চিত্তের অবসাদ, অশুদ্ধি সমস্তই দূর হইবে। চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে শ্রীভাগবতেও ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে—

বিদ্যাতপঃ প্রাণনিরোধমৈত্রী তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে ॥ ভাঃ ১২।৩।৪৮

—শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করিলে যেরূপ আত্যন্তিক চিত্তশুদ্ধি হয়, দেবতোপাসনা, তপ, বায়ুনিরোধ যোগ, মৈত্রী, তীর্থস্নান, ব্রত, দান ও জপের দ্বারা তাহা হয় না।

প্রঃ। কিন্তু কথা হইতেছে, শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করিবার, 'মন্মনা', তন্মনা হইবার উপায় কি ? যে মন অনুক্ষণ সংসারের দুঃখতাপে দগ্ধ, সে মনে তো আনন্দস্বরূপের নামগন্ধও নাই।

উঃ। তা ঠিক। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সুখদুঃখাদি সকলই মনের ধর্ম্ম। আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে যে বিষয়জ্ঞান লাভ করি এবং তজ্জনিত সুখদুঃখ ভোগ করি, তাহাও বাস্তবপক্ষে মনের দ্বারাই হয়। আমরা চক্ষু দিয়া দেখি, কান দিয়া শুনি, এইরূপ বলিয়া থাকি। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, আমরা মন দিয়াই দেখি, মন দিয়াই শুনি ('চক্ষুঃ পশ্যতি রূপাণি মনসা নতু চক্ষুষা'-মভা, শাঃ ৩১১, ১৭)। পথিপার্শ্বস্থ গৃহে বসিয়া পথের দিকে চাহিয়া আছ, কিন্তু অন্যমনস্ক অর্থাৎ মন অন্য বিষয়ে আছে, তখন তুমি পথের লোক-চলাচল দেখিবে না, কর্ম্ম কোলাহল শুনিবে না। ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ বিষয়। দুঃখের বাহ্য কারণ যাহাই হউক না কেন, উহার অনুভূতি মনের দ্বারাই হয়। এই হেতুই মহাভারতে একটি কার্য্যকরী উপদেশ আছে যে, দুঃখ নিবারণের মহৌষধ দুঃখবিষয়ে অন্যমনস্কতা অর্থাৎ দুঃখের বিষয় মনে চিন্তা না করা ('ভৈষজ্যমেতদ্ দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ'-মভা, শা-২০-১, ২)। এস্থলে বিপরীত ভাবনা করিতে হয় 'বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্।'—যোঃ সূঃ ২।৩৩), দুঃখের দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে সুখের বিষয় চিন্তা করিতে হয়। তিনি আনন্দস্বরূপ, জগতে তাঁহার আনন্দেরই অভিব্যক্তি, সেই আনন্দ লাভ করিয়াই জীব আনন্দিত হয়—'তুমি আনন্দ-বারিধি হরি হে, তোমার ভুবন ভরি হে, সুধার লহরী বয়'। (রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি—তৈত্তি ২।৭)—এইরূপ চিন্তা সর্ব্বদা মনে রাখিলে চিত্ত সুপ্রসন্ন থাকে এবং কালে পূর্ণানন্দস্বরূপের সন্ধান দেয়। মনের শক্তি অসাধারণ, যে কোন বিষয় অবিচ্ছেদে চিন্তা করা যায় মন তদাকার প্রাপ্ত হয়,

দুঃখ নিবারণের উপায় দুঃখবিষয়ে অন্যমনস্কতা

বিপরীত ভাবনা

যোগশাস্ত্রে ইহাকে একতত্ত্বাভ্যাস বলে ('তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ'—যোঃ সূঃ)।

স্মরণ, মনন, সাধুসঙ্গ শাস্ত্রপাঠ

ভক্তিশাস্ত্রে শ্রবণ, মনন, স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গ বিহিত আছে, প্রকৃতপক্ষে সে সকলই যোগাঙ্গ। যাহাতে সতত সেই আনন্দময়ে চিত্ত সংযুক্ত থাকে তাহাই যোগাঙ্গ। এই হেতুই সাধুসঙ্গেরও এত মাহাত্ম্য, যে সঙ্গগুণে স্বতঃই 'মুখে আসে কৃষ্ণনাম'। সদ্‌গ্রন্থ পাঠও সাধুসঙ্গেরই অন্তর্গত। এই সকল উপায়ে সততই সেই রসস্বরূপে মন নিবিষ্ট থাকে, চিত্ত সরস হয়, দুঃখ-দৌর্মনস্য দূর হয়।

সুতরাং এস, আমরা দুঃখের সংসারের বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হইয়া সুখের সংসারের চিন্তায় মনোনিবেশ করি, আনন্দময়ের আনন্দলীলাকথার শ্রবণ, মনন, স্মরণ, কীর্ত্তন করি। যাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া সেই আনন্দ-বার্ত্তা শাস্ত্রমুখে জগতে প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের সেই সকল পুণ্যকথার আলাপ-আলোচনা করি।

জীবনে সুখ আছে

বস্তুতঃ জীবন দুঃখময়, একথার চেয়ে জীবন সুখময়, এই কথাই অধিকতর সত্য। জীবনে নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও সুখ আছে, বাঁচিয়া থাকারই একটা আত্যন্তিক সুখ আছে। মরিতে কে চায়?—'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, তথাপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং'—দেহ জরাজীর্ণ, মৃত্যু আসন্ন, তথাপি বাঁচিয়া থাকার আশা-আকাঙ্ক্ষা কেন? বাঁচিয়া থাকায় সুখ আছে বলিয়া। আর এই যে প্রাণিক সুখ, জীবন উপভোগের সুখ, রূপরসাদি বিষয়জনিত সুখ, যাহাকে বিষয়ানন্দ বলে, তাহাও সেই পরমানন্দেরই এক কণা, রসসিন্ধুর এক বিন্দু, কেননা জীব ব্রহ্ম-সিন্ধুরই এক বিন্দু। সুতরাং বিষয়ানন্দও হেয় নহে, বরং উহা সেই পরমানন্দলাভেরই দ্বারস্বরূপ। ইহা শ্রুতিরই কথা, ব্রহ্মানন্দনিরূপক শাস্ত্রেরই কথা।—

বিষয়ানন্দ একেবারে হেয় নহে

'অথাত্র বিষয়ানন্দো ব্রহ্মানন্দাংশরূপভাক্।
নিরূপ্যতে দ্বারভূতস্তদংশত্বং শ্রুতির্জগৌ॥
এষোহন্যপরমানন্দো যো খণ্ডৈকরসাত্মকঃ॥
অন্যানি ভূতান্যেতস্য মাত্রামেবোপভুঞ্জতে॥ পঞ্চদশী, ১৫।১।২

—বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দেরই অংশস্বরূপ। উহা ব্রহ্মানন্দলাভের দ্বারস্বরূপ। উহা যে ব্রহ্মানন্দেরই অংশ তাহা শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে, যথা—অখণ্ড একরসাত্মক যে পরমানন্দ তাহা হইতেই জীবের বিষয়ানন্দ, জীবসকল সেই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে।

বলা হইল, বিষয়ানন্দও সেই পরমানন্দ লাভের দ্বারস্বরূপ, কিরূপে?—তত্ত্বে যিনি অব্যক্ত অক্ষর পরব্রহ্ম, লীলায় তিনি জগৎস্রষ্টা, জগদীশ, জীবের 'গতির্ভর্ত্তা

প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' (গীঃ ৯।১৮)। তিনি প্রেমময়, দয়াময়, কারুণ্যের আধার। এই দুঃখের সংসারেও জীবের প্রতি জীবের প্রীতি, স্নেহ, দয়া, মৈত্রী প্রভৃতি হৃদ্য বস্তুর অভাব নাই। এ সকল তো তাহারই দান। জগতের সকল রূপরস সুন্দর হইয়াছে, সরস হইয়াছে সেই রসস্বরূপের স্পর্শ পাইয়া। সেই সৌন্দর্য্য, সেই রস, সেই করুণা জগতে শতধারে প্রসৃত হইতেছে। শ্রদ্ধাপূত চিত্তে আনন্দময়ের এই লীলাতত্ত্ব অনুধ্যান করিলে হৃদয় ভক্তিরসে সিক্ত হয়, বিষয়ের রূপরসও সেই রসস্বরূপেরই সন্ধান দেয়। শুন, প্রেমিক ভক্তের প্রাণের উচ্ছ্বাস, সংসার-চিত্রে ভগবৎ-স্মৃতি—

বিষয়ানন্দ পরমানন্দ-লাভের দ্বারস্বরূপ

সংসার চিত্রে ভগবৎ-স্মৃতি

কত ভালবাস থেকে আড়ালে।
আমি কেঁদে মরি, ধরতে নারি, (তোমায়) দুটি হাত বাড়ালে।

১। ছিলাম যখন মার উদরে
ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে, হায়রে—
তখন আহার দিয়ে, বাতাস দিয়ে
তুমি আমারে বাঁচালে।

২। আবার যখন ভূমিষ্ঠ হলাম,
মায়ের কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় পেলাম, হায়রে—
মায়ের স্তনের রক্ত হে দয়াময়,
তুমি ক্ষীর করে যে দিলে।

৩। দিলে বন্ধু বান্ধব দারা সুত,
ও নাথ, সে সব কৌশল তোমারি তো, হায়রে—
ও নাথ, ধনধান্য সহায় সম্পদ্,
পেলাম তোমার দয়া বলে।

৪। তোমার দয়ায় সকল পেলাম,
কিন্তু তোমায় একদিন না দেখিলাম, হায়রে—

কাঙ্গাল হরিনাথ (ফিকির চাঁদ)

বিষয়ের আনন্দ অর্থাৎ প্রাকৃত রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ-জনিত যে আনন্দ এবং সংসারের স্নেহ-প্রীতি-জনিত যে আনন্দ সে সকলই সেই পরমানন্দেরই সন্ধান দেয়, কিন্তু চাই ভক্তির পরশ। শুন, ভক্ত কান্তকবির একটি গান—

তুমি সুন্দর, তাই তোমার বিশ্ব সুন্দর শোভাময়,
তুমি উজ্জ্বল তাই নিখিল বিশ্ব নন্দন প্রভাময়,
তুমি অমৃত-বারিধি হরি হে, তাই তোমার ভুবন ভরি হে,
পূর্ণ চন্দ্রে পুষ্পগন্ধে সুধার লহরী বয়।

ঝরে সুধা জল, ধরে সুধা ফল, পিয়াসা ক্ষুধা না রয়।
তুমি প্রেমের চিরনিবাস হে, তাই প্রাণে প্রাণে প্রেম পশে হে,
তাই মধুরতাময় বিটপীলতায় মিলে প্রেমকথা কয় হে,
জননীর স্নেহ সতীর প্রণয় গাহে তব প্রেম জয় হে।

প্রাকৃত রূপ-রস রসস্বরূপেরই সন্ধান দেয়

বস্তুতঃ, সংসারে বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগের উপাদানের অভাব নাই। সুন্দর পুষ্প দেখিলে বা সুগন্ধি পুষ্প আঘ্রাণ করিলে বা সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলে কি পাপ হয়? তা তো নয়। বরং সৌন্দর্য্য-বোধ (aesthetic sense) যাঁহাদের সম্যক্ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাঁহারা প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া পরম আনন্দ অনুভব করেন এবং সেই সৌন্দর্য্যবোধ তাহাদিগকে সর্ব্বসুন্দরের দিকে আকর্ষণ করে।

চিত্ত যাঁহার সরস, তিনি সৃষ্টির সকল বস্তুতেই সেই রসস্বরূপের রসের স্পর্শই অনুভব করেন। নদীর জলে, গাছের ফলে, চাঁদের কিরণে, সান্ধ্য সমীরণে, ফুলের ঘ্রাণে, পাখীর গানে, উষার আলোকে, প্রেমের পুলকে, স্নেহের ডাকে, সর্ব্বত্রই রসের সিঞ্চন, সমস্তই তাঁহার নিকট মধুময়। প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য আছে, সৌরভ আছে, সরসতা আছে। মানুষের হাসি আছে, গান আছে, ভালবাসা আছে, তবে তুমি হাসিবে না কেন? কেবল দুঃখ দুঃখ কর কেন? ও সব ভুলে যাও। সুন্দর জগতে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ দেখ। শুন, শ্রুতি কি বলেন—

'ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু—বৃহঃ।
—সেই সত্যস্বরূপ সর্ব্বভূতের মধুস্বরূপ, সর্ব্বভূত সেই সত্যস্বরূপের মধুস্বরূপ।

শ্রুতি আরো স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—

ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়ম্ অস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, অয়মেব স যোঽয়ম্ আত্মা ইদং অমৃতম্, ইদং ব্রহ্ম, ইদং সর্ব্বং। বৃহঃ ২।৫।১

—এই পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধু, সমস্ত ভূত এই পৃথিবীর মধু, এই পৃথিবীতে যিনি অধ্যাত্মভাবে তেজোময় অমৃতময়, পুরুষ, ইনিই তিনি, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সব। অর্থাৎ, জগতে যাহা কিছু প্রকাশমান তাহাতেই সেই তেজোময় অমৃতময় মধুময় পুরুষ অনুস্যূত আছেন।

এই ছিল আর্য্যঋষিগণের সত্যজ্ঞান। তাঁহারা ইহটাকে, ঐহিক জীবনটাকে

অগ্রাহ্য করেন নাই। বিশ্বে বিশ্বময়ের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছেন। এই ভাবের অনুপ্রেরণায়ই বেদের মধুমতী সূক্তের মধুগীতি উদ্গীত হইয়াছিল—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ন সন্তোষধীঃ।—
মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।

ঋক্ ১।৯০।৬-৯, বৃহঃ ৬।৩।৬

সৃষ্টি ও স্রষ্টায় মধুর সম্পর্ক

সমীরণ মধু বহন করে, নদীসকল মধু ক্ষরণ করে, ওষধি-বনস্পতি সকল মধুময় হৌক, রাত্রি মধুময় হৌক, উষা মধুময় হৌক, পৃথিবীর ধূলি মধুময় হৌক, সূর্য্য মধুমান্ হৌক।

এই মধু ক্ষরণ করেন কে?—'মধু ক্ষরতি তদ্‌ব্রহ্ম', মধুব্রহ্ম।

তিনি মধুময়, মধুর প্রস্রবণ, সেই মধুর উৎস হইতে মধুধারা উৎসারিত করিয়া জগৎ মধুময় করিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রুতি প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান, দার্শনিক মত নহে

শ্রুতিতে যে পরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে তাহা বুদ্ধি-বিচার দ্বারা হয় নাই। উহা কোন দার্শনিক মতবাদ নহে। উহা প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান। তাই শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ। ঋষিগণ তন্মনা হইয়া বোধিদ্বারা (spiritual intuition) যে পরম বস্তু প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন তাহাই শ্রুতিতে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রুতির ভাষা—'বেদাহং—আমি তাঁহাকে জানিয়াছি, দেখিয়াছি, জ্ঞানিগণ সততই তাঁহাকে দর্শন করেন, এইরূপ কথা,—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥

ঋষিগণের অনুভূতি —ভূমানন্দ

—উন্মুক্ত আকাশে সর্ব্বদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিলে যেমন সমস্ত পদার্থ সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ জ্ঞানিগণ সতত সর্ব্বত্রই সেই পরমপুরুষকে দর্শন করেন, যিনি বিষ্ণু—যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন (বিষ্-বিস্তারে); অথবা যিনি সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট আছেন (বিষ্-প্রবেশে)। ঋষি দেখেন—আকাশে, অন্তরীক্ষে, জ্যোতিষ্কে, জলে স্থলে, জীবে অজীবে সর্ব্বত্রই এক চৈতন্যময়, আনন্দময় মহাসত্তার (সচ্চিদানন্দ) লীলা-বিলাস।

ঋষি দেখেন যাহা কিছু প্রকাশমান সকলই আনন্দরূপ, অমৃতরূপ—

'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।'

এই তো প্রাচীন আর্য্যঋষির সত্য-অনুভূতি, দুইটি কথায় প্রকাশিত—সমস্তই আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। ঋষিগণ ইহাকেই ভূমানন্দ বলিয়াছেন।

এখন শুন, আধুনিক ভারতের ঋষি-কবি কি অনুপম ভাষায় অনুরূপ সুখানুভূতির বর্ণনা করিয়াছেন—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝড়িয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।
চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোক জাগিল হৃদয়-প্রান্তে
উদার উষার উদয় অরুণ কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া॥

'মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ'—ইহাই আনন্দস্বরূপের স্পর্শ। তাই আবার গাহিলেন—

'এই লভিনু সঙ্গ তব
  সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হলো অঙ্গ মম
  ধন্য হলো অন্তর।
  সুন্দর হে সুন্দর।
এই তোমারি পরশ রাগে
  চিত্ত হলো রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন সুধা
  রৈল প্রাণে সঞ্চিত।

তোমার মাঝে এমনি ক'রে
নবীন করে লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর
জন্ম জন্মান্তর,
সুন্দর হে সুন্দর।'

'সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার।
তুমি অনন্ত চির বসন্ত অন্তরে আমার।'

সুন্দর হে সুন্দর!—ইনিই বেদের আনন্দব্রহ্ম, রসব্রহ্ম। ভাগবতের 'কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ', সমস্তসৌন্দর্য্যসার-সন্নিবেশঃ; ভক্তিশাস্ত্রের 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তি'; 'মধুরং মধুরং মধুরং' মধুরং (কর্ণামৃত)।

বেদের রস-ব্রহ্মই ব্রজের রসরাজ

'কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
সে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।
কৃষ্ণের লাবণ্যপুর, মধুর হ'তে সুমধুর
তাতে যেই মুখ সুধাকর
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশদিক্ ব্যাপে যার পুর।

(চরিতামৃতে রক্ষিত শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি)

প্রঃ। কথাগুলি বড় সুন্দর। কিন্তু বেদান্ত, ভাগবত, কর্ণামৃত, চরিতামৃত, গীতাঞ্জলি—সব তো এক হয়ে যায়! ঋষিগণের অনুভূতি আর গোপীজনের অনুভূতি কি এক? লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের অনুভূতি এবং ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি কি এক?

উঃ। একই—এক এই অর্থে সে সকলই আনন্দানুভূতি। পরমেশ্বরের অনুভব, আনন্দেরই অনুভব, কেননা তিনি আনন্দস্বরূপ ('কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ')

সেই আনন্দের স্বরূপটি যে কি তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না, উহা নিজবোধরূপ। চিনি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া চিনির আস্বাদন কাহাকেও বুঝানো যায় না, একটু মুখে দিলে আর কিছু বলিতে হয় না। আবার যিনি আস্বাদন পাইলেন তিনিও উহা বুঝাইতে পারেন না। উহা 'মূকাস্বাদনবৎ' (নারদ)।

আনন্দের আস্বাদন মূকাস্বাদনবৎ

সখীরা শ্রীমতীকে বলিলেন,—তুমি তো শ্যামের প্রেমে মজিলে, তোমার অনুভবটি কিরূপ বলিতে পার কি? শ্রীমতী কি বলিবেন ভাবিতে লাগিলেন, শেষে বলিলেন,—

'সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়?
সৌই পীরিতি, অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।'

ইহা দেহ-সম্পর্কিত বর্ণনা হইলেও দেহাতীতের সন্ধান দেয়। প্রাকৃত রূপরস তো তিলে তিলে নূতন হয় না, পুরাতন হয়।

ব্রহ্মানন্দ, আত্মানন্দ, প্রেমানন্দ, এই সকল কথা আছে, সকলই আনন্দ। যিনি সে আনন্দ অনুভব করিয়াছেন তিনিই বলেন উহার অধিক সুখ আর কিছু নাই।

ব্রহ্মানন্দ

ব্রহ্মানন্দী বলেন—উহা আনন্দের পরাকাষ্ঠা, উহার অধিক আর সুখ নাই, 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য' (Acme of Happiness), 'আনন্দং নন্দনাতীতম্'।

আত্মানন্দী বলেন—উহা অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিগ্রাহ্য আত্যন্তিক সুখ, উহা লাভ করিলে অন্য কোনও লাভ অধিকতর সুখকর বলিয়া বোধ হয়না ('সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যং অতীন্দ্রিয়ম্। যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—গীঃ ৬।২১।২২)

আত্মানন্দ

প্রেমানন্দী বলেন,—তাঁহাতে পরমপ্রেমই ভক্তি, উহা অমৃতস্বরূপ, উহা লাভ করিলে পুরুষ সিদ্ধ হয়, অমৃত হয়; তৃপ্ত হয়। উহা পাইলে আর কিছুই পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ('সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা অমৃতস্বরূপাচ। যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি। যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি। ন শোচ্যতি'—নারদ)।

প্রেমানন্দ

পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু।—চরিতামৃত।
ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে বশ।—ঐ

প্রঃ। পূর্ব্ব ধারণা যেন সব ওলট-পালট হইয়া যায়।

উঃ। কেন? পূর্ব্ব ধারণা কি?

প্রঃ। ব্রহ্মবাদিগণ জ্ঞানমার্গে স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন আদি দ্বারা ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন, উহাই মোক্ষ। যোগিগণ অষ্টাঙ্গযোগ সহায়ে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতির অতীত বা ত্রিগুণাতীত হন, উহাই মোক্ষ। ইঁহারা নিরাকার চিন্তা করেন। বৈষ্ণব ভক্তগণ কিন্তু সাকারোপাসক, নামরূপই তাঁহাদের সাধনার প্রধান অবলম্বন। ভগবৎপ্রেমই তাঁহাদের লক্ষ্য, উহাকে তাঁহারা পঞ্চম পুরুষার্থ বলেন, চতুর্থ পুরুষার্থ যে মোক্ষ উহাকে তাঁহারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন, মোক্ষবাঞ্ছাকে তাহারা কৈতব বলেন। তাঁহারা বেদান্তের বিশেষ সমাদর করেন না, বরং উহা হইতে দূরে থাকিতেই চান। ভাগবত, চরিতামৃত আদি তাঁহাদের বেদস্বরূপ, ব্রজলীলা তাহাদের সাধনার ধন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম বস্তুটির বিশেষ উচ্চস্থান নাই, এইরূপ বোধ হয়। পক্ষান্তরে ব্রহ্মই বেদান্তীর সর্ব্বস্ব, জ্ঞানমার্গই তাঁহার সাধনপথ, মোক্ষই তাঁহার লক্ষ্য। ব্রজের ভাবে তিনি 'উক' নহেন অর্থাৎ তিনি ভাবুক নহেন, রসিক নহেন, ইহাই তো বুঝি। বেদান্তের সহিত ব্রজলীলার সম্পর্ক কি?

উঃ। এ সব কথায় তত্ত্ব ও মার্গ, এই দুইটি বস্তু গুলিয়ে ফেলা হইতেছে। তত্ত্ব একই, কিন্তু তাঁহাকে পাইবার উপায় বা সাধন-পথ বিভিন্ন হইতে পারে। সেই হেতুই বিভিন্ন-সম্প্রদায় গঠিত হয়। তত্ত্ব হইতেছেন—সচ্চিদানন্দ—সত্য-জ্ঞান-আনন্দ, ইহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নাই, ইহা সর্ব্বসাধারণের সাধ্যবস্তু। তিনি যখন আনন্দ-স্বরূপ, তখন তাঁহার অনুভবে পরম আনন্দ লাভ হইবেই, সে আনন্দকে যে নামই দেওনা কেন। ঋষিগণ ভাবুক ছিলেন না, রসিক ছিলেন না, ইহা যদি বুঝিয়া থাক তবে উহা নিতান্তই নির্ব্বোধের মত বুঝিয়াছ। যাঁহারা তাঁহাদের ইষ্টবস্তুকে রসস্বরূপ, 'রসানাং রসতমঃ,' প্রিয়, 'প্রেয়স্', 'প্রিয়তমঃ,' 'পরপ্রেমাস্পদং' 'বামনী' (Lord of Love), 'পিতম্' (beloved), 'বণিত,' 'দয়িত' ইত্যাদি মধুর নামে আখ্যাত করিয়াছেন তাঁহারা রস বুঝেন না, প্রেম বুঝেন না, তোমরা বুঝ?

ঋষিগণও প্রেমিক ছিলেন

জ্ঞানমার্গাবলম্বী বা যোগমার্গাবলম্বী সাধকগণ মোক্ষার্থী, ভক্তগণ মোক্ষ চাহেন না এ কথা ঠিক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শাস্ত্রকারগণের মধ্যে ও সাধকগণের মধ্যে দুই মত আছে,—কেহ দুঃখবাদী, কেহ সুখবাদী (২৪-২৫ পৃঃ)।

দুঃখবাদী মোক্ষবাদী সন্ন্যাসবাদী—নিবৃত্তিমার্গ

দুঃখবাদিগণই মোক্ষবাদী, সন্ন্যাসবাদী, মায়াবাদী, জ্ঞানবাদী। ইঁহারা বলেন,—সংসার দুঃখময়, জীব স্বীয় কর্ম্মফলে দুঃখভোগী, সেই দুঃখের পরা-নিবৃত্তিই মোক্ষ, উহাই জীবনের লক্ষ্য, কর্ম্মই সংসারবন্ধনের কারণ, সুতরাং কর্ম্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ পথ। জগৎ মিথ্যা, মায়াময়, জীবন মায়াময়, সুতরাং কর্ম্মও মায়াই ; জ্ঞান ব্যতীত মায়াত্যাগ হয় না, সুতরাং সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাবলম্বন করত বিবেক-বৈরাগ্য সাহায্যে জ্ঞানযোগে ব্রাহ্মীস্থিতি বা সমাধিযোগে চিত্তবৃত্তিনিরোধ করত প্রকৃতির অতীত হইয়া কৈবল্যসিদ্ধি লাভ কর। উহাই মোক্ষ। ইহাকে শাস্ত্রে **নিবৃত্তিমার্গ** বলা হয়।

সুখবাদী, জীবনবাদী লীলাবাদী—প্রবৃত্তিমার্গ

অপরপক্ষে, সুখবাদিগণ পরিণামবাদী, জীবনবাদী, লীলাবাদী, ভক্তিবাদী (২৫ পৃঃ)। ইঁহারা বলেন—জগৎ মিথ্যা নয়, জীবনও স্বপ্ন নয়, মায়া তাঁহারই অচিন্ত্য সৃজনী শক্তি। মায়াযোগে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া উহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। তিনি আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, তাই জগতে আনন্দ আছে, জীবের রসবোধ আছে, কেননা তিনি সকলের আত্মা, অখিলাত্মা, অখিলরসামৃতসিন্ধু। তাঁহাকে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন—ইহাই জীবের পরম নিঃশ্রেয়স। তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহারই কর্ম্মবোধে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্মে বন্ধন হয় না। সুতরাং কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে। ইহাকে **প্রবৃত্তিমার্গ** কহে। ইহাই ভাগবত ধর্ম্ম। এই পরমধর্ম্ম 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' ('ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্রপরমঃ—ভাঃ ১।১।২) অর্থাৎ ইহা ফলাভিলাষরূপ কাপট্যশূন্য, ইহাতে ভুক্তি-মুক্তি-স্বর্গ-সিদ্ধি আদি সর্ব্বপ্রকার ফলকামনা পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহা কেনা-বেচার ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম-বাণিজ্য নহে। তাই ভক্তগণ অষ্টসিদ্ধি, পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তি সাযুজ্য-সালোক্যাদি মুক্তি কিছুই চাহেন না, দিলেও গ্রহণ করেন না ('দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ'—ভাঃ ; তাঁহারা কেবল তাঁহার পাদপদ্ম সেবারই প্রার্থী।

কো ন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং সুদুর্ল্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্ ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ—ভাঃ ৩।৪।১৫

—হে ঈশ, যে সকল ব্যক্তি তোমার পাদপদ্ম ভজনা করেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের কোনটিই দুর্ল্লভ নহে ; কিন্তু আমি সে সকল প্রার্থনা করিনা, কেবল তোমার পাদপদ্ম সেবা করিতেই আমি উৎসুখ---(উদ্ধব-বাক্য,---ভাঃ ৩।৪।১৫)।

জন্মান্তর সনাতন ধর্ম্মের একটি মূল তত্ত্ব। উহার সহিত কর্ম্মফলবাদ জড়িত হইয়া দুঃখবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। দুঃখবাদ হইতেই মোক্ষবাদ ও সন্ন্যাসবাদের উদ্ভব হইয়াছে। কালে ভক্তিবাদ ও ভাগবত ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে এই দৃঢ়মূল মোক্ষবাদের মূলও শিথিল হইয়া গেল। প্রেমময়, রসময়, কারুণ্যময় ভগবানকে পাইয়া জীব স্বস্তি লাভ করিল, তাঁহার আনন্দলীলারস আস্বাদন করিয়া মোক্ষ-টোক্ষ ভুলিয়া গেল। কিন্তু মধ্যযুগে বেদান্তের মায়াবাদাত্মক ব্যাখ্যায় এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে এই মোক্ষবাদ ও সন্ন্যাসবাদ হিন্দুর ধর্ম্মজীবনে অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সে প্রভাব এখনও আছে। অহৈতুকী ভক্তিও তো সুলভ নহে। তাই বহির্মুখ জীব সুখস্বরূপ ভগবান্‌কে ভুলিয়া দুঃখ দুঃখ করিতেছে।

আনন্দস্বরূপের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দুঃখবাদের প্রতিপক্ষরূপে সুখবাদ বা লীলাবাদের ব্যাখ্যায়ই প্রবৃত্ত আছি। বিষয়টি ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইবে। আর একটি প্রশ্ন করিয়াছ, বেদান্তের সহিত ব্রজলীলার সম্পর্ক কি ?—সম্পর্ক এই যে, একটি শব্দ অন্যটি তার অর্থ ; শব্দ ও তাহার অর্থ যেমন পরস্পর-সম্পৃক্ত, বেদান্ত ও ভাগবতের ব্রজলীলাও তদ্রূপ।

প্রঃ। শেষোক্ত কথাটির মর্ম্ম কিছুই বুঝিলাম না, বরং বিষয়টি আরো রহস্যাবৃত হইয়া উঠিল।

উঃ। উহা বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হইবে, তাহা ক্রমশঃ পরে বলিব। উহা বুঝিতে হইলে, ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান্, নির্গুণ-সগুণ, নিরাকার-সাকার, অবতার—এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রের মর্ম্ম কি সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এই সকল অবলম্বন করিয়াই নানারূপ সাম্প্রদায়িক মতানৈক্যের উদ্ভব হয় এবং সত্য অনেক সময় রহস্যাবৃতই থাকে।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

সচ্চিদানন্দের বিভিন্ন বিভাব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্

নির্গুণ-সগুণ নিরাকার সাকার অবতার

'তৎ' (তাহা, তিনি) পদার্থের যাহা পরিজ্ঞাপক তাহাকেই তত্ত্ব বলে। তত্ত্ববিদ্‌গণ যে অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন তাহা ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই তিন শব্দে প্রকাশিত হয়—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।—ভাঃ ১।২।১১

চরিতামৃতে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটির মর্ম্মার্থ এইরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে—

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন তার রূপ॥
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনার বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥

সাধনাভেদে একেরই ত্রিবিধ প্রকাশ, একেরই তিন বিভাব। জ্ঞানীর নিকট তিনি ব্রহ্ম, যোগীর নিকট তিনি পরমাত্মা, ভক্তের নিকট তিনি ভগবান্। সকলই সচ্চিদানন্দ।

প্রঃ। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্, বিষ্ণু, বাসুদেব সকলই এক, যিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। কিন্তু সেই স্বরূপ সগুণ না নির্গুণ, সাকার না নিরাকার? ব্রহ্ম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কি সগুণ, সাকার? বাসুদেব কি নির্গুণ, নিরাকার? তাহা যদি না হন, তবে সবই একতত্ত্ব, ইহা কিরূপে বলা যায়। এ সকল বিষয়ে নানারূপ সংশয় উপস্থিত হয়।

উঃ। হইবারই কথা। শাস্ত্র-ব্যাখ্যায়ও মতভেদ না আছে, তা নয়।

উপনিষদে ব্রহ্মস্বরূপের সগুণ, নির্গুণ উভয়বিধ বর্ণনাই আছে—

সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। অস্থূলমনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ —শঙ্কর।

সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম ইত্যাদি সগুণ স্বরূপের বর্ণনা। অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অব্যয় ইত্যাদি নির্গুণ স্বরূপের বর্ণনা। পূর্ব্বোক্ত 'সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের

কিন্তু সেই আশ্চর্য্যকর্ম্মা শ্রীভগবানের অবতার-বিষয়ে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে তিনি যখন নররূপে অবতীর্ণ হন, তখন অধিকাংশ লোকেই তাঁহাকে চিনেও না, ঈশ্বর বলিয়াও গ্রহণ করে না, অবজ্ঞা করে।

ভক্ত ও অভক্ত সকল কালেই আছে। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালেও ছিল। সেকালের জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন, তিনি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই জানিতেন। পক্ষান্তরে শিশুপালাদি তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়াই মনে করিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানের প্রস্তাব করিলে শিশুপাল তাহার তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন—

'বালা যূয়ং ন জানীদ্ধং ধর্ম্মঃ সুক্ষ্মোহি পাণ্ডবাঃ।
অয়ঞ্চ স্মৃত্যতিক্রান্তঃ হ্যাপগেয়োঽল্পদর্শিনঃ' ॥ মভা, সভা, ৩৮

—ওহে পাণ্ডবগণ, তোমরা বালক, কিছুই জান না, ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, এই নদীপুত্রেরও (ভীষ্মের) স্মৃতিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, দেখিতেছি।

এইরূপে পাণ্ডবগণ ও ভীষ্মদেব হইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে শিশুপাল অকথ্য ভাষায় কৃষ্ণনিন্দা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নীরবে সকলই শুনিলেন, কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। কিন্তু তদুত্তরে ভীষ্মদেব এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, তাহাতে তিনি বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কুলেশীলে, জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যে শৌর্য্য-বীর্য্যে আদর্শ মনুষ্য, কেবল তাহাই নহে, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর।—

'কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্ ॥
অয়ন্তু পুরুষো বালঃ শিশুপালো ন বুধ্যতে।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কৃষ্ণং তস্মাদেব প্রভাষতে ॥'-মভা, সভা, ৩৮

এস্থলে ভীষ্মদেব 'অব্যয়' 'ঈশ্বর' বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন যে অল্পবুদ্ধি শিশুপাল তাঁহাকে চিনিতে পারে না বলিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এইরূপ কথা বলে।

শ্রীকৃষ্ণও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥'-গীঃ ৭।২৪

—অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার অনুত্তম নিত্যস্বরূপ না জানায় আমাকে প্রাকৃত ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে।

যিনি অব্যক্ত, অবতার-রূপে তিনিই ব্যক্ত। সুতরাং ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, সগুণ কি নির্গুণ, এ সকল কথা লইয়া বাদ-বিসংবাদ নিরর্থক।

তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, নিরাকার হইয়াও সাকার, ইহাই তাঁহার অলৌকিক মায়া বা যোগ ('পশ্য মে যোগমৈশ্বরং' ইত্যাদি গীঃ ৯।৫, ১১।৮)।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, অবতার—এই তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হইল। এ সকল শব্দে এক পর-তত্ত্বেরই বিভিন্ন বিভাব বুঝায়। ভীষ্মদেব দেহত্যাগ-কালে সেই পর-তত্ত্ব কিরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন তাহা নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। আমরা শ্রীভাগবত হইতে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে এই কথাগুলির মর্ম্ম আরো স্পষ্টীকৃত হইবে, আশা করি।

ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ান, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষিগণ অন্তিম সময়ে তাঁহাকে দর্শনের মানসে আগমন করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট। তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। এমন সময় তাঁহার দেহত্যাগের বাঞ্ছিত কাল উত্তরায়ণ উপস্থিত হইল। তখন তিনি বাক্য সংযত করিলেন এবং বিষয়াদি হইতে মনকে সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণে নিয়োগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার নয়নযুগল নিমীলিত হইল না ('অমীলিতদৃগ্ ব্যধারয়ৎ' ১।৯।৩৪)। তিনি শ্রীভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন—

'ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্তুং প্রকৃতিমুপেয়ষি যদ্ভবপ্রবাহঃ ॥'-ভাঃ ১।৯।৩২

—বিবিধ ধর্ম্মাদি উপায় দ্বারা আমি যে নিষ্কামা মতি লাভ করিয়াছি তাহা আমি এই পরম পুরুষ ভগবানে অর্পণ করিলাম। তাঁহা অপেক্ষা পরতর বস্তু আর কিছু নাই। ইনি আনন্দস্বরূপ, নিরন্তর স্ব-স্বরূপ পরমানন্দে নিমগ্ন আছেন। ইনি ক্রীড়াচ্ছলে ইচ্ছাবশতঃ কখন কখন প্রকৃতি আশ্রয় করেন, তাহাতেই এই সৃষ্টিপ্রবাহ।

এইরূপে ভীষ্মদেব প্রথমে স্বীয় কর্ম্ম ও কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিলেন। তৎপর বলিলেন—আমার আর কোন কামনা নাই, প্রার্থনা করি এই ভক্তবৎসল ভগবানের প্রতিই আমার অচলা রতি হউক ('রতিরস্তু মেঽনবদ্যা')। তৎপর শ্রীভগবানের লোকলীলাদি বর্ণনা করিয়া শেষে বলিলেন,—ওহো! আমার কি সৌভাগ্য! এই পরমাত্মা মৃত্যুকালে আমার নয়নপথের গোচর হইয়াছেন ('মম দৃশিগোচর এষ আবিরাত্মা'-ভাঃ ১।৯।৪১)। এই বলিয়া নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতিটি কিরূপ তাহা বর্ণনা করিলেন—

'তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥'-১।৯।৪২

—আমি দেখিতে পাইতেছি এই জন্মরহিত পরমপুরুষ তাঁহার নিজের সৃষ্ট দেহীদিগের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, আমার ভেদমোহ দূর হইল, আমি এক্ষণে ইঁহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইলাম। তারপর,

কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনোবাগ্‌দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ।
আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য সোহন্তঃশ্বাস উপারমৎ॥
সম্পদ্যমানমাজ্ঞায় ভীষ্মং ব্রহ্মণি নিষ্কলে।
সর্ব্বে বুভুবুস্তে তূষ্ণীং বয়াংসীব দিনাত্যয়ে॥'

—এইরূপে মন, বাক্য ও দৃষ্টিদ্বারা পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সংযোগ করিয়া উপরতি লাভ করিলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত না হইয়া অন্তরেই বিলীন হইয়া গেল ('অন্তঃশ্বাসঃ')। তিনি নিষ্কল (নির্গুণ, নিরুপাধিক) ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করিলেন। সকলে ইহা দেখিয়া দিবাবসানে পক্ষিকুলের ন্যায় নীরব নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, উপরিউক্ত শ্লোকগুলিতে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ সকল কথাই আছে। ভীষ্মদেব যে বস্তু দর্শন করিলেন এবং যাহা প্রাপ্ত হইলেন তাহাকে কি বলিব? বেদান্তশাস্ত্র বলেন, এক বস্তুই সকলের মধ্যেই আছেন, আমাদের যে নানাত্ব-জ্ঞান, ইহা অজ্ঞান, মোহ, একত্ব-দর্শনই জ্ঞান, মোক্ষ ('তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ')। ইঁহাকে বেদান্তে অজ, আত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দে আখ্যাত করা হয়। এখানেও এই সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, অথচ তাঁহার মন, বাক্য, দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত এবং শ্রীকৃষ্ণেই অবিচলা ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার ইষ্ট কি? তিনি সর্ব্বত্র কোন্ বস্তু দর্শন করিলেন এবং তিনি কাঁহাকে লাভ করিলেন? এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে, হইতে পারে কেন, হইয়াছে।

গোস্বামিপাদগণ বলেন, এই শ্লোকটি কৃষ্ণপর, ব্রহ্মপর বলিয়া ব্যাখ্যা করা চলে না ('নেদং পদ্যং ব্রহ্মপরং ব্যাখ্যেয়ম্')। কারণ, পূর্ব্বে এক শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, তিনি যখন চিত্তকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক সম্মুখস্থ শ্রীমূর্ত্তিতে নিয়োগ করিলেন, তখন তাঁহার নয়নযুগল নিমীলিত হইল না। এ কথাটির বিশেষ সার্থকতা আছে। তিনি যখন যোগস্থ হইয়া সেই পরম তত্ত্বে চিত্ত নিবেশ করিলেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতেই আবদ্ধ রহিল, ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া তিনি নয়ন মুদিত করিলেন না। একথাও বলা যায় যে, তিনি সর্ব্বত্রই যে বস্তু দর্শন করিলেন তাহা শ্রীকৃষ্ণই, যেমন অন্যপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

ভীষ্মদেবের তত্ত্বানুভূতি

'কৃষ্ণময়—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে,
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।'

পক্ষান্তরে, গীতা-ভাগবতের অন্যতম ভাষ্যকার উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় এই শ্লোকটি ব্রহ্মপর বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এরূপ ব্যাখ্যায় গোস্বামিপাদগণের আপত্তির যে কারণ তাহারও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভীষ্মদেবের দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণে আবদ্ধ থাকিলেও তাঁহাতে তিনি আত্মারই আবির্ভাব দেখিয়াছেন, তাই তিনি বলিয়াছেন, এই আবির্ভূত আত্মা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন ('মম দৃশিগোচর এষ আবিরাত্মা'—১।৯।৪১)। অন্যান্য সকলের মধ্যেও তিনি সেই এক বস্তুই দেখিয়াছেন এবং তাহা অখণ্ড ব্রহ্ম। পরবর্ত্তী শ্লোকেও নিষ্কল ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করার কথা আছে। সুতরাং শ্লোকটি ব্রহ্মপর না বলিলে এ সকল কথার কোন সার্থকতা থাকেনা।

সাধকের শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কার স্বানুভূতি ও সাম্প্রদায়িক মতানুবর্ত্তনের দরুণ শাস্ত্রব্যাখ্যায় এইরূপ মতভেদ হয়। ইহাকেই **ইষ্টনিষ্ঠা** বলে। শ্রীহনুমান জিউ শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত, তাঁহার দাস্য ভক্তির তুলনা নাই। শ্রীরামচন্দ্র ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, রাম ও কৃষ্ণ তো একই বস্তু, তবে আপনি কেবল রাম রাম করেন, কৃষ্ণকে উপেক্ষা করেন কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন—জানি, পরমাত্মতত্ত্বে রাম ও কৃষ্ণে ভেদ নাই, কিন্তু তথাপি শ্রীরামচন্দ্রই আমার সর্ব্বস্ব—

ইষ্টনিষ্ঠা

'জানামি রামকৃষ্ণয়োরভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥'

প্রঃ। এইরূপ যখন মতভেদ হয় তখন ব্রহ্মে ও ভগবানে কি কোন পার্থক্য আছে?

উঃ। স্বরূপতঃ না থাকিলেও সাধকের দৃষ্টিতে এবং বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে যে পার্থক্য আছে তাহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনাতেই বুঝা যায়। কেহ নির্গুণ নিরাকার চিন্তা করেন, কেহ সগুণ নিরাকার চিন্তা করেন, কেহ সগুণ সাকার চিন্তা করেন, যাঁহার যেমন নিষ্ঠা। বিভিন্ন শাস্ত্রেও বিভিন্ন মতবাদ আছে, কাজেই সাম্প্রদায়িক বাদবিতণ্ডা আছে। এ বিষয়ে শ্রীভগবানের অভয়-বাণী আছে—'আমাকে যে যে-ভাবে ভজনা করে আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি।' ('যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—গী ৪।১১)। এই একটি শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিলে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকে না।

হিন্দুধর্ম্মের উদারতা

'ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মের তুল্য উদার ধর্ম্ম আর নাই—আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্যও আর নাই'—বঙ্কিমচন্দ্র

পরমেশ্বর-স্বরূপ এবং ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম্মাদি সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে পরোক্ষদর্শী আমাদের যে জ্ঞান ও ধারণা তাহা অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় একদেশদর্শী। চারি অন্ধ

হাতীর গায়ে হাত বুলাইয়া ঠিক করিলেন হাতীটা কেমন বস্তু। কেহ বলিলেন, হাতী একটা প্রাচীরের ন্যায়, কেহ বলিলেন—কুলার ন্যায়, কেহ বলিলেন—থামের ন্যায়, কেহ বলিলেন রম্ভাতরুর ন্যায়। কাজেই ভেদবাদ ও বিবাদ। কিন্তু যে চক্ষুষ্মান্ সেই মাত্র হস্তীর সমগ্র স্বরূপ দেখিতে পারে এবং বুঝিতে পারে ওগুলি একই বস্তুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আমাদের বিশ্বাস অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে শ্রীগীতাগ্রন্থখানি সেই চক্ষু। উহাতে পর-তত্ত্বের বিভাবগুলি এবং সনাতন ধর্ম্মের বিভিন্ন অঙ্গগুলির একত্র সমাবেশ করিয়া উহার সমগ্র স্বরূপটি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

সেই সমগ্র স্বরূপটি কি? সংক্ষেপে, তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ। এই হেতুই শ্রীগীতায় পরতত্ত্বের বর্ণনায় পরস্পর বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ আছে। যেমন,—আমি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা (গীঃ ৪।১৩), আমি নির্গুণ হইয়াও গুণপালক, আমি ভূতধারক হইয়াও ভূতস্থ নহি (৯।৫), আমি অব্যক্ত মূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছি (৯।৪), আমি অজ অব্যয়াত্মা হইয়াও আত্মমায়ায় জন্মগ্রহণ করি (৪।৬) ইত্যাদি। পরিশেষে শ্রীভগবান্ আত্ম-পরিচয়ে গুহ্যতম কথা বলিয়া দিলেন ('ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং' ১৫।১০)—আমি ক্ষরের (চেতনাচেতনাত্মক জগৎ) অতীত, এবং অক্ষর (নির্ব্বিশেষ কূটস্থ ব্রহ্ম) হইতেও উত্তম, তাই আমি **পুরুষোত্তম**। আমা অপেক্ষা পরতত্ত্ব আর কিছু নাই ('মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়'—গীঃ ৭।৭)।

পুরুষোত্তম-তত্ত্ব

এই পুরুষোত্তমে ভগবত্তত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের একত্র সমাবেশ। সগুণ-নির্গুণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা সর্ব্বলোকমহেশ্বর পুরুষোত্তমই ভগবত্তত্ত্ব, আর উঁহার যে অক্ষর নির্ব্বিশেষ নির্গুণ বিভাব উহাই ব্রহ্মতত্ত্ব। তাই শ্রীগীতাতে ভগবদুক্তি আছে, আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ('ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্'-১৪।২৭)। অন্যত্র শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যিনি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন তিনিই আমার সমগ্র স্বরূপ জানেন; তিনি সকলভাবেই আমাকে ভজনা করেন ('স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত'—১৫।১৯) অর্থাৎ তাঁহার সগুণ-নির্গুণ সাকার-নিরাকার ইত্যাদি বিষয়ে সংশয় আর উপস্থিত হয় না; তিনি জানেন আমিই নির্গুণ পরব্রহ্ম, আমিই সগুণ বিশ্বরূপ আমিই লীলায় অবতার, আমিই হৃদয়ে পরমাত্মা।

উপনিষৎ শাস্ত্রে অনেকস্থলেই ব্রহ্মের সগুণ-নির্গুণ উভয়বিধ স্বরূপই সূচিত হইয়াছে, এমন কি 'মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত' ব্রহ্মেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু শ্রীগীতাতেই এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরবর্ত্তী সমস্ত পুরাণশাস্ত্রের মূলে এই পুরুষোত্তম তত্ত্বই নিহিত আছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শাস্ত্রব্যাখ্যায় নানারূপ মতভেদ আছে। অদ্বৈত বেদান্তী বলেন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব মায়ার

বিজৃম্ভণ, উপাধি-কল্পিত অবস্তু ('ঈশ্বরত্বন্তু জীবত্বং উপাধিদ্বয়কল্পিতম্'—পঞ্চদশী)। পক্ষান্তরে ভাগবতশাস্ত্রী বলেন—স্বয়ং ভগবান্ই পরতত্ত্ব, ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ ('যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা'—চরিতামৃত)।

কবিরাজ গোস্বামিপাদের এই উক্তি লক্ষ্য করিয়া কোন বেদান্তী বলিয়াছেন, ও কথায় বেদ অমান্য করা হয়, কোন ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রে এমন কথা নাই। কিন্তু রূপকের ভাষা ত্যাগ করিলে উহা 'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' গীতোক্ত এই ভগবদ্বাক্যের মর্ম্মই প্রকাশ করে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়; বেদান্তী যাহাই বলুন।

ব্রহ্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব

বস্তুতঃ, সাধনপথে ভক্তির উপযোগিতা ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলে ভগবত্তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা স্বতঃই আসিবে। গীতা-ভাগবত আদি ভাগবতধর্ম্মের গ্রন্থ, বাসুদেব-ভক্তিই উহার প্রধান কথা। পুরুষোত্তম বাসুদেবই পরব্রহ্ম, সগুণও তিনি, নির্গুণও তিনি, তিনিই সমস্ত, তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই নাই—'সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্ নান্যৎ ত্বদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তম্—ভাঃ ৭।৯।৪৮)। তাই বৈষ্ণব দর্শনের ও বৈষ্ণব তন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥—ব্রহ্ম-সংহিতা

শ্রীকৃষ্ণ অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণের কারণ, গোবিন্দ, পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।

'ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ'—গোস্বামিপাদের এই উক্তিটি অনেক বেদান্তী যেমন 'অবৈদান্তিক' বলিয়া অগ্রাহ্য করেন, তেমনি আবার অনেক বৈষ্ণবভক্ত ঐ উক্তিরই প্রমাণবলে, ব্রহ্মতত্ত্বটি 'অবৈষ্ণবিক' বলিয়া যেন অগ্রাহ্য করেন। বস্তুতঃ, 'অঙ্গজ্যোতিঃ' অর্থ তাঁহার নির্ব্বিশেষ বিভাব। যিনি বেদান্তের সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই বৈষ্ণব ভক্তের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং পার্থক্য সাধন-মার্গে, তত্ত্বে নয়। যে সাধক পরতত্ত্ব যেভাবে গ্রহণ করেন তাঁহার সাধন সেইরূপ হয়—'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'—গীঃ ১৭।৩।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরম কথা। কিন্তু ঔপনিষদিক ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত অবতারতত্ত্ব ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া পরবর্ত্তী কালে যে ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছে তাহাই পূর্ণতর এবং অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য, ইহাই আধুনিক তত্ত্ববিদ্ মনীষিগণের অনেকেরই মত। উহাই পুরুষোত্তমবাদ বা ভাগবত ধর্ম্ম।

শ্রীঅরবিন্দ এই পুরুষোত্তম-তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহার সাহায্যেই গীতোক্ত সমন্বয় যোগের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আধুনিককালে বঙ্কিমচন্দ্র সনাতনধর্ম্ম ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে সারগর্ভ তত্ত্বালোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার মতও উল্লেখযোগ্য।

তিনি লিখিয়াছেন,

—'বৈদিকধর্ম্মের চরমাবস্থা উপনিষদে, সেখানে দেবগণ একেবারে দূরীকৃত বলিলেই হয়। কেবল আনন্দময় ব্রহ্মই উপাস্যরূপে বিরাজমান। এই ধর্ম্ম অতি বিশুদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ।

শেষে গীতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আবির্ভাবের পরে এই সচ্চিদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি মিলিত হইল, তখন হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের মধ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনা, ইহাই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম। ইহাই সকল মনুষ্যের অবলম্বনীয়।' ইহাই **পুরুষোত্তমবাদ**।

বঙ্কিমচন্দ্রের মত

অন্যত্র তিনি 'বৈষ্ণব গৌরদাস বাবাজী'র মুখে বলিতেছেন—

ভগবান্‌কে দুইভাবে চিন্তা করা যায়। যখন তাঁহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং সর্ব্বজগতের আধার বলিয়া চিন্তা করি তখন তাঁহার নাম ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা। আর যখন তাঁহাকে ব্যক্ত, উপাস্য, সেইজন্য চিন্তনীয়, সগুণ এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা স্বরূপ চিন্তা করি তখন তাঁহার নাম সাধারণ কথায় ঈশ্বর, বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষ্ণু বা শিব। আর যখন এককালীন তাঁহার উভয়বিধ লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি অর্থাৎ যখন তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদিত হন তখন তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ।

তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—**'ধর্ম্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা'**।

কৃষ্ণোপাসনায় অনেক-কিছু বুঝায়, সে বিষয়ে পরে আলোচনা হইবে। তৎপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকেই ভালরূপ বুঝিতে চেষ্টা করি। আরও অনেক কথা বলিবার আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সচ্চিদানন্দের ত্রিবিধ শক্তি

শ্রুতি বলেন—

'পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ'—শ্বেত।

সেই পরম পুরুষের বিবিধ শক্তি—তাহাতে স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-শক্তি, বল (ইচ্ছা-) শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত।

'অনন্ত শক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি নাম।'—চরিতামৃত

শাস্ত্রে সচ্চিদানন্দের এই তিনটি শক্তির নাম—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ।—

'হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।' বিষ্ণুপুঃ ১।১২।৬৯

ত্রিবিধশক্তি—সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী

সং-ভাবে যে শক্তি ক্রিয়া করে তাহার নাম সন্ধিনী, চিৎ-ভাবে যে শক্তি ক্রিয়া করে তাহার নাম সংবিৎ এবং আনন্দ-ভাবে যে শক্তি ক্রিয়া করে তাহার নাম হ্লাদিনী।

'আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি' ॥ চৈঃ চঃ।

সৎ-ভাবে যে শক্তি ক্রিয়া করে তাহার নাম **সন্ধিনী**—জগতে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে তাহা এই শক্তির আশ্রয়ে; এই যে জগৎসৃষ্টি, জীবজগতের কর্ম্মপ্রবাহ, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি ('যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্'-গীঃ ১৮।৪৬), এ

সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ কর্ম্মে, ফল—প্রতাপ

সকলের মূলে যে শক্তি ক্রিয়া করে তাহাই সন্ধিনী শক্তি ('যয়া অস্তি ভাবয়তি, করোতি কারয়তি চ' (The principle of Creative Life)। এই শক্তির প্রকাশ কর্ম্মে যাঁহার ফল প্রতাপ। (Power)। তাঁহার শাসনেই চন্দ্র-সূর্য্য স্ব স্ব পথে চলিতেছে, স্বর্গমর্ত্ত স্ব স্ব স্থানে বিধৃত আছে, নদীসকল স্ব স্ব পথে চলিতেছে।—

'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! প্রচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে'—বৃহঃ ৩।৮।৯।

তাঁহার শাসনভয়েই অগ্নি তাপ দেন, সূর্য্য তাপ দেন, ইন্দ্র, বায়ু, যম স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হন—

'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥' কঠ, ২।৩।৩

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে স্তুতি করেন—

দুরন্তশক্তি, বিচিত্রবীর্য্য, পবিত্রকর্ম্মা, লীলারূপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী অব্যয়াত্মা অনন্তকে প্রণতি করি।—

'নতোঽস্ম্যনন্তায় দুরন্তশক্তয়ে বিচিত্রবীর্য্যায় পবিত্রকর্ম্মণে।
বিশ্বস্য সর্গস্থিতিসংযমান্ গুণৈঃ স্বলীলয়া সন্দধতেঽব্যয়াত্মনে'॥ ভাঃ ৭।৮।৪০

চিৎ-ভাবের যে শক্তি তাহার নাম **সংবিৎ**। এই শক্তির ক্রিয়াতেই তিনি স্বতঃচেতন, ইহাদ্বারাই তিনি জীবজগৎকে সচেতন করেন, জ্ঞানবুদ্ধির প্রেরণা দেন ('যয়া বেত্তি বেদয়তি চ' ;—the principle of Knowledge) ইহা জ্ঞানশক্তি।

সংবিৎ শক্তির প্রকাশ জ্ঞানে, ফল—প্রজ্ঞান

এই জ্ঞানদীপদ্বারাই তিনি জীবের অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদিগের অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করেন ('নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা'—গীঃ ১০।১১), তিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদজ্ঞান প্রকাশিত করেন। ইহা অতর্ক্য প্রজ্ঞান ; বিবেকী ব্যক্তিগণের প্রজ্ঞা তাহা হইতেই প্রসৃতা হয় ('প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী'—শ্বেত ৪।১৮)। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্, সর্ব্বজ্ঞতাই তাঁহার তপঃশক্তি ('যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ঃ তপঃ'—মুঃ ১।১।৯) তাই তিনি **জ্ঞানঘন, প্রজ্ঞানঘন**।

আনন্দ-ভাবে যে শক্তি ক্রিয়া করে তাহার নাম **হ্লাদিনী**। এই শক্তিতেই তিনি নিজে আনন্দময়, নিজের স্বরূপানন্দ উপভোগ করেন এবং জীব-জগৎকে আনন্দিত করেন ('যয়া হ্লাদতে, হ্লাদয়তি চ'-ভাগবতসন্দর্ভ—the principle of Delight)। উপনিষৎ বলেন, জীব সেই আনন্দস্বরূপ হইতেই আসিয়াছে, আনন্দদ্বারাই বাঁচিয়া আছে, আনন্দের অভিমুখেই চলিয়াছে, সেই আনন্দস্বরূপেই আবার প্রবেশ করিতেছে। ('আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং

হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ আনন্দে, ফল—প্রেম

প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি—তৈত্তিঃ ৩।৬)। এই হেতুই এই যে সংসার-লীলা, আনন্দস্বরূপের জগৎ-লীলা, ইহাকে বলা হয় আনন্দলীলা। এই শ্রুতিসিদ্ধ লীলাবাদ পূর্ব্বোক্ত দুঃখবাদের ঠিক বিপরীত। এই লীলার একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টিরক্ষার জন্য, জীবের জীবনরক্ষার জন্য, বাঁচিয়া থাকার জন্য, যাহা কিছু প্রয়োজন সে সকলের মধ্যেই ভগবান্ সুখের সংযোগ করিয়া

দিয়াছেন। আমাদের ক্ষুধা লাগে কেন? আহারে সুখ পাই কেন? আহারে অরুচি হইলে জীব কয়দিন বাঁচিতে পারে? স্বাভাবিক বলিয়া আমরা এই সুখের অস্তিত্ব অনুভব করি না, কিন্তু উহা না থাকিলে আমরা আহার গ্রহণ করিতাম না, বাঁচিয়া থাকিতাম না। তাই উপনিষৎ বলেন—যদি সৃষ্টির মূলে আনন্দ না থাকিত তবে কে-ই বা আহার গ্রহণ করিত, আর কে-ই বা বাঁচিয়া থাকিত? তিনিই সকলকে আনন্দিত করেন ('কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি'—তৈত্তিঃ ২।৭)।

এই লীলাবাদের আরো সূক্ষ্মতর কথা হইতেছে এই যে, জীব আনন্দস্বরূপের দিকেই যাইতেছে, আনন্দস্বরূপেই প্রবেশ করিতেছে। ('আনন্দং প্রত্যয়ন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি')। আনন্দই উচ্চতম গ্রামে প্রেমরূপে ব্যঞ্জিত হয়, 'হ্লাদিনীর সার প্রেম'। যিনি আনন্দঘন, রসঘন, তিনিই **প্রেমঘন**। সেই রসময় প্রেমময় সততই জীবকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন ('ত্রিজগন্মাসাকর্ষী')। জীবেরও তাঁহার দিকে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, কেননা জীব তাঁহা হইতেই আসিয়াছে (আনন্দাদ্ধ্যেব ভূতানি জায়ন্তে), তিনি সিন্ধু, জীব বিন্দু, বিন্দু সিন্ধুতে মিলিতে চায়। এই স্বাভাবিক আকর্ষণই অহৈতুকী ভক্তি বা প্রেম—'সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা। অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী'-ভাঃ ৩।২৫।৩১)। এই জন্যই ভক্তিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়'-চৈঃ চঃ। প্রেম জীবের অন্তরেই আছেন, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে স্বতঃই উদিত হন—'শ্রবণাদ্যে শুদ্ধচিত্তে করেন উদয়'—চৈঃ চঃ।

আমরা দেখিলাম, 'সচ্চিদানন্দ একাধারে সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি, অখণ্ড প্রতাপ, অতর্ক্য প্রজ্ঞা ও অজস্র প্রেমের অফুরন্ত উৎস।

সচ্চিদানন্দ একাধারে প্রতাপঘন, প্রজ্ঞানঘন, প্রেমঘন

আধুনিক তত্ত্ববিদ্যা বা থিয়োজফি শাস্ত্রের ভাষায়—The glorious Trinity of Power, Wisdom and Love,—কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেমের উচ্ছল প্রস্রবণ, একাধারে **প্রতাপঘন, প্রজ্ঞানঘন, প্রেমঘন**।*

সচ্চিদানন্দের স্বরূপ ও শক্তি বুঝিতে বাহিরেও কিছু খোঁজ করিতে হয়না, আমাদের ভিতরে অনুসন্ধান করিলেই আমরা উহা বুঝিতে পারি, ধরিতে পারি। এই যে আমরা 'আমি' 'আমি' করি—আমি কর্ম্ম করি, আমি চিন্তা করি, আমি ইচ্ছা করি, এই 'আমি' কে? 'আমি' দেহ নয়, ইন্দ্রিয়াদি নয়, 'আমি' দেহাবস্থিত অথচ দেহাতিরিক্ত চৈতন্যস্বরূপ কোন বস্তু যাহার শাস্ত্রীয় নাম জীব, জীবচৈতন্য বা জীবাত্মা।

* বেদান্তরত্ন ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

এই জীব একাধারে কর্ত্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা। সুতরাং উহার ত্রিবিধ শক্তি—কর্ম্মশক্তি, যাহার ক্রিয়ায় ইনি কর্ত্তা; জ্ঞানশক্তি, যাহার ক্রিয়ায় ইনি জ্ঞাতা; এবং ইচ্ছাশক্তি, যাহার ক্রিয়ায় ইনি ভোক্তা। কর্ম্মশক্তির বিকাশ চেষ্টনায় (পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান ইহাকে বলে Conation), জ্ঞানশক্তির বিকাশ ভাবনায় (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের Cognition), ইচ্ছাশক্তির বিকাশ কামনায় (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের Emotion)। ইংরেজীতে সাধারণ কথায় ইহাদিগকে বলে Action, Thought, Desire. এ সকল বৈজ্ঞানিক সত্য এবং স্বানুভবসিদ্ধ। জীবের যে এই তিনটি শক্তি উহা সচ্চিদানন্দের ত্রিবিধ শক্তির অনুরূপ, কিন্তু অস্ফুট, অবিশুদ্ধ। জীব ব্রহ্মেরই অংশ ('মমৈবাংশো জীবভূতঃ'), ব্রহ্ম-কণা, ব্রহ্ম-অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ('যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ'—মুঃ ২।১।১)। স্ফুলিঙ্গে অগ্নির লক্ষণ থাকিবেই, তাই জীবেও ব্রহ্মলক্ষণ আছে ('সত্য-জ্ঞানমনন্তঞ্চ্যত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্'—পঞ্চদশী। কিন্তু জীবে উহা অস্ফুট, বীজাবস্থ, ব্রহ্মে পূর্ণ উচ্ছ্বসিত, এই হেতু ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক ('অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ'-ব্রঃ সূঃ)। জীবের মধ্যে যে কর্ম্মশক্তি উহাই উচ্চতম গ্রামে সন্ধিনী যাহার ফল অখণ্ড প্রতাপ, জীবের মধ্যে যে জ্ঞানশক্তি তাহাই উচ্চতম গ্রামে সংবিৎ যাহার ফল অতর্ক্য প্রজ্ঞান, জীবের মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তি উহাই উচ্চতম গ্রামে হ্লাদিনী যাহার ফল প্রেম।

জীবের ত্রিবিধ শক্তি—কর্ম্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি

কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম (Life, Light and Love)—এই তিনটি জীবে অস্ফুট, অপূর্ণ, প্রকৃতি-জড়িত অবিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে, সাধনবলে এই তিনটি বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরমুখী হইয়া পূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইলে জীবও ঐশ্বরিক প্রকৃতি বা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। ('পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ'; 'মম স্বাধর্ম্ম্যমাগতাঃ'—গীঃ ৪।১০)।

এই তিনের পূর্ণবিকাশে ভাগবত-প্রকৃতি লাভ

'সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চরে॥' চৈঃ চঃ

জীবের অন্তর্নিহিত এই যে তিনটি শক্তি আছে তদনুসারে সাধনের তিনটি পথের নামকরণ হইয়াছে—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ। জীবের মধ্যে যে অস্ফুট সৎ-ভাব উহার প্রকাশ তাহার কর্ম্মে। সুতরাং তাহার কর্ম্ম ঈশ্বরমুখী হইলে উহা বিশুদ্ধ হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হয়। জীবের মধ্যে যে অস্ফুট চিৎ-ভাব উহার প্রকাশ তাহার জ্ঞানে, ভাবনায়, উহা বিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরমুখী হইলেই জ্ঞানযোগ হয়। জীবের মধ্যে যে অস্ফুট আনন্দভাব উহার প্রকাশ তাহার কামনায়; উহা বিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরমুখী হইলেই প্রেমভক্তিযোগ হয়। এই তিনটির যুগপৎ অনুষ্ঠানেই জীবের

পূর্ণ বিকাশ, উহাই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম। এই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে পূর্ণাঙ্গ ভক্তিযোগ, কেননা ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তি ব্যতীত ভাবনা ও কর্ম্ম ঈশ্বরমুখী হইতে পারে না; উহা অন্যমুখী হয়, যেমন ভক্তিহীন বৈদিক কর্ম্মযোগ স্বর্গমুখী বা ভক্তিহীন বৈদান্তিক জ্ঞানযোগ নির্ব্বাণমুখী। এই পূর্ণাঙ্গ ভক্তিযোগই ভাগবত ধর্ম্ম। ইহাতে ভক্তির সহিত জ্ঞান ও কর্ম্মের সমাবেশ আছে, কিন্তু সে কর্ম্ম অর্থ ঈশ্বরের কর্ম্ম, ঈশ্বর প্রীত্যর্থ কর্ম্ম, আর জ্ঞান অর্থ ভগবত্তা-জ্ঞান।

পূর্ণাঙ্গ ভক্তিযোগ

এ সম্বন্ধে পরে আলোচনার অবকাশ হইবে। এক্ষণে সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

সচ্চিদানন্দের ত্রিবিধ শক্তির প্রকাশ তাঁহার সৃষ্টিতে বা জগৎ-লীলায়। বিশেষভাবে এই সকল শক্তির পরিচয় পাই আমরা তাঁহার অবতার-লীলায়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—আমি জন্মরহিত হইলেও লোকহিতার্থ আত্মমায়ায় দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হই (গীঃ ৪।৬-৮)। ইহাই তাঁহার অবতার-লীলা। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন—

আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম্মের মর্ম্ম যিনি তত্ত্বতঃ জানেন তিনি দেহান্তে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না, আমাকেই প্রাপ্ত হন। বিষয়চিন্তা তাহার দূর হয়; তাহার চিত্ত আমার চিন্তাতেই পূর্ণ থাকে, তিনি সর্ব্বতোভাবে আমারই আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইরূপে আমার জন্মকর্ম্মের জ্ঞানদ্বারা পবিত্র হইয়া অনেকেই আমার পরমানন্দভাবে স্থিতিলাভ করিয়াছেন—

লীলাতত্ত্বের অনুধ্যান শ্রেষ্ঠসাধনা

'জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ'॥—গীঃ ৪।৯-১০

সুতরাং বুঝা গেল, তাঁহার জন্ম-কর্ম্মের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ-সাধনা। কিন্তু সেই জন্ম-কর্ম্মের বা লীলার মর্ম্ম তত্ত্বতঃ বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবান্ অজ, অব্যয়াত্মা, ঈশ্বর হইয়াও আত্মমায়ায় দেহ-ধারণ করেন, তিনি নিষ্ক্রিয়, অকর্ত্তা হইয়াও নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করেন, তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, অশেষকল্যাণগুণোপেত, অহেতুক কৃপাসিন্ধু লোকরক্ষার্থ ও লোকশিক্ষার্থেই তিনি এই নর-লীলা করেন; তিনি রসঘন, প্রেমঘন তাঁহার প্রেমলীলারস আস্বাদ করিয়া জীব যাহাতে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এই হেতুই তিনি রসরাজরূপেও লীলা করেন।

বস্তুতঃ লীলাময়ের লীলার অনুধ্যানই শ্রেষ্ঠ সাধনা, তাঁহাকে বুঝিবার, ধরিবার পাইবার প্রকৃষ্ট পথ। বেদ-পুরাণে তিনি পুস্তকস্থ, জপেতপে তিনি দূরস্থ, কিন্তু লীলায়

তিনি একেবারে সম্মুখস্থ। যখন আমরা মানস-নেত্রে দেখি, সেই রসময় প্রেমময় মানবদেহ ধারণ করিয়া মানুষের সঙ্গে লীলা করিতেছেন, সকলকে সুমধুর স্বরে আহ্বান করিতেছেন—আয়, আয়, আয়—তোরা তো আমার খেলার সাথী, তখন আমাদের সমস্ত দুঃখসন্তাপ দূর হয়, মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়, চিত্ত স্বতঃই তাঁহার দিকে ধাবিত হয়। এই তত্ত্বটি তত্ত্বদর্শিনী মহীয়সী অ্যানি বেসাণ্ট (Anne Besant) অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

When He who is beauty and love and bliss, sheds a little portion of Himself on earth, enclosed in human form, the weary eyes of men light up, the tired hearts of men expand with a new hope and new vigour. They are irresistably attracted to Him. Devotion spontaneously springs up.

অবতারতত্ত্ব ও অবতারের প্রয়োজন এইরূপভাবেই শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শুকদেব বলিতেছেন—

'অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতি তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥' ভাঃ ১০।৩৩।৩৬

—জীবের মঙ্গলসাধনার্থই তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া এই সকল ক্রীড়া করিয়া থাকেন, জীব ঐ সকল লীলাকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারিবে, ভক্তিমান্ হইতে পারিবে।

অন্যত্র শ্রীভাগবত কুন্তীদেবীর মুখে বলিতেছেন—

'ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানাম্ অবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হানি করিষ্যন্নিতি কেচন ॥
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥'—ভাঃ ১।৮।৩৫-৩৬

—অবিদ্যাবশে কামনা-কলুষিত কর্ম্মাদিতে আসক্ত হইয়া জীবসকল অশেষ ক্লেশভোগ করে, শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য লীলা-প্রকাশদ্বারা অবিদ্যা-পীড়িত জীবগণকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যেই হে কৃষ্ণ! তোমার অবতার গ্রহণ।

যাঁহারা সতত তোমার পবিত্র লীলাকথা শ্রবণ করেন, গান করেন, কীর্ত্তন করেন, স্মরণ করেন, এবং অন্যের নিকট কীর্ত্তন করিয়া আনন্দিত হন, তাঁহারা অচিরেই তোমার ভব-নাশন চরণপদ্ম দর্শন করেন।

আমরা এক্ষণে সচ্চিদানন্দের লীলা-তত্ত্বেরই আলোচনা করিব এবং লীলার মধ্য দিয়াই তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সচ্চিদানন্দের স্বরূপ ও শক্তির আলোচনা

প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি তিনি ত্রেধাত্মা—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি,—একাধারে প্রেমঘন, প্রতাপঘন, প্রজ্ঞানঘন। পুরাণাদিগ্রন্থে তাঁহার লীলাও ত্রিধা-বিভক্ত—ব্রজলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা। ব্রজলীলায় প্রধানতঃ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির, আনন্দভাবের প্রকাশ, মথুরা-কুরুক্ষেত্রে এবং দ্বারকায় তাঁহার সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তির প্রকাশ অর্থাৎ ব্রজে তিনি প্রেমঘন, পুরীদ্বয়ে তিনি প্রতাপঘন ও প্রজ্ঞানঘন।

সৎ-চিৎ-আনন্দ, সন্ধিনী-সংবিৎ-হ্লাদিনী—এই তিনটি শক্তি তাঁহাতে শবলিত, একত্র জড়িত, উহাদিগকে পৃথক্ করা যায় না; তবে কোন লীলায় মাধুর্য্যের প্রকাশ, কোন লীলায় ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। ব্রজলীলায় মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য, অন্যত্র ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য।

বলা বাহুল্য, আমাদের লীলা-তত্ত্বের আলোচনা পুরাণশাস্ত্র অবলম্বনে, কেননা পুরাণেই শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণশাস্ত্রের মূলভিত্তি উপনিষৎ বা বেদান্ত। উপনিষৎ, বেদান্ত-দর্শন ও শ্রীগীতা, এই তিন শাস্ত্রকে 'প্রস্থান-ত্রয়ী' বলা হয়। এই প্রস্থান-ত্রয়ীই সনাতন-ধর্ম্মের মূল-ভিত্তি। এই তিন শাস্ত্রের বিরোধী কোন ধর্ম্মমত এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এই হেতু এ দেশে যত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, সকলেই নিজ নিজ মতের পরিপোষণার্থ ঐ সকল শাস্ত্রের টীকা-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মমত ঐ সকল শাস্ত্রেরই অনুকূল। সুতরাং আমাদের পৌরাণিক আলোচনা বেদান্তের ভিত্তিতেই হইবে।

প্রস্থান-ত্রয়ী

আমাদের বাংলাদেশে শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাদের ধর্ম্মমতও সুপরিচিত। বলা বাহুল্য, এই ধর্ম্মের মূলও বেদান্তে, বিশেষভাবে উপনিষদের রসব্রহ্মই ইঁহাদের সাধনার বস্তু। যিনি উপনিষদের 'রসো বৈ সঃ', তিনিই ব্রজের রসরাজ। গোস্বামি-শাস্ত্র বলেন, ব্রজের কৃষ্ণই পূর্ণতম, মথুরা-কুরুক্ষেত্র ও দ্বারকার কৃষ্ণ পূর্ণতর, পূর্ণ।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম বেদান্ত-মূল

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥ (শ্রীরূপ)
এই কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্।
আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ নাম॥ (চরিতামৃত)।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তো বলেন, 'কৃষ্ণ' শব্দে যশোদানন্দন ব্রজের কৃষ্ণই বুঝায়, যদুপতি কৃষ্ণ বুঝায় না ('তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ')।

ব্রজের কৃষ্ণ ও যাদব কৃষ্ণ

'কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো, যস্তু গোপালনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি॥'

—যদুনন্দন কৃষ্ণ অন্য, যিনি গোপালনন্দন তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কোথায়ও যান না।

এ কথা শিরোধার্য্য। তিনি রসব্রহ্ম, বৃন্দাবনই রসপ্রকাশের, রাস-লীলার ধাম এবং এই লীলা নিত্যলীলা। সুতরাং রাসবিহারী বৃন্দাবন ত্যাগ করিবেন কিরূপে?

কিন্তু তিনি নিত্য বৃন্দাবনে নিত্যভাবে থাকিয়াও অন্যত্র অন্য লীলা করিতে পারেন। তাঁহাতে অসম্ভব কিছু আছে কি?

কথা হইতেছে এই যে, কৃষ্ণ কেমন, যার ভাব যেমন। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের মল্লরঙ্গে প্রবেশ করিলেন, তখন উপস্থিত দর্শকগণের সোৎসুক দৃষ্টি যুগপৎ তাঁহার দিকে পতিত হইল। কিন্তু সকলে তাঁহাকে একরূপ দেখিলেন না।—

মল্লদিগের নিকট তিনি বজ্র, নরগণের নিকট নরশ্রেষ্ঠ, নারীগণের নিকট মূর্ত্তিমান কন্দর্প, গোপগণের নিকট স্বজন, পিতামাতার নিকট শিশু, বৃষ্ণিগণের নিকট পরম দেবতা, যোগিগণের নিকট পরমতত্ত্বরূপে, অজ্ঞগণের নিকট বিকট বিরাট রূপে, কংসের নিকট মৃত্যুরূপে এবং দুষ্ট নরপতিদিগের নিকট শাস্তারূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

'মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ, স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্,
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা, স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং, তত্ত্বং পরং যোগিনাং,
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ'॥ ভাঃ ১০।৪৩।১৭

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন—শ্রীভগবান্ সর্ব্বরসকদম্বমূর্ত্তি, তিনি যখন রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহাতে দশ রসেরই যুগপৎ আবির্ভাব ছিল, কিন্তু সকলে সাকল্যে তাহা দেখিলনা ('ন সাকল্যেন সর্ব্বেষাং), যাহার যেরূপ ভাব সে তাঁহাকে সেইরূপই দেখিল (তৎ তদ্ অভিপ্রায়ানুসারেণ বভৌ, মল্লাদিষু অভিব্যক্তা রসাঃ ক্রমেণ নিবধ্যন্তে)।—মল্লেরা তাঁহাকে দেখিল বজ্ররূপে (রৌদ্র রস), রমণীরা দেখিল কন্দর্পরূপে (শৃঙ্গার রস), পিতামাতা দেখিলেন শিশুরূপে (বাৎসল্য রস), দুষ্ট রাজারা দেখিল শাস্তারূপে (বীররস), কংস দেখিল মৃত্যুরূপে (ভয়ানক রস), যোগীরা দেখিলেন পরমতত্ত্বরূপে (শান্তরস) ইত্যাদি।

এই তো শ্রীকৃষ্ণ—'সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ' (চৈঃ চঃ)। ব্রজের বাহিরে না গেলে তাঁহার লীলার সমগ্র প্রকাশ হয় কি? ব্রজের মাধুর্য্য-লীলাও যাঁহার, মথুরা দ্বারকার ঐশ্বর্য্য-লীলাও তাঁহারই।

প্রথমে ব্রজলীলা।

তৃতীয় অধ্যায়

সচ্চিদানন্দের লীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সচ্চিদানন্দ—রসময় প্রেমঘন

বেদান্ত ও ব্রজের ভাব

প্রঃ। আমার পূর্ব্বপ্রশ্নটির উত্তর পাই নাই—বেদান্তের সহিত শ্রীভাগবতের ব্রজলীলার সম্পর্ক কি ?

উঃ। তাহাই এখন বলিব—সে অনেক কথা।

শ্রীমদ্ভাগবত ভাগবত-ধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ, বৈষ্ণবগণের বেদস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক গ্রন্থসমূহের শিরোমণি, ইহাকে পুরাণ-চক্রবর্ত্তী বলা হয়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে ইহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, সর্ব্ববেদান্তসার—

'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং' ; 'সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে'—গরুড় পুরাণ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থেও এই কথারই প্রতিধ্বনি আছে—

'অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক উপনিষদ্ কহে একমত॥'

গ্রন্থ-পরিচয়ে গ্রন্থকার স্বয়ংই বলিয়াছেন, ইহা 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং'—বেদরূপকল্পপাদপের পরমানন্দরসপূর্ণ এই ভাগবত-ফল।

উপনিষৎ বা বেদান্তের সাধ্য বস্তু ব্রহ্ম বা আত্মা, সাধন—জ্ঞান। উহাতে ভক্তির প্রসঙ্গ নাই।

বেদান্ত ও ভাগবত

পক্ষান্তরে, শ্রীভাগবত ভক্তিরসের প্রস্রবণ, উহাতে শ্লোকে শ্লোকে শ্রীহরির যশঃকীর্ত্তন ও ভক্তি-মাহাত্ম্য-বর্ণন। রাস-লীলা উহার মধ্য-মণি। মহামুনি ভক্তিরসে সমুজ্জ্বল এই মহাগ্রন্থ জগতে প্রচারিত করিয়া গ্রন্থারম্ভে বলিতেছেন—হে ভাবনা-চতুর রসিক ভক্তবৃন্দ ! তোমরা এই ভাগবতামৃত রস মুহুর্ম্মুহু পান করিয়া কৃতার্থ হও।

'পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ'—ভাঃ ১।১।৩

এই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে ভগবানে অহৈতুকী অব্যভিচারী ভক্তিই মানবের পরম ধর্ম্ম ('স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে' ভাঃ ১।২।৬)। ভগবদ্ভক্তি-রহিত হইলে নিরুপাধিক নির্ম্মল জ্ঞানও শোভা পায় না (নৈষ্কর্ম্ম্যম্ অপি অচ্যুতভাববর্জ্জিতঃ ন শোভতে জ্ঞানং অলং নিরঞ্জনম্'-ভাঃ ১।৫।১২)।

ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান নিষ্ফল

যাহারা শ্রেয়ঃসাধন ভক্তি ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ করে তাহাদের ক্লেশই সার হয়, যেমন ধান্য পরিত্যাগ করিয়া তুষরাশি তাড়না করিলে কেবল পরিশ্রমই সার হয়।—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥-ভাঃ ১০।১৪।৪

এইতো শ্রীভাগবত গ্রন্থের অভিধেয়। অথচ ইহাকে 'বেদান্তের ভাষ্য' 'সর্ব্ব-বেদান্তের সার' বলা হইয়াছে। এ কথার অর্থ কি? এই সমস্যাই তোমার প্রশ্নে উত্থাপিত হইয়াছে যে—ঋষিগণের অনুভব আর গোপীজনের অনুভব কি এক? বেদান্তের সহিত ভাগবতের ব্রজলীলার—রাসলীলার সম্পর্ক কি?

কোন শাস্ত্র-বিচারের দুইটি দিক্—এক তত্ত্ব, আর সাধন। বেদান্তশাস্ত্রের তত্ত্ব হইতেছেন ব্রহ্ম বা আত্মা, সাধন জ্ঞানমার্গ বা যোগমার্গ। সুতরাং শ্রীভাগবত বেদান্তের ভাষ্যস্থানীয় কিরূপে, এই প্রশ্নের সম্যক্ সমাধান করিতে হইলে আমাদিগকে এই দুইটি বিষয়ই আলোচনা করিতে হইবে।

প্রথম—বেদান্তে যে ব্রহ্মস্বরূপ বা আত্মস্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে শ্রীভাগবতে তাহা কিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীভাগবত লীলা-বর্ণনা দ্বারা কিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণই সেই বস্তু।

দ্বিতীয়—মুনিঋষিগণ যে ব্রহ্মচিন্তা বা আত্মচিন্তাদ্বারা পরমপদ লাভ করেন শ্রীভাগবত লীলাবর্ণনাদ্বারা কিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সেই ব্রহ্মচিন্তা বা আত্মচিন্তা এবং ভাগবত-বর্ণিত সাধনপথ আপাততঃ বিভিন্ন বোধ হইলেও মূলতঃ একই।

প্রথম দেখা যাউক, ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বেদান্ত কি বলেন।—
ইনি রস ('রসো বৈ সঃ' ; 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি' ;)
ইনি আনন্দ ('আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'। 'আনন্দস্বরূপমমৃতং যদ্বিভাতি')।
ইনি মধু ('মধু ক্ষরতি তদ্‌ব্রহ্ম'—মহানারায়ণ)
ইনি প্রিয় ('আত্মানমেব প্রিয়ম্ উপাসীত'—বৃহঃ ১।৪।৮)

ইনি প্রিয়তম ('অস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ প্রিয়তমঃ আনন্দঘনং হি'—নৃসিংহতাপনী)
ইনি পরম প্রেমাস্পদ ('অয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ'—পঞ্চদশী)

বেদান্ত আর একটি কথা বলিয়াছেন যাহা সকল প্রীতি-তত্ত্বের, নীতি-তত্ত্বের সার। বেদান্ত বলেন—সেই মধু, সেই রসতম, সকলের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছেন, সুতরাং যে কেহ বা যাহা কিছু আমাদের নিকট প্রিয় হয় তাহার প্রিয়তার কারণ তিনিই, সেই বস্তু নয়। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন—

'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি।'—বৃহঃ ৪।৫।৬

—'পতির প্রতি অনুরাগবশতঃ পতি প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি অনুরাগবশতঃই পতি প্রিয়। পুত্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ পুত্র প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি অনুরাগবশতঃই পুত্র প্রিয় হয়। লোকসমূহের প্রতি অনুরাগবশতঃ লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি অনুরাগবশতঃই লোকসমূহ প্রিয় হয়। সর্ব্বভূতের প্রতি অনুরাগবশতঃ সর্ব্বভূত প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি অনুরাগবশতঃই সর্ব্বভূত প্রিয় হয়।'

এই আত্মা পরমাত্মা, অখিলাত্মা, তিনি আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, মধুস্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত ঋষিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীব কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সংস্পর্শে যে প্রীতি অনুভব করে, যে আনন্দ অনুভব করে, তাহা সেই ভূমানন্দেরই এক কণা। তিনিই সকল আনন্দের উৎস, প্রেমের উৎস। তাহা অপেক্ষা প্রিয় কিছু নাই, তিনি পতি পুত্রাদি হইতে প্রিয়, বিত্তাদি হইতে প্রিয়, অন্য সমস্ত হইতে প্রিয় ('প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ঃ বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ'—বৃহঃ ১।৪।৮)।

এই তো বেদান্ত-তত্ত্ব। তিনি সকলের প্রিয়, অন্য সকল প্রিয়বস্তু হইতে প্রিয়, তিনি সকলের আত্মা, অখিলাত্মা। এই বেদান্ত-তত্ত্বটিই ভাগবতকার ব্রজলীলা-বর্ণনায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অখিলাত্মা, তিনি বৃন্দাবনে মূর্ত্ত হইয়া অবতীর্ণ। ব্রজবাসিগণ প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন তিনি তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রিয়তম আত্মা, প্রাণের প্রাণ। তিনি নন্দ-যশোদার এবং তৎস্থানীয় গোপ-গোপীগণের প্রাণের দুলাল, গোপ-বালকগণের প্রাণের সখা, গোপিকাগণের প্রাণবল্লভ। গোপীগণের সঙ্গে রসময়ের যে লীলা তাহাকেই সাধারণতঃ রাসলীলা বলা হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্রজের সকলের সঙ্গেই তাহার রস-লীলা, আনন্দ-লীলা, কেননা তিনি মূর্ত্তিমান্ আনন্দ, বৃন্দাবন মূর্ত্ত আনন্দধাম, যেখানে আনন্দের, হ্লাদিনী-শক্তির বিশ্রাম।

বেদান্তের অখিলাত্মা ব্রজে প্রকট

ইহা কিছু আমাদের মনঃকল্পিত ব্যাখ্যা নহে, ভাগবতে নানাভাবে এই তত্ত্বই আখ্যাত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

গোপগণ নন্দরাজকে বলিতেছেন—তোমার এই বালকের বিষয়ে আমাদের বড়ই বিস্ময় ও সন্দেহ হইতেছে। তিন মাসের শিশু পদের আঘাতে শকটটি বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল, এক বৎসর বয়ঃক্রমকালে তৃণাবর্ত্তকে কণ্ঠরোধ করিয়া বধ করিল; সাত বৎসরের শিশু কিরূপে অবলীলাক্রমে গিরিরাজ ধারণ করিল ?

আর একটি বিষয়েও আমরা বড়ই বিস্ময়বোধ করিতেছি—তোমরা এই বালকের প্রতি ব্রজবাসী আমাদের সকলেরই দুস্ত্যজ অনুরাগ জন্মিয়াছে, ইহাকে আমরা ভাল না বাসিয়া পারি না, আর ইহারই বা আমাদের সকলের প্রতি এমন স্বাভাবিক অনুরাগ কেন ?—

'দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্।
নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপি-ঔৎপত্তিকঃ কথম্॥-'ভাঃ ১০।২৬।১১

[ঔৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকঃ। কিং সর্ব্বেষামাত্মা অয়ং স্যাৎ ইতি শঙ্কা—শ্রীধর]

ঠিক এই প্রশ্নই ভাগবতকার অন্যত্রও উত্থাপন করিয়াছেন। রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন—'ব্রহ্মন্, কৃষ্ণ তো পরের ছেলে; কিন্তু নিজ নিজ পুত্রদিগের প্রতি ব্রজবাসী-দিগের যেরূপ স্নেহ ছিল, তাঁহার প্রতি তাহারা তদপেক্ষা অধিক স্নেহ করিত কেন ?'—

'ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ।
যো ভূতপূর্ব্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতাম্॥' ভাঃ ১০।১৪।৪৯

উত্তরে শ্রীশুকদেব যাহা বলিলেন তাহা অধ্যাত্মতত্ত্বের সারকথা এবং তাহাতে ব্রজলীলা-রহস্য বুঝিবার সুস্পষ্ট সঙ্কেত আছে। সানুবাদ মূল অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীশুকদেব কহিলেন—

'সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥
তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বি-পুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥
দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্॥
দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥
তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বম্ আত্মানম্ অখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ভাঃ ১০।১৪।৫০-৫৫

—আত্মাই যাবতীয় ভূতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ; পুত্র-বিত্তাদি অন্য যাবতীয় বস্তু আত্মার প্রিয় বলিয়াই প্রিয়। এই কারণেই স্ব স্ব আত্মার প্রতি দেহীদিগের যেরূপ স্নেহ হয়, মমতাশ্রয়ী পুত্র, বিত্ত, গৃহাদির প্রতি সেরূপ হয়না। যাহারা দেহকেই আত্মা বলেন সেই দেহাত্মবাদীদিগেরও নিজ দেহ যেরূপ প্রিয়তম, দেহের অনুবর্ত্তী পুত্রাদি সেরূপ নহে। দেহ মমতাভাজন বটে, কিন্তু আত্মার ন্যায় প্রিয় নহে। যখন দেহ জরাজীর্ণ, দেহসুখভোগ বিলুপ্ত, মৃত্যু আসন্ন, তখনও জীবের জীবনের আশা বলবতীই থাকে। অতএব নিজের আত্মাই সর্ব্বদেহীর প্রিয়তম, এই চরাচর জগৎ আত্মার জন্যই প্রিয়। কৃষ্ণকে যাবতীয় আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে। তিনি জগতের হিতের জন্য মায়াযোগে এই পৃথিবীতে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পান।

সুতরাং সেই ভগবান্ মুকুন্দ যখন বৃন্দাবনে প্রকট হইলেন তখন ব্রজবাসিগণ সকলেই তাঁহাকে আত্মার আত্মা বলিয়া মনে করিতেন ('যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ'-১০।১৪।৩৪)।

কেবল নর-নারী নয়, ব্রজের পশু-পাখী, তরুলতা সকলই তাঁহার প্রকাশে পুলকিত ; ব্রজের ভূমি, গিরি, নদীও তাহার প্রকাশে প্রাণবন্ত, কেননা তিনি তো জগদাত্মা, চিদাত্মা, তাঁহার পরশে অচিৎ-ও চিন্ময়। আমরা পূর্ব্ব আলোচনায় দেখিয়াছি (পৃষ্ঠা ১১-১৬) যে তত্ত্বদৃষ্টিতে জীবে অজীবে কোন পার্থক্য নাই, সকলই সচ্চিদানন্দময়, সকলই কৃষ্ণময়। 'বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ ভগবদ্রূপমখিলম্'-১০।১৪।৫৬)। কৃষ্ণ জড়, অজড় সকলেরই আত্মা। আত্মা সকলেরই প্রিয়, সুতরাং কৃষ্ণ ব্রজের পশু-পাখী, তরুলতা সকলেরই প্রিয়।

ব্রজের গোপ, গোপী, গোপ-বালকগণের বাৎসল্য, মধুর ও সখ্য প্রেমের যে চিত্র ভাগবতকার অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সুবিদিত। আমাদের বাংলাদেশে উহার ভিত্তিতে এক অনবদ্য বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাকে পদাবলী সাহিত্য বলে। ব্রজের পশু-পাখী, তরুলতার কৃষ্ণপ্রেমের কথা যে অনুপম দেবভাষায় ভাগবতকার বলিয়াছেন তাহার একটু পরিচয় নিম্নে দিলাম। অনুবাদে সে বর্ণনার সৌন্দর্য্য রক্ষা করার আমাদের সামর্থ্য নাই।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, তাই তিনি কৃষ্ণ ('ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমূরলী কলকূজিতঃ')।

শ্রীকৃষ্ণের মুরলী

তিনি রসস্বরূপ, একথার অর্থ এই, তিনি রসের আস্বাদ্য ও আস্বাদক উভয়ই। তিনি যেমন সকলের প্রিয়, সকলেও তেমন তাঁহার প্রিয়। তিনি প্রেমঘন, প্রেমময়, প্রেমলীলার জন্য বৃন্দাবনে উদিত। মোহন-

মূরলীরবে সকলকে ডাকিতেছেন। সে প্রেমের ডাকে নর-নারী প্রমোদিত, পশু-পাখী পুলকিত, তরুলতা মুকুলিত, যমুনা উচ্ছ্বসিত। সে বেণুরবে—

ক্বণিত-বেণুরববঞ্চিতচিত্তাঃ কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ।
গুণগণার্ণমনুগত্য হরিণ্যো গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ॥—ভাঃ ১০।৩৫।১৯

—বাদিত বেণুরবে মুগ্ধচিত্ত হইয়া কৃষ্ণসারগেহেণী হরিণীগণ গুণসাগর শ্রীকৃষ্ণের নিকট ছুটিয়া আইসে এবং তাঁহার নিকটই অবস্থিতি করে, অন্যত্র যায় না, বেণুরব-মুগ্ধা গোপিকাগণ যেমন গৃহের মায়া ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া আইসে এবং তাঁহার নিকটই অবস্থিতি করে।

সে সঙ্গীত শুনিয়া—

সরসি সারসহংসবিহঙ্গা শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা হন্ত মীলিতদৃশোধৃতমৌনাঃ॥—ভাঃ ১০।৩৫।১১

—সরোবরস্থ সারস, হংস ও অন্যান্য বিহঙ্গগণ সেই মনোহর সঙ্গীতে হৃষ্টচিত্ত হইয়া আগমনপূর্ব্বক সংযতভাবে নিমীলিতনয়নে নীরবে হরির নিকট বসিয়া থাকে। (বা হরির উপাসনা করে, 'উপাসত' দ্ব্যর্থক)।

আর ব্রজের তরুলতা? তাহারাও বিশ্বাত্মার প্রকাশে পুলকিতাঙ্গ—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥—ভাঃ ১০।৩৫।৯

—তিনি যখন বেণুবাদন করেন তখন ফলপুষ্পভারে প্রণতশাখা তরুলতা তাহাদের মধ্যে শ্রীবিষ্ণু প্রকাশ পাইতেছেন ইহা জ্ঞাপন করিয়াই যেন প্রেমে পুলকিতাঙ্গ হইয়া পুষ্প-ফল হইতে মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে।

[শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন,—'এতানি বিষ্ণুব্যক্তিলক্ষণানি'—এ সকল শ্রীবিষ্ণুর প্রকাশের লক্ষণ।]

শ্রীবিষ্ণু তো সর্ব্বত্রই আছেন, তাই তিনি বিষ্ণু। কিন্তু তাঁহার প্রকাশ তো প্রাকৃত জনে দেখিতে পায় না। বেদান্ত বলেন—'আনন্দরূপম্ অমৃতং যং বিভাতি' (৩২ পৃঃ দ্রঃ), আর শ্রীভাগবতকার সেই রসঘন আনন্দস্বরূপের ব্রজভূমে প্রত্যক্ষ প্রকাশ বর্ণনা করিতেছেন। তাই তিনি বলেন—আজ এ ধরণী ধন্য, ব্রজের নরনারী ধন্য, তরুলতা ধন্য, তৃণগুল্ম ধন্য, বনবাসী পশুপাখী ধন্য! আনন্দময়ের প্রকাশে, তাঁহার সাহচর্য্যে, সকলেই আনন্দিত, পুলকিত, কৃতার্থ—

ব্রজে আনন্দস্বরূপের প্রত্যক্ষ প্রকাশ

'ধন্যেয়ম্ অদ্য ধরণী, তৃণবীরুধস্ত্বৎ—
পাদস্পৃশো, দ্রুমলতা করজাভিমৃষ্টাঃ।

নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈঃ
গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥—ভাঃ ১০।১৫।৮
নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন ॥
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ' ॥—ভাঃ ১০।১৫।৭

—'আজ এ ধরণী ধন্য ! তোমার পাদস্পর্শে তৃণগুল্ম ধন্য ! তোমার নখস্পর্শে তরুলতা ধন্য। তোমার সদয় দৃষ্টি লাভ করিয়া নদীগিরি, পশুপক্ষী ধন্য ! আর লক্ষ্মীর বাঞ্ছিত তোমার ভুজবন্ধন লাভ করিয়া গোপিকাগণ ধন্য !

তোমাকে গৃহে সমাগত দেখিয়া ময়ূরগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে, হরিণীগণ গোপিকাদিগের ন্যায় প্রীতিনেত্রে তোমার দিকে চাহিয়া আছে, কোকিলকুল সূক্ত গান করিয়া তোমার অভ্যর্থনা করিতেছে। এই বনবাসিগণ ধন্য ! সতের ইহাই স্বভাব।'

অখিলাত্মা তো সকলেরই আত্মা। কিন্তু ব্রজে তাঁহার মূর্ত্তরূপে আবির্ভাবে ব্রজবাসিগণ সত্যই অনুভব করিতেন যে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের প্রাণ, মন, আত্মা—এই কথাটি সর্ব্বত্রই ভাগবতকার প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কালিয়-দমনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কদম্ব বৃক্ষ হইতে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক হ্রদে পতিত হইলেন। ক্রুদ্ধ সর্প টা আসিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থানে দংশন করিল এবং দেহদ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিল ('সংদশ্য মর্ম্মসু রুষা ভুজয়া চছাদ')। ইহা দেখিয়া তাঁহার প্রিয়সখা গোপালগণের কি অবস্থা হইল?—'কৃষ্ণই তাহাদের আত্মা, তাঁহারা দুঃখশোক ভয়ে হতজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইল (কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মা… দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিয়ো নিপেতুঃ')। আর গাভী, বৃষ, বৎসগণ?—তাঁহারা শোক-সূচক শব্দ করিতে লাগিল এবং এমন ভাবে শ্রীকৃষ্ণে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া রহিল যে, বোধ হইল যেন তাহারা কাঁদিতেছে ('কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণা ভীতা রুদত্য ইব তস্থিরে')। ওদিকে, গোকুলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—কৃষ্ণই যাহাদিগের প্রাণ ও মন ছিলেন—তাঁহারা সকলে দুঃখশোকভয়ে কাতর হইয়া গোকুল হইতে ছুটিয়া আসিলেন ('তৎপ্রাণাস্তন্মনস্কাস্তে দুঃখশোকভয়াতুরাঃ আবালবৃদ্ধবনিতাঃ নিজগ্মু-র্গোকুলাদ্দীনাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ')।

ব্রজবাসিগণের প্রত্যক্ষ অনুভব

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে নয়ন অর্পণ করিয়া মৃতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (কৃষ্ণাননেঽর্পিতদৃশো মৃতকপ্রতীকাঃ')। শ্রীকৃষ্ণই নন্দাদির প্রাণ ছিলেন, তাঁহার শোকবিহ্বল হইয়া হ্রদে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। (কৃষ্ণপ্রাণান্ নির্বিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্য তং হ্রদম্')—১০।১৬।২২।

শ্রীকৃষ্ণই ব্রজবাসিগণের প্রাণ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের যদি কোন বিপদ ঘটে, জীবনাশঙ্কা ঘটে, তবে ব্রজবাসিগণেরও দেহে যেন প্রাণ থাকে না,—এ কথাটিই পরিস্ফুট করিবার জন্য "কৃষ্ণপ্রাণ" ইত্যাদি কথা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। আর শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরা গেলেন তখন ব্রজের কি দশা হইল ?—

'তুঁহুঁ রহলি মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল, দুকুল কলরব, কানু কানু করি ঝুর।
যশোমতী নন্দ, অন্ধসম বৈঠত, সাহসে উঠই না পার।
সখাগণ ধেনু বেণু সব বিসরল, রোই ফিরে নগর বাজার।'

'নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
বহে না চল মন্দানিল লুটিয়া ফুল-গন্ধভার ;
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ, ফুটে না বনে কুন্দনীপ,
ছুটে না কলকণ্ঠ-সুধা পাপিয়া পিক চন্দনার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

ছোঁয়না তৃণ গোধনগুলি, ছুটিয়াছে মাঠে পুচ্ছ তুলি,
করে না শ্যাম রাধিকা লয়ে শারিকা শুক দ্বন্দ্ব আর।
ময়ূর আর মেলিয়া পাখা করেনা আলো তমাল-শাখা,
কুসুম-কলি ফুটে না, অলি পিয়ে না মকরন্দ তার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

যশোদা আজি মলিনা দীনা, লুটায় ভূমে চেতনাহীনা,
রোদনে আঁখি বন্ধ হলো, তুলে না মুখ নন্দ আর।
কীচকবনে বাজে না বাঁশী নাহিক গান, নাহিক হাসি,
নরনারীর কণ্ঠে আজি দুলে না প্রেমানন্দহার।
নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

—শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর (সংক্ষিপ্ত)।

বেদান্তের ভাষায় আত্মাই সকলের প্রিয়তম—পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সমস্ত হইতে প্রিয় (৫৯ পৃঃ দ্রঃ)। তিনি ব্রজে প্রকট, সুতরাং শ্রীভাগবতের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণই ব্রজবাসিগণের প্রাণের প্রাণ, তাঁহার অদর্শনে ব্রজের সকলেই জীবন্মৃত ('মৃতকপ্রতীক')।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

আবার, বেদান্তের ভাষায় যিনি অখিলাত্মা, তিনি সুন্দর, তিনি রস, তিনি মধু, সুতরাং তিনি মূর্ত্তি গ্রহণ করিলে সেই মূর্ত্তিতে সকল সৌন্দর্য্যের, সকল রসের, সকল মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশ হইবে, তাই তিনি 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তি', 'সমস্ত সৌন্দর্য্যসারসন্নিবেশঃ'। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনায় এই কথাটি ভাগবতকার সর্ব্বত্রই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

'শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলীমধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।' তাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা কিরূপ ?—ত্রৈলোক্যে যত শোভা আছে সে সকলের একত্র সন্নিবেশ হইলে যে শোভা হয় সেইরূপ তাঁহার অঙ্গশোভা ('ত্রৈলোক্যলক্ষ্মৈকপদং বপুর্দধৎ'—ত্রৈলোক্যে যা লক্ষ্মীঃ শোভা তস্যা একমেব পদং স্থানং তদ্ বপুর্দধৎ দর্শয়ন্—শ্রীধর, ভাঃ ১০৷৩২৷১৪)।

তাঁহার সকলই সুন্দর, সকলই মধুর—

অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরং
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ —বল্লভাচার্য্য

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ মধুরং মধুরং বদনং মধুরং
মধুগন্ধি মধুস্মিতম্ এতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং। —কর্ণামৃত

নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে প্রায়ই শুনা যাইত।—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারম্ অসমোর্দ্ধম্ অনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপম্
একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য। —ভাঃ ১০৷৪৪৷১৪

—গোপীগণ কত না তপস্যা করিয়াছিল ! ঈশ্বরের এই নিত্য-নবীন রূপ তাহারা প্রতিদিন নয়নদ্বারা পান করে। এই রূপ-লাবণ্যের সার, অসমোর্দ্ধ—অসম, অনূর্দ্ধ—ইহার সম কিছু নাই, ইহার অধিক কিছু নাই, ইহা অনন্যসিদ্ধ, আভরণাদি কৃত্রিম উপায়-সম্ভূত নহে, ইহা স্বাভাবিক !

সখি হে কোন্ তপ কৈল গোপীগণ।
কৃষ্ণরূপ মাধুরী, পিয়া পিয়া নেত্র ভরি,
শ্লাঘা করে নেত্র তনু মন।
যে মাধুরী ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
সেই তো মাধুর্য্য সার অন্য সিদ্ধি নাহি তার
তিঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি। —চরিতামৃত

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্যচ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্। ভাঃ ৩।২।১২
[যন্মর্ত্ত্যলীলাসু ঔপয়িকং যোগ্যং—শ্রীধর]।

—শ্রীভগবান্ যোগমায়া বলে এই মর্ত্ত্য লীলা করেন। তিনি সর্ব্বোত্তম নর-লীলার উপযোগী এই অপরূপ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্বীয় যোগমায়ারই আশ্চর্য্য শক্তি প্রদর্শন করেন। ইহা সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা ; এই মূর্ত্তির অঙ্গসকল এমন সুন্দর যে উহারা ভূষণসকলকেও ভূষিত করে। স্বয়ং ভগবান্‌ও স্বীয় অপরূপ রূপ দেখিয়া বিস্মিত হন ('বিস্মাপনং স্বস্যচ')।

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নর-লীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নর-লীলা হয় অনুরূপ।
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ,
ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ। ১

যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ রতন ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে। ২

রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হৈল চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম
এই রূপ তাঁর নিত্য ধাম।

—চরিতামৃতে রক্ষিত শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি।

যোগমায়া চিচ্ছক্তি শুদ্ধসত্ত্ব পরিণতি—গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির পারিভাষিক নাম চিচ্ছক্তি। আমরা দেখিয়াছি, ভগবৎস্বরূপের ত্রিবিধ বিভাব—সৎ, চিৎ, আনন্দ, এবং এই ত্রিবিধ বিভাবের তিনটি শক্তি—সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী। হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিদাত্মিকা এই চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির যে বৃত্তিবিশেষদ্বারা শ্রীভগবান্ স্বরূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত হন তাহাকে বলে শুদ্ধসত্ত্ব। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়া হইতে ইহা বিভিন্ন বলিয়া ইহাকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা হয়। সুতরাং শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিন্ময়, উহা প্রাকৃত মূর্ত্তি নহে। চিচ্ছক্তির এক বৃত্তিবিশেষের নাম যোগমায়া, ইনি প্রকটলীলার সহায়কারিণী, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। শ্রীকৃষ্ণের অলোকসামান্য রূপে এই যোগমায়ারই অপূর্ব্ব শক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাই বলা হইল, 'যোগমায়া চিচ্ছক্তি, শুদ্ধসত্ত্ব পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে' ইত্যাদি।

এই যোগমায়া এবং মায়া বা জীবমায়া এক কথা নহে। মায়া বহিরঙ্গা শক্তি, যোগমায়া অন্তরঙ্গা শক্তি, ইহাই বৈষ্ণব দর্শনের মত।

এপর্য্যন্ত বেদান্ত-তত্ত্ব ও শ্রীভাগবতের ব্রজলীলা সম্বন্ধে যে আলোচনা হইল তাহাতে বুঝা গেল, তত্ত্ব-বিষয়ে বেদান্তে যিনি অখিলাত্মা, যিনি আনন্দ, রস, মধু, যিনি প্রিয় প্রিয়তম (৫৮-৫৯ পৃঃ), লীলায় বৃন্দাবনে তিনিই প্রকট এবং শ্রীভাগবতের এই ব্রজ-লীলার আখ্যানে সেই রসস্বরূপেরই ব্যাখ্যান। সেই মধুব্রহ্মই, ব্রজে 'মাধুর্য্য মূর্ত্তিমন্ত'।

মুনিগণের সাধনা ও গোপীজনের সাধনা

এক্ষণে আমরা সাধন-তত্ত্বের দিক্ হইতে বিষয়টি আলোচনা করিব ; বেদান্তের সাধন-তত্ত্ব কি এবং শ্রীভাগবতের আখ্যানে উহা কিভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাই দেখিব। মুনিঋষিগণ জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে ব্রহ্মচিন্তা বা আত্মচিন্তা দ্বারা সেই পরমতত্ত্ব লাভ করেন, ইহা বৈদান্তিক সাধন-তত্ত্বের স্থূল কথা। শ্রীভাগবতের ব্রজলীলায় গোপীগণই আদর্শ সাধিকা, তাহাদের সাধন-তত্ত্বের মূল কথা কি? উহার সহিত যোগমার্গাদিরই বা সম্পর্ক কি?

প্রঃ। ভগবৎকৃপায় ভাগ্যবতী ব্রজদেবীগণ রসময়ের রাসলীলার নিত্য-সাথী, তাঁহারা তো যোগ-যাগ তপ-জপ কিছু করেন নাই, তাঁহাদের আবার সাধনা কি?

উঃ। তা ঠিক। তবে শুন, গোপীজন সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীভগবান কি বলেতেছেন,—তবেই বুঝিবে তাঁহাদের সাধনা কি।

গোপীর সাধনা

'দেখ উদ্ধব, অনুরাগবশতঃ আমাতে চিত্ত বদ্ধ থাকায় গোপীগণের নিকটস্থ কি দূরস্থ বস্তুর জ্ঞান ছিল না; পতিপুত্রাদি নিজ জন, এমন কি নিজ দেহজ্ঞান পর্য্যন্ত তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিল। নদীসকল যেমন নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্র-সলিলে মিশিয়া যায়, মুনিগণ যেমন সমাধিকালে পরমপুরুষে প্রবেশ করেন, তাহারাও তদ্রূপ আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল'।

'তা নাবিদন্ ময্যনুসঙ্গবদ্ধধিয়ঃ স্বমাত্মানম্ অদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥'—ভাঃ ১১।১২।১২

শ্রীভাগবতের এই শ্লোকটির সহিত উপনিষদের একটি শ্লোক পাঠ কর—

'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যং ॥'—মুঃ ৩।২।৮

মুনির সাধনা

—নদীসকল যেমন নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও সেইরূপ নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

গোপীগণে ও মুনিজনে পার্থক্য রহিল কোথায়?

শ্রীভাগবত ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, কয়েকটি গোপাঙ্গনা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাসে যাইতে একান্ত ব্যগ্র হইলেও গুরুজনের বাধায় যাইতে পারেন নাই, অন্তঃপুরেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা কি করিলেন? তাঁহারা তন্ময়চিত্তে ঈষৎ নিমীলিতলোচনে কৃষ্ণকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন ('কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মিলীতলোচনাঃ')। ১০।২৯।৯

তৎপর কি হইল?—

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥—ভাঃ ১০।২৯।১০-১১

—প্রিয়তমের দুঃসহ তীব্র বিরহতাপে তাহাদের সমস্ত পাপ দগ্ধ হইল এবং ধ্যানপ্রাপ্ত কান্তের আলিঙ্গনসুখে তাহাদের পুণ্যেরও শেষ হইল, এইরূপে পাপপুণ্যের নিবৃত্তি দ্বারা অশেষ কর্ম্মের ক্ষয় হওয়াতে তাহারা সেই পরমাত্মা

শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি-বোধে চিন্তা করিলেও সমস্ত ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সদ্য সদ্য ত্রিগুণময় দেহ পরিত্যাগ করিল।

মোক্ষ সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্ব হইতেছে এই যে, পাপ-পুণ্যের সংস্কার সম্পূর্ণ ক্ষয় না হইলে ভববন্ধন হইতে মুক্তি হয় না, উহাদের ফল ভোগার্থে পুনরায় জন্ম হয়। এই হেতুই বলা হইয়াছে, ধ্যানযোগে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে তাহাদের পাপ-পুণ্য উভয়ই ক্ষয় হইয়া গেল, তাহারা সদ্য সদ্য মুক্তিলাভ করিল।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও ঠিক এইরূপ কথাই আছে—

'তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা॥
চিন্তয়ন্তী জগৎস্মৃতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা'॥

—গৃহে অবরুদ্ধা গোপকন্যা একমনে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন। তচ্চিন্তাজনিত বিপুলাহ্লাদে তাহার পুণ্যপুঞ্জ অবসিত হইল, এবং তাঁহার বিরহ-জনিত মহাদুঃখে তাহার পাপপুঞ্জও ভস্মীভূত হইল। পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে নিস্তরঙ্গচিত্তে তিনি সদ্য মুক্তিলাভ করিলেন।

দেখা গেল, মুনিগণ যেভাবে তদ্গতচিত্তে পরমাত্ম-চিন্তা করিতে করিতে পরম পদ লাভ করেন, গোপীগণও সেইরূপ তদ্গতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে পরমপদ লাভ করিলেন। পার্থক্য কোথায়? পুরাণশাস্ত্র যে বলেন গোপীগণ পূর্ব্বজন্মের মুনিঋষি বা মূর্ত্তিমতী শ্রুতি ('বেদা যথা মূর্ত্তিধরা স্ত্রিপৃষ্ঠে), সে কথা একেবারে অর্থহীন নয়; আর শ্রীভাগবত যে লীলাবর্ণনায় বেদান্তেরই অর্থ প্রকাশ করেন এ কথাও যুক্তিহীন নয়।

ভাগবতে গোপী-মাহাত্ম্য

শ্রীভাগবতে স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখে এবং মহাভাগবত উদ্ধবের মুখে গোপীদিগের সম্বন্ধে যে সকল কথা উক্ত হইয়াছে তাহাতেই বুঝা যায় গোপীগণ কী বস্তু।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, ব্রজের খেলা শেষ হইয়াছে, কিন্তু তিনি ব্রজবাসী-দিগকে বিস্মৃত হন নাই। তিনি নন্দ-যশোদা ও গোপীদিগের সংবাদ লইবার জন্য পরম ভক্ত উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইলেন। গোপীদিগের সম্বন্ধে তিনি বলিলেন—

'গোপীদিগের মন আমাতে অর্পিত, আমিই তাহাদিগের প্রাণ ; আমার জন্য তাহারা পতিপুত্রাদি ত্যাগ করিয়াছে এবং প্রিয়তম আত্মা আমাকেই মনদ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে—

'তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ ॥'—ভাঃ ১০।৪৬।৪

'সমস্ত প্রিয়বস্তু হইতে আমি তাহাদিগের প্রিয়তম, আমি দূরস্থ হওয়াতে বিরহ-জনিত উৎকণ্ঠায় তাহারা বিহ্বল হইয়া আছে। আমি আবার ফিরিয়া আসিব এইরূপ আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া তাহারা আজিও কষ্টে-সৃষ্টে প্রাণ-ধারণ করিয়া আছে, তাহারা মদাত্মিকা, এই হেতুই—তাঁহারা বাঁচিয়া আছে, তাহা না হইলে এতদিন বিরহ-তাপে দগ্ধ হইয়া যাইত।'—

'ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্তোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ ॥
ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥ —ভাঃ ১০।৪৬।৫-৬

উদ্ধব ব্রজে আসিয়া প্রথমে নন্দ-যশোদার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রেমগদ্গদ, অশ্রুকণ্ঠ নন্দরাজ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভাবাবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল ; তিনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন ('অত্যুৎকণ্ঠোঽভবৎ তূষ্ণীং প্রেম-প্রসরবিহ্বলঃ'—(১০।৪৬।২৭)। নন্দরাণী অনর্গল বাষ্পবারি মোচন করিতে লাগিলেন, স্নেহ-নিবন্ধন তাঁহার পয়োধর হইতে দুগ্ধক্ষরণ হইতে লাগিল ('স্নেহস্নুত-পয়োধরা')। উদ্ধব তাঁহাদিগকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—অহো! দেহীদিগের মধ্যে আপনারা দুইজনই শ্লাঘ্যতম, অখিলগুরু নারায়ণে আপনাদের ঈদৃশী মতি। ('যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ')।

তৎপর তিনি গোপীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গোপিকাগণের বাক্য, শরীর ও মন শ্রীকৃষ্ণেই অর্পিত ছিল ('ইতি গোপ্যোহি গোবিন্দে গতবাক্‌কায়মানসাঃ)। শ্রীকৃষ্ণ-দূত উদ্ধবকে দেখিয়া তাঁহাদের ভাবাবেগ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, উহা লজ্জার বাধ মানিল না, লোক-ব্যবহার মানিল না। তাঁহারা ভাব-বিহ্বল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব লীলাকথা গান করিতে লাগিলেন এবং রোদন করিতে লাগিলেন ('কৃষ্ণদূতে সমায়াতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকাঃ। গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্ম্মাণি রুদত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ ॥')। ১০।৪৭।৯-১০

উদ্ধব তাহাদিগের প্রেম-বিহ্বলতা দেখিয়া নিজেও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—ওহো! আপনারা লোক-পূজনীয়; উত্তমশ্লোক ভগবানে আপনাদের যে অনুত্তমা ভক্তি তাহা মুনিগণেরও দুর্ল্লভ ('মুনি-নামপি দুর্ল্লভা')। আপনারা পতি-পুত্র-দেহ-গেহ সমস্তই ত্যাগ করিয়া পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিয়াছেন। মহাভাগাগণ! আপনাদের বিরহসন্তাপ আমাকে মহৎ অনুগ্রহ করিল ('বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেনুগ্রহঃ কৃতঃ'), ভগবৎপ্রেমসুখ যে কী বস্তু তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম।

তৎপর তিনি কৃষ্ণপ্রাণা গোপিকাগণের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিয়া বন্দনা-গীতি গাহিতে লাগিলেন।—

উদ্ধব-কর্ত্তৃক গোপী-বন্দনা

'ওহো! বৃন্দাবনে এই গোপবধূগণই যথার্থ দেহ ধারণ করিয়াছেন; কারণ, ইঁহারা অখিলাত্মা ভগবানে ঈদৃশ রূঢ়ভাবা। এ প্রেম সামান্য নহে, সংসারভীরু মুনিগণও ইহা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।

ওহো! বৃন্দাবনে যে সকল গুল্ম, লতা, ওষধি ইঁহাদিগের চরণরেণু-পরশে পবিত্র হইয়াছে, আমি যেন সে সকলের মধ্যে কোন একটি হই—

'আসামহো চরণরেণুজুষাম্ অহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্' —ভাঃ ১০।৪৭।৬১

আমি এই নন্দব্রজের অঙ্গনাগণের চরণরেণু বারবার বন্দনা করি। তাঁহাদের হরিকথা গানে ত্রিভুবন পবিত্র হয়—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুম্ অভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ —ভাঃ ১০।৪৭।৬৩

এইরূপে যিনি ব্রজদেবীগণের চরণরেণু বন্দনা করিলেন, তিনি সামান্য দূত নহেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের সখা এবং পরম ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ লীলা-সংবরণ করিবেন প্রভাসে যাইয়া তাঁহার মুখে এই কথা জানিতে পারিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

'নাহং তবাঙ্ঘ্রি কমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ! স্বধাম নয় মাম্ অপি॥'

—'হে নাথ, আমি তোমার শ্রীচরণ দর্শন না করিয়া ক্ষণার্দ্ধও থাকিতে পারি না; আমাকেও তোমার সঙ্গে লইয়া যাও।'

এই ভক্তোত্তমের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—তুমি যেমন আমার প্রিয়তম এমন আর কেহ নহে—ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী, এমন কি নিজের আত্মাও তেমন নহে।—

'ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।
নচ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥' —ভাঃ ১১।১৪।১৪

শ্রীভগবান্ ভক্তের গৌরব এই রূপেই বর্দ্ধিত করেন। গোপীদিগের প্রতি তাঁহার উক্তি আরও মধুর—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥—ভাঃ ১০।৩২।২২

—'প্রিয়াসকল! তোমাদের ঋণ আমি কোন কালেও শোধ দিতে পারিব না—দেবতার আয়ু পাইলেও নয়—তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, তোমাদের এই প্রীতিদ্বারাই আমি অঋণী হইলাম, প্রত্যুপকার দ্বারা হইতে পারিলাম না।'

এই তো শ্রীভাগবত-বর্ণিত ভাগ্যবতী গোপাঙ্গনা। তাঁহাদের সাধনা ও সৌভাগ্যের মূল কথা কি? —'ময্যর্পিতাত্মা ইচ্ছতি মদ্বিনাঽন্যৎ—'তাহাদের আত্মা আমাতেই অর্পিত, আমা ভিন্ন আর কিছুই চাহে না'।

রাসলীলা-রহস্য

প্রঃ। একটি বিষয়ে সংশয় রহিয়া গেল, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কোন কোন গোপিকা রাসে যাইতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা করিতে করিতে ত্রিগুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া সদ্য সদ্য মুক্তিলাভ করিলেন। এ কথারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, উপপতি ভাবে চিন্তা করিয়াও তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাদের ভব-বন্ধন মোচন হইল। প্রিয়তমা যদি প্রিয় পতির চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, তাহা সাংসারিক প্রেমের উচ্চাদর্শ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার ভব-বন্ধন মোচন হয়, না বন্ধন আরো দৃঢ় হয়?—শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম বটেন, কিন্তু তাঁহারা তো পরব্রহ্মভাবে চিন্তা করেন নাই, কান্তভাবে চিন্তা করিয়াছেন।

উঃ। এ সংশয় স্বাভাবিক। এই হেতুই শ্রীভাগবতের রাস-লীলাটি এত রহস্যময়। উহার স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক তর্ক-বিতর্ক আলাপ-আলোচনা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। উহার নিন্দাস্তুতি উভয়ই পূর্ণমাত্রায় হইয়াছে। ইহা একান্ত রহস্যপূর্ণ বলিয়াই শ্রীভাগবত দুইবার রাজা পরীক্ষিতের মুখে এই প্রশ্ন

উত্থাপন করিয়া শ্রীশুকদেবমুখে তাহার উত্তর দিয়াছেন। প্রথমে তাহাই আলোচনা করা যাউক।

অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা করিতে করিতে ত্রিগুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন—

'কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্॥'—ভাঃ ১০।২৯।১২

—'গোপিকারা কৃষ্ণকে পরম কান্ত বলিয়াই জানিত, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া তাহাদের জ্ঞান ছিল না। তাহাদের বুদ্ধি তো গুণেই আসক্ত ছিল, যাহা বন্ধনের কারণ, সুতরাং তাহাদের সংসার-ক্ষয় বা মোক্ষ কিরূপে হইবে?'

উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন—এ বিষয় শিশুপাল-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেও বলিয়াছি। শিশুপাল শত্রুভাবে চিন্তা করিয়াও যখন সিদ্ধিলাভ করিল তখন যাহারা তাঁহার প্রিয় তাহাদের কথা আর কি বলিব।

শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন শিশুপালকে নিহত করিলেন তখন তাহার দেহ হইতে উল্কার ন্যায় জ্যোতিঃ (আত্মা) বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণদেহে মিশিয়া গেল ('চৈদ্যদেহোত্থিতং জ্যোতির্বাসুদেবম্ উপাবিশৎ'—ভাঃ ১০।৭৪।৪৫)। ইহার কারণ কি? সেস্থলে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

'জন্মত্রয়ানুগুণিত-বৈরসংরব্ধয়া ধিয়া।
ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবো হি ভবকারণম্॥'—ভাঃ ১০।৭৪।৪৬

—তিন জন্ম ব্যাপিয়া বৈরভাবে চিন্তা করাতে তাহার চিত্ত অনুক্ষণ তাঁহাতেই নিবদ্ধ ছিল, এই হেতু অন্তিমে, সে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইল, কারণ সতত অনুধ্যানই ধ্যেয়বস্তুর স্বরূপতা প্রাপ্তির কারণ (ভাবোহি ভবকারণম্)।

পূর্ব্বে নারদ-যুধিষ্ঠির সংবাদে একথাটি উল্লিখিত হইয়াছে এবং বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এস্থলে রাজার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব সেই নারদ-যুধিষ্ঠির সংবাদই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।—

শিশুপাল নিহত হইলে যখন তাহার দেহ হইতে উল্কার ন্যায় জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে ('পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাম্') শ্রীকৃষ্ণদেহে প্রবেশ করিল, তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে বলিলেন—'অহো! ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। এই পাপাত্মা শিশুপাল অর্দ্ধস্ফুট বাক্য উচ্চারণ শিক্ষা অবধি এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণনিন্দা করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বেষ করিয়াছে ('আরভ্য কলভাষণাৎ সম্প্রত্যমর্ষী গোবিন্দে'),

তাহার আত্মা শ্রীকৃষ্ণ-সাযুজ্য লাভ করিল, যাহা একান্ত ভক্তগণের পক্ষেও দুর্ঘট। মুনিবর, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ কি তাহা আপনি আমাদিগকে বলুন।'

দেবর্ষি নারদ বলিলেন—'দেহাভিমানী জীবের 'আমি' 'আমার' এই অভিমান বশতঃ বৈষম্য-বোধ উৎপন্ন হয়। বৈষম্য-বোধ হইতেই পরস্পর নিন্দা-স্তুতি, সৎকার, তিরস্কার, হিংসাদ্বেষ, তাড়ন-পীড়ন ইত্যাদি জীবের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় অখিলাত্মা, তাঁহাতে বৈষম্য-বোধ নাই, সুতরাং নিন্দাস্তুতি, হিংসাদ্বেষ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তিনি হিতার্থ অপরের দণ্ড করেন বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে বৈর-ভাব নাই, বিদ্বেষ-ভাব নাই। ঘোরতর বৈর-ভাবেও যদি কেহ অনুক্ষণ এই মায়া-মানুষ সাক্ষাৎ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে তবে সেই চিন্তাদ্বারাই নিষ্পাপ হইয়া সে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ, ভয়, ভক্তি, স্নেহ বা কাম—যে কোন ভাবের প্রাবল্যে যদি সতত তাহাতে চিত্ত যুক্ত থাকে তবেই তন্ময়তা লাভ হয়। তেলাপোকা ভিত্তি-বিবরে কাচপোকা কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া ভয় ও দ্বেষবশতঃ অনুক্ষণ তাহার চিন্তা করিতে করিতে কাচপোকার স্বরূপতা লাভ করে ('কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্…বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্')। কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ বা ভক্তি বশতঃ তাহাতে চিত্ত অভিনিবেশ করিয়া অনেকেই কামাদি-জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। কামবশতঃ গোপিকাগণ, ভয়বশতঃ কংস, দ্বেষবশতঃ শিশুপালাদি নৃপতিগণ, সম্বন্ধবশতঃ বৃষ্ণিবংশীয়গণ, স্নেহবশতঃ তোমরা এবং ভক্তিবশতঃ আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি। সুতরাং যে কোন উপায়েই হউক, কৃষ্ণে মন নিবেশিত করিবে।'—

'গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাৎ চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ॥'—ভাঃ ৭।১।৩০-৩১

শিশুপাল বিষ্ণুপার্ষদ ছিলেন, ব্রহ্মশাপে অসুর-যোনি প্রাপ্ত হন। তিন জন্মে (হিরণ্যকশিপু, রাবণ, শিশুপাল) তীব্র বৈরভাবে ঈশ্বর-চিন্তা করিয়া অচ্যুত-সাযুজ্য লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন ('বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্') ইত্যাদি বিবরণ পরে দেবর্ষি নারদ বর্ণনা করিয়াছেন (ভাঃ ৭।১।৩২—৪৬ দ্রঃ)।

এস্থলে গোপীগণ সম্বন্ধে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব পূর্ব্ব-বর্ণিত শিশুপাল-বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া পরে সংক্ষেপে ঐ তত্ত্বটিই পুনরায় বলিলেন,—

'নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপঃ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহং ঐক্যং সৌহৃদমেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥'—ভাঃ ১০।২৯।১৪-১৫
[ঐক্যং সম্বন্ধং, সৌহৃদম ভক্তিম্—শ্রীধর]

—'ভগবান্ অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ, ও গুণের নিয়ন্তা; নরগণের মঙ্গল-সাধনার্থই তাঁহার এই অবতার-রূপে প্রকাশ। কামই হউক, ক্রোধই হউক, ভয়ই হউক, স্নেহই হউক, ভক্তিই হউক বা কোন না কোন সম্বন্ধই হউক, ইহার কোন একটি মাত্র দ্বারা যাহার চিত্ত সতত হরিতে নিবিষ্ট থাকে, তিনি তন্ময়তা প্রাপ্ত হন।'

এই দুইটি শ্লোক পরস্পর হেতু-অনুমান যুক্ত একটি বাক্য। বাক্যটির তাৎপর্য্য এই—ভগবান্ তত্ত্বতঃ অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ, কিন্তু তিনি গুণের নিয়ন্তা, বস্তুতঃ ত্রিগুণের দ্বারাই তিনি জীব-জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি গুণের অধীন নহেন, তিনি গুণাধীশ, জীব গুণাধীন। জীব ত্রিগুণের অধীন বলিয়াই তাহাতে সত্ত্বগুণ-জাত স্নেহ, ভক্তি আদি যেমন আছে, তেমনি রজস্তমোগুণ-জাত, কাম, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদিও আছে। ত্রিগুণাধীন দেহাভিমানী জীবের পক্ষে সেই নির্গুণ তত্ত্ব চিন্তা করা দুঃসাধ্য, এই জন্য তিনি জীবের মঙ্গলার্থই মায়া-শরীর ধারণ করিয়া লীলা করেন, যাহাতে জীব তাহার সহিত যে কোন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া তাহাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে পারে। তাহাতে চিত্ত সতত নিবিষ্ট থাকিলেই তন্ময়তা জন্মে, সেই চিত্ত-নিবিষ্টতা কাম-জনিতই হউক, বা দ্বেষ-জনিতই হউক বা প্রেম-জনিতই হউক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না।

চিত্ত-নিবিষ্টতাই তন্ময়তার মূল

এই তত্ত্বটি নানাস্থানে নানা আখ্যানে শ্রীভাগবত পরিস্ফুট করিয়াছেন। কংসবধ ব্যাপারেও ঠিক এই কথা। কংস যেদিন শুনিল—'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'—সেইদিন হইতেই সে মহা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার অন্য চিন্তা ছিল না, পান-ভোজনে, বিচরণে, নিদ্রা-জাগরণে সততই সে তাহার ভাবী নিপাতকারী চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকেই সম্মুখে দেখিত। ফলে, তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া সে কৃষ্ণ-স্বারূপ্যই প্রাপ্ত হইল।—

স নিত্যদোদ্বিগ্নধিয়া তমীশ্বরং পিবন্নদন্ বা বিচরন্ স্বপন্ শ্বসন্।
দদর্শ চক্রায়ুধমগ্রতো যতস্তদেব রূপং দুরবাপমাপ॥—ভাঃ ১০।৪৪।৩৯

প্রঃ। ধ্যান-ধারণা বা ভাব-ভক্তির দ্বারা ঈশ্বর পাওয়া যায় ইহা সকল শাস্ত্রেই বলেন, কিন্তু কামক্রোধদ্বারাও ঈশ্বর মিলে শ্রীভাগবতের একথা বুঝা কঠিন।

উঃ। শ্রীভাগবত কোথাও বলেন নাই যে কাম ক্রোধ দ্বারা ঈশ্বর মিলে। শ্রীভাগবত বলিতেছেন—সতত অনুস্মরণ দ্বারা তাদাত্ম্য লাভ হয়, ইহা সকল সাধনারই মূল কথা। নানাভাবে এই কথাই সকল শাস্ত্র, সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণই বলেন।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন—'লোকে বলে, পতিপ্রাণা স্ত্রী বিদেশগত পতির ধ্যান করিতেছে। এখানে এক প্রকার অবিচ্ছিন্না সোৎকণ্ঠা স্মৃতিই লক্ষ্য করা হইতেছে।' তাঁহার মতে ইহাই ভক্তি। ('তথা ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি যা নিরন্তর-স্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠা সৈবমভিধীয়তে'—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১ 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' সূত্রের ব্যাখ্যা)।

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য বলেন—এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে প্রবাহিত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ধ্যেয় বস্তুর নিরন্তর স্মরণের নাম ধ্যান। এইরূপ ভগবৎ-স্মৃতির দ্বারা সকল বন্ধন নাশ হয়। শাস্ত্রে এইরূপ নিরন্তর স্মরণকেই মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে। এইরূপ স্মৃতি প্রগাঢ় হইলেই দর্শনের তুল্য হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রগাঢ় স্মৃতিকেই ভক্তি বলা হয়। (ধ্যানং চ তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নস্মৃতিসংতানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃত্যুপলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ ইতি'। ভবতি চ স্মৃতিঃ ভাবনাপ্রকর্ষাৎ দর্শনরূপতা। এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেন অভিধীয়তে'—ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য, ১।১।১)

নিরন্তর অনুস্মরণই ভক্তি

ভক্তিশাস্ত্র বলেন—'সতত বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে এই বিধি, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না, এই নিষেধ। শাস্ত্রে আর যত বিধি-নিষেধ আছে—তৎসমস্তই এই বিধি-নিষেধের কিঙ্কর অর্থাৎ অনুগত।'—

> 'সততং স্মর্ত্তব্যো বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
> সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥'

—ভঃ রঃ সিং, নাঃ-পঞ্চরাত্র

শ্রীগীতা বলেন—'সতত আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধও কর, আমাকে মন বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিশ্চিতই আমাকে পাইবে। যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, যাহার চিত্ত নিরন্তর আমাতে যুক্ত থাকে তাহার পক্ষে আমি সুলভ।—

'তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যাসংশয়ম্ ॥—গীঃ ৮।৭
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥—গীঃ ৮।১৪

সকল শাস্ত্রেরই ঐ কথা,—চাই নিরন্তর অনুস্মরণ, চিত্তটি সতত তাহাতে যুক্ত রাখা চাই। গোপীজন-প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতের কথার বিশেষত্ব এই যে, সেই নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ, সেই অনন্যচিত্ততা যদি প্রেমবশতঃ না হইয়া কামবশতঃও হয় তথাপি ফল একই হইবে; কেননা শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, তাহার স্মরণেই কামদোষ নষ্ট হয়। তাই শ্রীভাগবত বলিতেছেন, কামাদিহেতু নিয়ত তাঁহার স্মরণ করিয়াও সেই স্মরণদ্বারাই পূতপাপ হইয়া অনেকেই সদ্গতি লাভ করিয়াছে ('আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ'—৭।২৯)। তাই শ্রীভাগবত শ্রীকৃষ্ণ-মুখে বলিতেছেন—

'ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জিতা ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে ॥'—ভাঃ ১০।২২।২৬

—'(সাধ্বীগণ, তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে), আমাতে যাহাদের চিত্ত নিবিষ্ট, তাহাদের কাম আর কাম থাকে না। ধান্য ভর্জ্জিত ও সিদ্ধ হইলে তাহাতে অঙ্কুর উদ্গত হয় না।'

বস্তুতঃ যুক্তচিত্ততাই সকল সাধনার মূল। যোগিগণ ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ইষ্ট বস্তুতে যুক্তচিত্ত হইয়া সেই পরমপদ লাভ করেন। গোপীগণও সংসারে থাকিয়াও সকল কর্ম্মে সকল সময়ে সকল অবস্থায়ই শ্রীকৃষ্ণে যুক্তচিত্ত থাকিতেন। এই কথাটি শ্রীভাগবত নানাভাবে সর্ব্বত্রই বর্ণনা করিয়াছেন।—

গোপী-চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে নিত্যযুক্ত

'গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্ ॥'—ভাঃ ১০।৩৫।১

—'দিবাভাগে শ্রীকৃষ্ণ বনে গমন করিলে গোপীদিগের চিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলা গান করিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিত।'

তাহাদের পতিপুত্র পরিজনাদিও তো ছিল। সংসারের কাজকর্ম্মও তো করিতেন?

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনর্ভরুদিতোক্ষণ-মার্জ্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ। —ভাঃ ১০।৪৪।১৫

[প্রেঙ্খেঙ্খনম্—দোলান্দলনম্; উক্ষণম্—সেচনম্ —শ্রীধর]

—তাহারা দোহন, কুটন, মথন, শিশুর দোলায় দোলান ও রোদন-বারণ, সেচন, মার্জ্জনাদি সকল গৃহকার্য্যের মধ্যেই অনুরক্তচিত্তে অশ্রুকণ্ঠী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম গান করিতেন। ব্রজরমণীগণ ধন্যা, তাহাদের চিত্ত সতত শ্রীকৃষ্ণেই নিভ্যযুক্ত ছিল, তাহারা 'উরুক্রমচিত্তযানা'।

প্রঃ। এ সকল তো নির্ম্মল প্রেমেরই লক্ষণ, তবে গোপীগণ কামহেতু তাঁহাকে পাইয়াছেন ('গোপ্যঃ কামাৎ'), এ কথাই বা কেন ?

উঃ। ইহাতে রাসের কথা আইসে। গোপীগণ কান্তভাবে তাঁহাকে ভজনা করিয়াছেন এবং সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই হেতুই রাসলীলায় আদিরসাশ্রয়া বর্ণনা আসিয়াছে। শ্রীভাগবত, লীলা-বর্ণনায় সর্ব্বত্রই ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ অখিলাত্মা; তিনি প্রেমময়, কারুণ্যের আধার; লীলাতে তিনি প্রকট হইলে, যে তাঁহার প্রতি যে ভাব লইয়া আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাকে তিনি সেই ভাবেই তুষ্ট করিয়াছেন। শ্রীগীতা শ্রীভগবানের মুখে এই উদার ভক্তি-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন—'যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি' ('যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং'—গীঃ ৪।১১)। শ্রীভাগবত ব্রজলীলাতে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট করিয়াছেন। প্রেমময় মূর্ত্ত হইয়া প্রকট, যে তাঁহাকে চাহিয়াছে, সে-ই তাঁহাকে পাইয়াছে। রাসে প্রেমময়ী গোপিকাগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন, আবার সৈরিন্ধ্রী কুব্জাকেও কৃতার্থ করিয়াছেন। এমন কি পশু-পাখী তরুলতাও তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া, তাঁহার পাদস্পর্শ পাইয়া মুক্ত হইয়াছে। এখানে লৌকিক নীতি-বিচার নাই, যোগ-যাগ, ব্রতনিয়ম, জপতপের কোন কথা নাই, কেবল চাই সেই প্রেমময়ের পদাশ্রয়।

শ্রীভাগবত স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখে এই তত্ত্বই বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—'গোপীগণ, গোগণ, নগগণ কেবল প্রীতিদ্বারাই কৃতার্থ হইয়া স্বচ্ছন্দে আমাকে লাভ করিয়াছে। যত্ন থাকিলেও যোগ, জ্ঞান, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন বা সন্ন্যাসদ্বারা আমাকে পাইতে পারে না। বৃন্দাবনে গোপীগণ রাত্রি সকল আমার সহিত ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় অতিবাহন করিয়াছিল। অহো! আবার

আমার বিরহে সেই সেই রাত্রি সকল তাহাদের নিকট কল্পসমা হইয়াছিল। ('হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ')। যেমন মুনিগণ সমাধি সময়ে নাম ও রূপ অবগত থাকেন না সেইরূপ আসক্তি নিবন্ধন আমাতে চিত্ত বদ্ধ থাকাতে গোপীগণ নিজ দেহজ্ঞানও বিস্মৃত হইয়াছিল (ভাঃ ১১।১২।৮-১২)। তাহারা আমাকে চাহিয়াছিল, আমার স্বরূপ জানিত না, তথাপি শত সহস্র অবলা উপপতি বুদ্ধিতে আমার সঙ্গ লাভ করিয়াও পরমাত্মারূপে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব হে উদ্ধব, শ্রুতি-স্মৃতি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, শ্রোতব্য ও শ্রুত, সর্ব্ব বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদেহীর আত্মস্বরূপ একমাত্র আমারই শরণ লইয়া আমার দ্বারাই অকুতোভয় হও।'—

সর্ব্বধর্ম্মত্যাগ—
ভগবৎ-শরণাগতি

'মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ॥
তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥' —ভাঃ ১১।১২।১৩-১৪

ইহা ঠিক সেই 'সর্ব্বগুহ্যতম' কথা যাহা শ্রীগীতার সর্ব্বশেষে তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন (গীঃ ১৮।৬৪-৬৬)—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও।

প্রঃ। তাহা হইলে মোট কথা হইল এই যে, গোপীগণ সর্ব্ব বিষয় ত্যাগ করিয়া তাঁহার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছিলেন ('সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্' —ভাঃ ১০।২৯।৩১), নিরন্তর তদ্গতচিত্ত ছিলেন ('উরুক্রমচিত্তযানা'), ইহা পরম প্রেমেরই লক্ষণ। সেই প্রেম কান্তাপ্রেম, সুতরাং কান্ত-কান্তার মধ্যে যে দৈহিক সম্পর্ক এবং তজ্জনিত রসোপভোগ তাহাও তাহাতে ছিল, এই হেতু রাস-লীলার বর্ণনায় উহা আসিয়াছে। কিন্তু তাহাতে অর্পিত যে কাম তাহা কামরূপে কল্পিত হয় না, উহা প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-প্রেমই। পরকীয়া ভাবে উহার প্রগাঢ়তা বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কেননা সে স্থলে ধর্ম্মভয়, লোকলজ্জাভয়, স্বজনের তাড়না-ভর্ৎসনাদি অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এ রাস-লীলার সমর্থন কিরূপে করা যায়? তিনি ধর্ম্মরক্ষক লোক-শিক্ষক, তাঁহার পক্ষে লোকদৃষ্টিতে এরূপ আচরণ শোভা পায় কি? ইহাতে লোকে কি বুঝিবে, কি শিখিবে?

উঃ। এ প্রশ্নও শ্রীভাগবত উত্থাপন করিয়াছেন এবং তাহার উত্তরও দিয়াছেন। রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন—

'সংস্থাপনার্থায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্॥' —ভাঃ ১০।৩৩।২৬-২৭

রাজার প্রশ্ন

—'ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং অধর্ম্মের প্রশমনের জন্যই ভগবান্ অবতীর্ণ হন। তিনি ধর্ম্মসেতুর বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষয়িতা হইয়াও কি প্রকারে এই পরদারাভিমর্ষণরূপ বিপরীত আচরণ করিলেন?'

উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন—

শুকদেবের উত্তর

'ঈশ্বরগণের ধর্ম্মাতিক্রম ও সাহস দেখা গিয়াছে ('ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্')। ঈশ্বরের পক্ষে লৌকিক ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দোষাবহ হয় না, দেহেন্দ্রিয়াদি-পরতন্ত্র জীব কখনও এরূপ আচরণ করিবে না, মনে মনেও নহে। রুদ্র ব্যতীত অন্য ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ বিষপান করিলে নিশ্চিতই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যিনি গোপীদিগের, তাহাদিগের স্বামীদিগের এবং যাবতীয় দেহীর অন্তরে বিরাজ করেন, যিনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী, তিনি ক্রীড়াচ্ছলেই দেহধারণ করেন ('ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্')। তিনি জীবের মঙ্গলার্থই মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ঐ সমস্ত ক্রীড়া করেন যাহাতে জীব তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই, কেননা তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা মনে করিতেন যে, তাঁহাদের স্ব স্ব বনিতা তাঁহাদের পার্শ্বেই আছেন ('নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্ব-পার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ ব্রজৌকসঃ॥'—ভাঃ ১০।৩৩।৩৭)।

ঈশ্বরের লীলা নীতি-বিচারের অতীত

শ্রীশুকদেবের এ উত্তরে কৃষ্ণনিন্দুকেরা সন্তুষ্ট হইবেন কিনা বলা যায় না। আমরা আমাদের লৌকিক নীতিজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়া ঈশ্বরের কার্য্যাকার্য্যের বিচার করি, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পরিমাপ করি, শ্রীকৃষ্ণ কী বস্তু তাহা চিন্তা করি না, তাঁহার লীলার উদ্দেশ্য ও অর্থ কি তাহাও বুঝি না, কাজেই ভ্রমে পতিত হই। কথা এই, যিনি সকলের অন্তরেই আছেন তাঁহার সম্বন্ধে তো উপপতি ভাব প্রযোজ্য হইতে পারে না, ইহা সহজ-বোধ্য। তবে লীলা-বর্ণনায় যখন দেখা যায় যে, এস্থলে লোকদৃষ্টিতে লোকনীতি-বিরুদ্ধ একটা লৌকিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, তখন উহার কোন কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ হয়।

তাই রাসবিহার-বর্ণনা আরম্ভের পূর্ব্বেই শ্রীভাগবত বলিয়াছেন যে শ্রীভগবান্ যোগমায়া আশ্রয় করিয়া ক্রীড়া করিতে মনস্থ করিলেন ('বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ'—ভাঃ ১০।২৯।১)। এস্থলেও বলিলেন যে তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ স্বীয় স্বীয় পত্নীকে নিজের পার্শ্বেই দেখিতেন। ইহাতেও যদি নিন্দুকের মুখ বন্ধ না হয় তবে আর উপায় কি?

এ সকল বর্ণনায় বুঝা যায় যে রাসলীলা আর যাহাই হউক না কেন, উহা যোগমায়া-ঘটিত, অপ্রাকৃত, আমাদের নৈতিক বিচার-বিতর্কের অতীত। আধুনিক মনীষিগণের অনেকের মত এই যে, ভাগবতের রাস-লীলা-বর্ণনা একটি আধ্যাত্মিক রূপক (Spiritual Allegory)। শ্রীভাগবতের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যায় এই মতেরও অনেকটা সমর্থন হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন।

গোস্বামি-শাস্ত্রে গোপী-তত্ত্ব

যাহা হউক, এ তত্ত্ব বুঝিবার জন্য আমরা এক্ষণে গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণের শরণ লইব। তাঁহারা এ বিষয়ে যেরূপ নিগূঢ় তত্ত্বালোচনা করিয়াছেন এরূপ আর কেহ করেন নাই। তাঁহারা পৌরাণিক ব্রজলীলার উপর যে উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়াছেন তাহাতে উহাকে অনেকাংশে ভিন্নতর এবং বিশিষ্টতর করিয়াছে।

গোস্বামি-শাস্ত্র বলেন, গোপীপ্রেম কামগন্ধহীন।—

'কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥
... ...
গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ় ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য—হয় প্রেম ত প্রবল॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥

দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে কত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্বর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥'—চরিতামৃত, আদি, ৪র্থ।

গোস্বামিপাদগণ লীলা যে ভাবে দেখিয়াছেন, তাহাতে গোপীগণের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা না থাকিলেও মিলন বিহারাদি ব্যাপার আছে, কিন্তু সে সকল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা-প্রসূত, সুতরাং গোপীপ্রেম নির্ম্মল, কামগন্ধহীন।—

'নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাব-বর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥—চরিতামৃত, মধ্য, ৮ম।

প্রঃ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সুখ কিসে? গোপীগণের প্রেম-সেবা লাভ করিয়া না কামসেবা লাভ করিয়া? 'সঙ্গম বিহারটি কি?' এইটিই বুঝা কঠিন।

শ্রীভাগবত স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন—'ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্'। কামবশতঃই শ্রীকৃষ্ণে চিত্তার্পণ করিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন ('গোপ্যঃ কামাৎ'), এ সকল কথাও পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ গোপীজন-সম্পর্কিত লীলাবর্ণনায়, পুরাণে, সর্ব্বত্রই 'কাম', 'মদন' ইত্যাদি কথাই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তদনুবর্ত্তী আধুনিক পদাবলী সাহিত্য প্রভৃতিতেও এই সকল কথারই প্রচুর ব্যবহার। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীজনের আকর্ষণ যদি কামবশতঃই না হয় তবে এ সকল বর্ণনা এত কামায়ন-প্রচুর কেন?

উঃ। এ সম্বন্ধে গোস্বামিশাস্ত্র বলেন—গোপরামাগণের প্রেমকেই 'কাম' বলিয়া অভিহিত করার রীতি চলিয়া আসিয়াছে।—

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

—ব্রজরামাগণের প্রেমই 'কাম' এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বাস্তবিক উহা কাম নহে, যদি উহা কামই হইত, তবে উদ্ধবাদি ভগবৎপ্রিয় পরমভক্তগণ উহা প্রাপ্তির নিমিত্ত কখনও প্রার্থনা করিতেন না। (শ্রীউদ্ধবের গোপীবন্দনাদি ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রশ্ন হইতে পারে, যদি গোপীপ্রেমে কামগন্ধ না থাকে তবে উহাকে কাম বলার প্রথাটাই বা কিরূপে উদ্ভব হইল? উত্তরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

> 'সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
> কামক্রীড়া সাম্যে তারে কহে কাম নাম।'—২।৮

প্রাকৃত কামক্রীড়ার সহিত গোপীদিগের প্রেমক্রীড়ার বাহ্য সাদৃশ্য আছে। বলিয়াই ইহাকে কাম বলা হয়। এই সাদৃশ্য কিসে?

এ কথা বুঝিতে হইলে রসশাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয় এবং বৈষ্ণব পরিভাষায় ভক্তি, রতি, প্রেম, রস এ সকল কথা কিরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও জানা আবশ্যক।

বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে ভক্তি দ্বিবিধ—সাধনভক্তি বা 'বৈধী' ভক্তি এবং 'রাগানুগা' ভক্তি।

শাস্ত্রে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন আদি বিবিধ ভক্তির সাধন উল্লিখিত আছে। এই সকলই বৈধী ভক্তির অঙ্গ। ইহাতে ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ও মহিমাজ্ঞানই চিত্তে প্রধানরূপে বিদ্যমান থাকে এবং ভুক্তি মুক্তি আদি বাসনাও থাকে। এই সকল বাসনা হইতে নির্ম্মুক্ত হইলে ভক্তি বিশুদ্ধা হয়। এই শুদ্ধা ভক্তিরই পরিপক্কাবস্থা রাগানুগা ভক্তি, উহা হইতেই প্রেম জন্মে।

বৈধী ভক্তি

> 'অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ।
> অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম ॥
> আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।
> এই শুদ্ধভক্তি—ইহা হইতে প্রেম হয়।
> পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥'—চৈঃ চঃ

ইহাকে অহৈতুকী অব্যভিচারী ভক্তি বা নির্গুণা ভক্তি বলে। ('অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে'—ভাঃ ৩।২৯।১১-১২ দ্রঃ)।

এই রাগানুগা ভক্তির পারিভাষিক নাম 'রতি'। ইহাতে অনন্যমমতা অর্থাৎ একান্ত আত্মীয়বোধ থাকে—'অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা'। আমার স্নেহের গোপাল, আমার প্রাণের সখা, আমার প্রাণ-বল্লভ—এই প্রকার মমতাবোধই রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণ। ইহার প্রকৃষ্ট স্থল ব্রজলীলায়। ব্রজের ভাবে ভাবিত না হইলে এই প্রেম লাভ করা যায় না।

রাগানুগা ভক্তি

সনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাক্য—

'রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥
রাগানুগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসি-জনে।
তার অনুগত ভক্ত রাগানুগা নামে ॥
ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ—স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা এই—তটস্থ লক্ষণ ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥
লোভে ব্রজবাসি ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥'—চৈঃ চঃ মধ্য ২২

ভক্তের ভাবনা-ভেদে রতি পাঁচ প্রকার—

ভক্ত ভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর ॥
বাৎসল্যরতি, মধুররতি পঞ্চবিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান।—চৈঃ চঃ

পঞ্চ মুখ্যরস

শান্তরতির প্রধান লক্ষণ—সর্ব্ববাসনা ত্যাগ এবং শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিক নিষ্ঠা। ইহাতে সখ্য-বাৎসল্যাদিভাবের ন্যায় মমত্ববোধ নাই।

'কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত কৃষ্ণ ভক্ত এক জানি ॥'—চৈঃ চঃ

নবযোগেন্দ্র, সনকাদি মুনিঋষিগণ শান্ত ভক্ত।

আত্মীয়বোধে, প্রভুভাবে, সখাভাবে, পুত্রভাবে এবং কান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন ব্রজেই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারিভাবে চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার॥
দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥—চৈঃ চঃ

গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ রাসলীলা অবলম্বন করিয়া প্রাচীন রসশাস্ত্রের অপূর্ব্ব বিস্তার ও ব্যাখ্যান করিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। বিষয় অতি ব্যাপক, সকল শ্রেণীর পাঠকের সুখবোধ্য নয়, আলোচ্যও নয়। রসময় প্রেমময়ের রাসক্রীড়া যে কামক্রীড়া নয়, প্রেমরস আস্বাদনের লীলা—গোস্বামিপাদগণ রসশাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য সেই বিপুল রসশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কয়েকটি স্থূল কথা এস্থলে বলা প্রয়োজন।

রসশাস্ত্রে দাস্য-সখ্যাদি রতিকে স্থায়িভাব বলে। এই স্থায়ী ভাবের সহিত বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের যোগে রতি রসে পরিণত হয়, ভক্তি ভক্তিরস হয়।—

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতাম্ এতি রত্যাদিঃ স্থায়িভাবঃ সচেতসাম্॥—সাহিত্য-দর্পণ

গোস্বামিশাস্ত্র এই কথাটির আরো বিস্তার করিয়াছেন—

অথাস্যাঃ কেশবরতের্লক্ষিতায়া নিগদ্যতে।
'সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা॥
বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥'—ভঃ রঃ সিঃ

চরিতামৃতের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতাংশে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলিরই মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে—

'প্রেমাদিক স্থায়ী ভাব সামগ্রীমিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়ী ভাব রস হয় মিলি এই চারি॥
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥'

এ কথার মর্ম্ম এই—ভক্তি একটি স্থায়ী ভাব, ইহা স্বতঃই আনন্দস্বরূপা। সেই আনন্দ বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে যখন উহার সঙ্গে আরো কয়েকটি সামগ্রী যোগ হয়। সেই সামগ্রী কয়েকটি হইল—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারী ভাব বা সঞ্চারী ভাব। দধির স্বরূপতঃ একটি সুস্বাদ আছে, কিন্তু উহার সহিত যদি চিনি, কর্পূর, এলাচি প্রভৃতি যোগ করা যায় তবে তাহার স্বাদের একটি অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব জন্মে। এইরূপ, ভক্তির সহিত বিভাব, অনুভাবাদির যোগে উহার যে অপূর্ব্ব আনন্দ-চমৎকারিত্ব জন্মে উহাকেই ভক্তিরস বা প্রেমরস বলে। রসিক ভক্তগণ এইরূপে প্রেমরস আস্বাদন করেন।

ভক্তি ও ভক্তিরস

এক্ষণে বিভাবাদি চারিটি সামগ্রীর বা বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।—

বিভাব—যাহাদ্বারা বা যাহাতে রত্যাদি স্থায়ী ভাবের আস্বাদন করা যায় তাহাকে বিভাব বলে ('বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে'—ভঃ রঃ সিঃ) অর্থাৎ যাহাদ্বারা স্থায়ী ভাবের প্রকৃষ্ট উদ্বোধন হয় তাহাই বিভাব। বিভাব দ্বিবিধ—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার দ্বিবিধ—বিষয়াবলম্বন ও আশ্রয়াবলম্বন। কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে, শ্রীকৃষ্ণই বিষয়াবলম্বন এবং ভক্তগণ আশ্রয়াবলম্বন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, বেশ, বংশী, নুপূর, হাস্য প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। যেস্থলে মেঘ দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধী ভাবের উদ্দীপন হয় সে স্থলে মেঘ উদ্দীপন-বিভাব, এইরূপে ময়ূর-পুচ্ছও উদ্দীপন বিভাব হইতে পারে।

অনুভাব—যে সমস্ত বাহ্য ক্রিয়াদ্বারা চিত্তস্থ ভাবের বোধ জন্মে অর্থাৎ যাহা চিত্তস্থ ভাবের জ্ঞাপক তাহাই অনুভাব ('অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানাম্ অববোধকাঃ' —ভঃ রঃ সি)। ইহাদিগকে উদ্ভাস্বরও বলে। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী ভাবের প্রভাবে—নৃত্য, নাম-কীর্ত্তন, হুঙ্কার, হাস্য, কটাক্ষ ইত্যাদি অনুভাব।

সাত্ত্বিক ভাব—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী অনুভাবের মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট ভাবকে সাত্ত্বিক ভাব বলে। সাত্ত্বিকভাব আটটি—স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ (গদগদ বাক্য), কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় (মূর্চ্ছা)।

স্তম্ভ সেইরূপ অবস্থা যাহাতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার একেবারে স্তম্ভিত হয়, এবং তদ্দরুণ দেহ জড়তা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও মনের ক্রিয়া থাকে। হর্ষ, ভয়, বিষাদ প্রভৃতি হইতে এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়। বিষাদ, ভয়, ক্রোধাদি হইতে বৈবর্ণ্য বা বর্ণবিকার উপস্থিত হয়। নৃত্য-সঙ্গীতাদি অনুভাব ভক্ত ইচ্ছা করিলে সংবরণ করিতে পারেন, কিন্তু স্তম্ভ, রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিকভাব স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়, এই সকল বিকার ভক্ত নিবারণ করিতে পারেন না।

ব্যভিচারী ভাব—যে সকল ভাব স্থায়ী ভাবের অভিমুখে বিশেষরূপে সঞ্চরণ করে তাহাকে ব্যভিচারী ভাব বা সঞ্চারী ভাব বলে। ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটি—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, হর্ষ, ঔৎসুক্য ইত্যাদি।

রসশাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণপ্রেম পূর্ব্ব-বর্ণিত বিভাব-অনুভাবাদির সংযোগে চমৎকারিত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রেমরসে পরিণত হয়।

দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি আলম্বন॥
অনুভাব, স্মিত, নৃত্য গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর।
নির্ব্বেদ হর্ষাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী॥
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী॥—চরিতামৃত

কৃষ্ণরতির শান্ত দাস্যাদি পঞ্চবিধ বৈচিত্র্য আছে, সুতরাং যে ভক্তের যেরূপ ভাব তাহার অনুভাবাদিও তদ্রূপ হয়। শান্তরসের অনুভাব একরূপ, সখ্যরসের অন্যরূপ, আবার মধুর রসে ভিন্নরূপ। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—

শ্রীভগবানের নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা প্রেম জন্মিলে ভক্তের কিরূপ অবস্থা হয় সে সম্বন্ধে শ্রীভাগবত বলিতেছেন—

'এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥' ১১।২।৪০

এইরূপে সাধক শ্রীভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা প্রেমলাভ করিলে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়, তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন (দর্শনলাভে), রোদন করেন (বিচ্ছেদে), অনুক্ষণ তাঁহাকে ডাকেন (অদর্শনে উৎকণ্ঠাবশতঃ), পুনঃ পুনঃ তাহার নামগান করেন (হর্ষবশতঃ), অবশেষে আনন্দে অবশ হইয়া উন্মাদবৎ নৃত্য করেন। এইরূপে ইনি গভীর ভাবাবেশে লোকাতীত হন।

পুনশ্চ—
'যদাতি হর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদং প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি॥—৭।৭।৩৪
যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিৎ হসতি আক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্।
মুহুঃ শ্বসন্ ব্যক্তি হরে জগৎপতে নারায়ণ ইতি আত্মমতির্গতত্রপঃ॥—৭।৭।৩৫

—যখন অতিহর্ষে ভক্তের অঙ্গ পুলকিত হয়, অশ্রু বিগলিত হয়, বাক্য গদগদ হয়, কখনো তিনি উচ্চকণ্ঠে গান করেন, কখনো নৃত্য করেন, কখনো আনন্দধ্বনি করেন; যখন ভক্ত গ্রহগ্রস্তের ন্যায় লজ্জাশূন্য হইয়া কখনো হাস্য করেন, কখনো ক্রন্দন করেন, কখনো ধ্যানস্থ হন, কখনো সর্ব্বজীবে ভগবান্

প্রেমোন্মাদ-সাত্ত্বিকাদি ভাবের দৃষ্টান্ত

আছেন জানিয়া লোকদিগকে বন্দনা করেন, কখনো বা বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হে হরে, হে জগৎপতে, হে নারায়ণ ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করেন।

তখন—

'তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধনঃ তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্॥'—৭।৭।৩৬

—তখন তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হন, ভগবানের গুণকর্ম্মের ভাবনা দ্বারা তাঁহার দেহ ও মন শুদ্ধ ও প্রসন্ন হয়, মহাভক্তিযোগে তাহার অজ্ঞানতা ও বাসনা দগ্ধ হইয়া যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।

এই শ্লোকগুলি পূর্ব্বোক্ত বিভাব-অনুভাবাদির দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উল্লিখিত হইল। রসশাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, এ সকল স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়াবলম্বন; ভক্ত আশ্রয়াবলম্বন; শ্রীভগবানের গুণকর্ম্ম-শ্রবণাদি উদ্দীপন; নৃত্য, গান, হাস্য, হুঙ্কার, লোকলজ্জাত্যাগ ইত্যাদি অনুভাব; অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিকভাব; হর্ষ, গ্রহগ্রস্ত অবস্থা, উন্মাদ ইত্যাদি ব্যভিচারী ভাব। এ সকল শান্তরতির বা দাস্যরতির উদাহরণ।

'শ্রীভাগবতের মধুরা-রতির বা গোপীপ্রেমের বর্ণনাও অতি অপূর্ব্ব। রসশাস্ত্রের ব্যাখ্যানার্থ দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—

'শ্রীকৃষ্ণ বামাগণের চিত্ত-বিমোহনকারী মধুর গীত গান করিলেন ('জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং')। উহা শ্রবণমাত্র ব্রজকামিনীগণ সেই বংশীধ্বনির অনুসরণ করিয়া ধাবিত হইলেন। কোন কামিনী গোদোহন করিতেছিলেন, উহা ত্যাগ করিয়াই সমুৎসুকভাবে চলিয়া গেলেন ('দুহন্তোঽভিযযুঃ কাশ্চিৎ দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ'); কেহ চুল্লীতে পায়স উঠাইয়াছিলেন, উহা না নামাইয়াই প্রস্থান করিলেন ('পয়োধিশ্রিত্য সংযাবং অনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ'); কেহ খাদ্য-পরিবেষণ করিতেছিলেন, কেহ শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছিলেন, উহা ত্যাগ করিয়াই চলিয়া গেলেন ('পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ'); কেহ স্বামীর শুশ্রূষা করিতেছিলেন তাহা আর চলিলনা, কেহ ভোজনে বসিয়াছিলেন—অন্ন ত্যাগ করিয়াই চলিলেন ('শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিৎ অশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্'); কেহ কেহ অনুলেপন, কেহ কেহ অঙ্গমার্জ্জন, কেহ কেহ লোচনে অঞ্জন দিতেছিলেন, উহা সমাপন না করিয়াই ধাবিত হইলেন—এক নয়নে কজ্জল, বা এক কর্ণে কুণ্ডল শোভা পাইল ('লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে'), ব্যস্ততাপ্রযুক্ত কাহারো কাহারো বসন-ভূষণ স্থানতঃ ও স্বরূপতঃ বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইল; এই অবস্থায়ই তাঁহারা কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন ('ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তরং যযুঃ'—১০।২৯।৫-৭)।

পিতা, পতি, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ নিবারণ করিলেও তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন না, কারণ, গোবিন্দকর্ত্তৃক তাঁহাদিগের চিত্ত অপহৃত হইয়াছিল ('গোবিন্দাপহৃতাত্মনো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ')।

'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে'—সেই প্রেমময়ের প্রেমের আহ্বান কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র পতি, পুত্র, গৃহ, দেহ, গৃহকর্ম্ম, দেহধর্ম্ম সমস্ত বিস্মরণ হইয়া গেল, তাহারা সর্ব্ব বিষয় ত্যাগ করিয়া তাঁহার পাদমূলে আশ্রয় লইলেন ('সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্')।

শ্রীভাগবতের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনার অবলম্বনে পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস একটি সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা আস্বাদন করা যাউক—

মুরলি গান পঞ্চম তান কুলবতি-চিত-চোরণি।
শুনত গোপি, প্রেম রোপি মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত, যাঁহি বোলত মুরলিক কল-লোলনি।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ এক নয়নে কাজর রেহ,
বাহেঁ রঞ্জিত কঙ্কণ একু, একু কুণ্ডল দোলনি॥
শিথিলছন্দ নীবিক বন্ধ বেগে ধাওত যুবতি বৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি গলিত বেণী লোলনি॥
ততহিঁ বেলি সখিনি মেলি কেহ কাহক পথ না হেরি,
ঐছে মিলল গোকুলচন্দ গোবিন্দ দাস গায়নি॥

ইহা অভিসারের বর্ণনা। তারপর যখন মিলন হইল তাহার একটি চিত্র শ্রীভাগবত হইতে দিতেছি—

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনভূষিতম্॥—১০।৩২।৪
অপরাহনিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা॥
তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা॥
সর্ব্বাস্তা কেশবালোকপরমোৎসব নির্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ॥—১০।৩২।৭—৯

—কোন গোপী আনন্দে প্রিয়তমের করকমল করপুটে ধারণ করিলেন; কেহ তাঁহার চন্দন-চর্চ্চিত বাহু স্কন্ধদেশে ধারণ করিলেন। কোন কামিনী অনিমেষ নয়নে তাঁহার শ্রীমুখমাধুর্য্যসুধা বারংবার পান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই অবলার

কিছুতেই পিপাসা শান্তি হইল না, যেমন তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনে সাধুদিগের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। কোন কামিনী নেত্রপথে তাঁহাকে হৃদয়ে লইয়া গিয়া নেত্রদ্বয় নিমীলন করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুলকিতাঙ্গী এবং আনন্দাপ্লুতা হইয়া যোগীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যেমন মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ঈশ্বর-প্রাপ্ত হইয়া সংসারতাপ মোচন করেন, গোপিকারাও সেইরূপ কেশবদর্শনজনিত পরমানন্দ লাভ করিয়া বিরহজনিত সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন।—

এস্থলে মধুর-রসের বর্ণনা। রসশাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, এখানে রসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন বিষয়াবলম্বন, ব্রজগোপীগণ আশ্রয়াবলম্বন। বংশীধ্বনি উদ্দীপন বিভাব। করপুটে করকমলধারণ, অনিমেষ নয়নে শ্রীমুখ-দর্শন, আলিঙ্গনাদি অনুভাব এবং পুলকিতাঙ্গ সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ।

মধুরা-রতির উদ্দীপন, অনুভাবাদির দৃষ্টান্ত

এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যদিও শ্রীভাগবত আদিরসের অনুভাবাদি বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু সেই রসোপভোগে যে আনন্দ তাহার তুলনা করিতেছেন সাধু ভক্তজনের শ্রীকৃষ্ণচরণ-দর্শনজনিত আনন্দের সহিত ('সন্তস্তচ্চরণং যথা'), যোগিজনের আত্মোপলব্ধিজনিত আনন্দের সহিত, এবং মুমুক্ষুজনের ঈশ্বর-প্রাপ্তিজনিত আনন্দের সহিত ('প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ')। কেমন বর্ণনা কৌশল!—নেত্রদ্বারা দর্শন করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে লইয়া গেলেন, তারপর তাঁহার আলিঙ্গনসুখে আপ্লুত হইয়া নেত্র নিমীলন করিয়া যোগীর ন্যায় ধ্যানস্তিমিত নেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ('যোগীবানন্দসংপ্লুতা')।

এই আলিঙ্গন কি কাম-পীড়িতা কামুকার আলিঙ্গন?
পরবর্ত্তী শ্লোকটিতে আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত আরও সুস্পষ্ট।—

'তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥'—১০।৩২।১০

—'ভগবান্ অচ্যুত বিধূতশোকা গোপীগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া শক্তিসমূহদ্বারা পরিবেষ্টিত পরমাত্মার ন্যায় সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন।'

সচ্চিদানন্দের শক্তিসমূহের তত্ত্ব পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে (৪৯ পৃঃ)। ব্রজদেবীগণ মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনীশক্তি। শক্তির প্রকাশ লীলায়। ব্রজলীলায় হ্লাদিনী-শক্তিরই বিকাশ। এই লীলায় 'রমণ' অর্থ হ্লাদিনীশক্তি-সম্ভোগ।—হ্লাদিনীর সার প্রেম, সুতরাং ইহা প্রেম-লীলা।

বস্তুতঃ, রাসলীলা-বর্ণনায় আলিঙ্গন-চুম্বনাদি যে সকল ব্যাপারের উল্লেখ আছে—সে সকলই অন্তরের প্রেমেরই অভিব্যক্তি সূচনা করে,—এই হেতু রসশাস্ত্রে ইহাদিগকে

অনুভাব বলে (৮৬পৃঃ)। প্রেমভরে স্নেহাস্পদ শিশুকে চুম্বন করা হয়, প্রেমাস্পদ সখাকে আলিঙ্গন করা হয়, এ সকল স্থলে চুম্বনাদি ক্রিয়া যে প্রেমেরই স্বাভাবিক বাহ্য প্রকাশ, স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং চুম্বন-আলিঙ্গনাদি কামবশতঃও হইতে পারে, প্রেমবশতঃও হইতে পারে।

যুবকযুবতীর পরস্পরের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ ইহাকে কাম বলে। উহা সর্ব্বজীবেই আছে, কেননা উহাই সৃষ্টির মূল, সৃষ্টি রক্ষার মূল। এই হেতুই সৃষ্টিকর্ত্তা উহাকে এত সুখকর করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়সুখের মধ্যে উহা অপেক্ষা মোহকর আর কিছুই নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখ তো মানুষের সর্ব্বার্থসার নয়। আমরা পূর্ব্বে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনায় দেখিয়াছি (১৭-১৯ পৃঃ), মানবাত্মা ক্রমবিকাশে পশ্বাদি যোনি হইতে বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। পশুতে স্ত্রীপুরুষের আকর্ষণ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই পর্য্যবসিত, কিন্তু ক্রমোৎকর্ষে মনুষ্যে উহা হইতেই এক পরম হৃদ্য বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছে যাহাকে বলে দাম্পত্য প্রেম।

দাম্পত্য-কাম ও দাম্পত্য-প্রেম

পশুতে মাত্র দাম্পত্য কামই আছে, দাম্পত্য-প্রেম নাই। নিম্ন প্রকৃতিতে এখনও মানুষ অনেকাংশে পশুই, সুতরাং সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ বা নায়ক-নায়িকার যে পরস্পর আকর্ষণ এবং তজ্জনিত আলিঙ্গন-চুম্বনাদি ব্যাপার তাহা কামবশতঃও হইতে পারে, প্রেমবশতঃও হইতে পারে। কিন্তু মানবাত্মার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ অবস্থা হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, যখন ঐ আকর্ষণে কাম-সম্পর্ক বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে না, উহা বিশুদ্ধ প্রেমেই পরিণত হয়। পতির সুখের জন্য পত্নী সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারেন, এরূপ দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নহে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজদেবীগণের যে আকর্ষণ, বৈষ্ণব পরিভাষায় উহাকে 'সমর্থা রতি' বলে, উহা কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী ; উহাতে স্বসুখবাসনার লেশমাত্রও নাই, তাই বলা হইয়াছে—'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা নাহি গোপিকার' ইত্যাদি। উহা রসশাস্ত্রের ভাষায়ই প্রকাশিত হয়, এইজন্য কাম, মদন, অনঙ্গ, পঞ্চবাণ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার এবং রসশাস্ত্রানুরূপ চুম্বন-আলিঙ্গনাদি ক্রীড়া বা অনুভাবের বর্ণনাও আছে। কিন্তু এ সকল অনুভাবাদি প্রেমজনিত আনন্দেরই বাহ্য অভিব্যক্তি ; উহা প্রেমোৎসব, 'মদনোৎসব' নহে।

কামোৎসব ও প্রেমোৎসব

এই হেতু গোস্বামিশাস্ত্র বলেন—

> 'সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
> কামক্রীড়া সাম্যে ইহা বলে কাম নাম॥

মনে কামভাব থাকিলে উহা কামের অভিব্যক্তিই হইয়া পড়ে, প্রেমভাব থাকিলে উহা প্রেমের অভিব্যক্তি বলিয়াই গ্রহণ করা যায়। সুতরাং চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল না হইলে এই লীলারস আস্বাদনের অধিকার হয় না।

লীলারস বলিতে কি বুঝায়? রস কি?

রসশাস্ত্র বলেন—'চিত্তে সত্ত্বোদ্রেক হইলে যে এক অপূর্ব্ব অখণ্ড চমৎকার আনন্দ-চিন্ময়ভাব উদিত হয় ('সত্ত্বোদ্রেকাদ্ অখণ্ডস্ত স্বরূপানন্দ-চিন্ময়ঃ'), যাহাতে রজঃ ও তমোগুণের স্পর্শ নাই ('রজস্তমোভ্যাম্ অস্পৃষ্টম্') এবং যাহা ব্রহ্মানন্দের সহোদরতুল্য ('ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ'), তাহাই রস —সাহিত্য-দর্পণ।

রস কি

বলা বাহুল্য, ইহা কামরস নহে, প্রেমরস। এই রস শব্দ হইতেই রাস শব্দ আসিয়াছে। রস আস্বাদনের যে ক্রীড়া বা লীলা তাহাই রাসলীলা। তাই গোস্বামিশাস্ত্র বলেন—'প্রেমরস-পরিপাক-বিলাসবিশেষাত্মকঃ ক্রীড়া-বিশেষঃ রাসঃ'—ইহা প্রেমরসবিলাসাত্মক ক্রীড়া অর্থাৎ মূর্ত্ত রসব্রহ্ম অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমরস আস্বাদনের জন্য বৃন্দাবনে যোগমায়া অবলম্বন করিয়া শ্রীরাধা ও গোপীগণের সহিত যে চিদানন্দময়ী ক্রীড়া করিয়াছিলেন তাহাই রাসলীলা।

রাস কি

কাম-ক্রীড়ায় চুম্বন আলিঙ্গনাদি কামজনিত মিলনের ফল, রাসলীলায় বর্ণিত চুম্বন আলিঙ্গনাদি প্রেমমিলনজনিত আনন্দের বাহ্য অভিব্যক্তি। সুতরাং এই সকল বর্ণনায় কাম শব্দে প্রাকৃত কাম বুঝায় না।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখে যখন শুনা যায়,—

'এই তো পরাণ বঁধু পাইনু,
যার লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু।'

তখন 'মদন' বলিতে কি বুঝায় তাহা কি আবার ব্যাখ্যা করিতে হয়? ব্যাখ্যা তো তাঁহার লীলাতেই প্রত্যক্ষ। আর সে লীলা তো পৌরাণিক ব্যাপার নয়, ঐতিহাসিক ঘটনা, যাঁহারা তাহা চাক্ষুষ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই সে সকল কথা যথাদৃষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী ভাবসমূহের বর্ণনা করা হইয়াছে, সে সমস্তই তাঁহার লীলায় প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে এবং চরিতামৃত-আদি বৈষ্ণবশাস্ত্রে যথাযথ লিপিবদ্ধ আছে।—

চৈতন্যলীলায় ব্রজলীলারই ব্যাখ্যা

'ভক্তি প্রেমের যত দশা যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার॥
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারি জানিতে।
ভক্তিভাব অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে॥

ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত॥

প্রেমোল্লাস হৈল উঠি ইতি উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে প্রভু হাসে নাচে গায়॥
কম্প স্বেদ পুলকাঙ্গ শুভ্র বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার॥
উদ্‌দণ্ড নৃত্য প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্টসাত্ত্বিক ভাবোদয় সমকাল॥

ভাবোদয়, ভাবশান্তি, সন্ধি, শাবল্য।
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ী সবার প্রাবল্য॥
... ...

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
চটক পর্ব্বত তাঁহা দেখিল আচম্বিতে॥
গোবর্দ্ধনশৈলজ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত দিশাতে প্রভু ধাইঞা চলিলা॥
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব হৈল পথে চলিতে নাহি শক্তি॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলয়ে যেন গঙ্গা যমুনার॥
বৈবর্ণ্য শঙ্খের প্রায় হৈল শ্বেত অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
তবে তো গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা.

বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
স্বরূপগোসাঞিকে কিছু কহিতে লাগিল ॥
গোবর্দ্ধন হৈতে ইহাঁ কে মোরে আনিলা।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইলা ॥

পুনশ্চ—

শুনি স্বরূপ গোসাঞি মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাইয়া ॥
স্বরূপ গোসাঞি যবে এই পদ গাইলা।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥
অষ্টসাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষ আদি ব্যভিচারী সব উপজিল ॥
ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবশাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য ॥
... ...
এই মতে মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ॥
কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধবাহ্য স্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি তিন রীতে প্রভুর স্থিতি।

—'আপনি আচরি ধর্ম্ম লোকেরে শিখায়।' তাঁহার শিক্ষা দ্বিবিধ—

'অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস-আস্বাদন।
বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥'

তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শিক্ষা লাভ করিয়া এবং এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট-লীলার ভিত্তি অবলম্বন করিয়া গোস্বামিপাদগণ রসশাস্ত্রমুখে রাসলীলার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'এই রস-আস্বাদন নাহি অভক্তের গণে', আর কেবল ভক্ত হইলেও হইবে না, লীলা-রসিক হওয়া চাই। লীলা-রস আস্বাদনের অধিকারী কাঁহারা সে সম্বন্ধে গোস্বামিশাস্ত্র বলেন—

লীলারস আস্বাদনের অধিকারী কে

ভক্তির্নির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ ॥
জীবনীভূত-গোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্ ॥

ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠাম্ আপদ্যতে পরাম্॥

—সাধন ভক্তির দ্বারা যাঁহাদের চিত্তের মালিন্য বিদূরিত হইয়াছে, কামনা-বাসনার নিবৃত্তিদ্বারা যাঁহাদের চিত্ত সুপ্রসন্ন ও শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহাদের চিত্ত শ্রীভগবানে নিযুক্ত, যাঁহারা রসজ্ঞ ভক্তসঙ্গে রঙ্গী, শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তিসুখ-সম্পত্তিই যাঁহাদের জীবনের সার-সর্ব্বস্ব, যাঁহারা প্রেমান্তরঙ্গসাধনা অর্থাৎ রাগানুগা-ভক্তিসাধনসমূহই অনুষ্ঠান করেন, এইরূপ ভক্তজনের চিত্তে আনন্দস্বরূপ যে ভক্তি বিরাজিত আছে সেই ভক্তি বিভাব-অনুভাবাদি যোগে আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হয়, ভক্তি ভক্তিরস হয়।

বলা বাহুল্য, ভক্তজনের মধ্যেও এরূপ অধিকারী অতি বিরল, 'কোটিতে গুটি না মিলে'। ইহজন্মের এবং পূর্ব্বজন্মের সাধনজনিত শুভ-সংস্কারের সংযোগ হইলেই ইহা লাভ হইতে পারে ('সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা')।

শ্রীরাধা-তত্ত্ব

প্রঃ। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণের মতাবলম্বনে ব্রজলীলা-সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা হইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এ পর্য্যন্ত শ্রীরাধার নামটি কোথায়ও উল্লেখ করা হইল না। এ তো যেন রাম-ছাড়া রামায়ণ-কীর্ত্তন হইয়া পড়িল।

উঃ। এ ত্রুটি ইচ্ছাকৃত নহে। ইহার কারণ এই,—আমরা শ্রীভাগবত অবলম্বন করিয়া ব্রজলীলার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু ঐ গ্রন্থে শ্রীরাধার নাম নাই, কাজেই উহার উল্লেখের কোন অবকাশ হয় নাই। শ্রীভাগবতে উল্লিখিত আছে যে গোপীগণ বনপথে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের পার্শ্বে কোন রমণীর পদচিহ্ন দেখিয়া বলিয়াছিলেন —ইহা কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীহরি নিশ্চয়ই আরাধিত হইয়াছেন, যেহেতু গোবিন্দ ইঁহার প্রতি প্রীত হইয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া ইঁহাকে লইয়া নিভৃত স্থানে আসিয়াছেন'—

'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ'॥ —ভাঃ ১০।৩০।২৮

এই শ্লোকের 'আরাধিত' শব্দ হইতে গোস্বামিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন যে, ইনিই শ্রীরাধা। যিনি আরাধনা করেন, তিনিই 'রাধিকা'।

যাহা হউক, শ্রীভাগবতে শ্রীরাধার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ও পদ্মপুরাণে শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তথায় শ্রীরাধাই রাসেশ্বরী। 'এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্মের উপর অতিশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে।

জয়দেবাদি বাঙ্গালী বৈষ্ণবকবিগণ, বাংলার জাতীয় সঙ্গীত, বাংলায় যাত্রা-মহোৎসবাদির মূল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে।' কিন্তু এই পুরাণে উচ্চতর তত্ত্বকথার সঙ্গে সঙ্গে এমন কামায়ন-প্রচুর বর্ণনা-বাহুল্য প্রবেশ করিয়াছে যে তাহার মধ্য হইতে 'মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণীকে' খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। প্রকৃত রাধাঠাকুরাণীকে আমরা পাইয়াছি—শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় এবং তদনুগত গোস্বামিপাদগণের অপূর্ব্ব লীলা-ব্যাখ্যায়।

রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে,
যদি গৌর না হ'ত।

এই 'প্রেমরসসীমা' কি ?

গোস্বামিশাস্ত্র বলেন—মধুরা-রতি যখন আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া 'কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী' হয় ; তখন উহাকে বলে 'সমর্থা' রতি', ইহাতে স্বসুখবাসনার লেশমাত্রও নাই। এই রতি উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইয়া প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। মহাভাব আবার রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ। অধিরূঢ় মহাভাবের চরম অবস্থার নাম মাদন। শ্রীরাধা এই মাদনাখ্য মহাভাব-স্বরূপিণী—'মহাভাব-স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী'—উজ্জ্বল-নীলমণি।

'মহাভাব-স্বরূপিণী' অর্থ কি

'সাধনভক্তি হৈতে রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়॥
প্রেমবৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥

দৃষ্টান্ত—

যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, সার।
শর্করা, সিতা, মিশ্রী, উত্তম মিশ্রী আর॥'—চরিতামৃত

'অথ সমর্থা প্রথমদশায়াং রতিঃ বীজবৎ, প্রেমা ইক্ষুবৎ, স্নেহো রসবৎ, ততো মানং গুড়বৎ, ততঃ প্রণয়ঃ খণ্ডবৎ, ততো রাগঃ শর্করাবৎ, ততঃ অনুরাগঃ সিতাবৎ, ততো মহাভাবঃ সিতোপলবৎ'—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী ভাব ও মহাভাবে কিছু পার্থক্য করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এদুটি শব্দ এক অর্থেই ব্যবহৃত করিয়াছেন।

চরিতামৃতে শ্রীরাধা-তত্ত্ব এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি॥
হ্লাদিনীর সার-প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা—নাম মহাভাব॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥
... ...
গোবিন্দানন্দিনী রাধা, গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥ আদি, ৪র্থ

'রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার' অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তি। আমরা পূর্ব্ব-আলোচনায় দেখিয়াছি, সচ্চিদানন্দের ত্রিবিধ শক্তি—সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী। হ্লাদিনী শক্তিদ্বারাই তিনি নিজে আনন্দ ভোগ করেন এবং জীবকে আনন্দ দেন। শ্রীরাধা মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি। প্রেমেই প্রকৃত আনন্দ, তাই গোস্বামিশাস্ত্র বলেন—হ্লাদিনীর সার প্রেম। প্রেম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় মহাভাবে। শ্রীরাধা এই মহাভাবস্বরূপিণী।

শ্রীরাধা সমস্ত সৌন্দর্য্যের, মাধুর্য্যের, লাবণ্যের মূলাধার। তিনি কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণগতজীবনা, তাঁহার বদনে কৃষ্ণনাম, নয়নে কৃষ্ণরূপ, হৃদয়ে উজ্জ্বল প্রেমরসবৈচিত্র্য, তাঁহার প্রতি অঙ্গ সাত্ত্বিকাদি ভাব-ভূষণে অলঙ্কৃত। কবিরাজ গোস্বামিপাদ এই মহাভাবময়ী প্রেম-প্রতিমার যে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই অতুলনীয়, অপ্রাকৃত, কেবল ভক্ত ভাবুকের ভাবগম্য।—

মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহ রূপ॥
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা শ্যাম পট্টশাড়ী পরিধান॥

কৃষ্ণ অনুরাগ-রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিত কান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ বিলেপন ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব-ভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি ॥
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম বৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল ॥
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর ॥ মধ্য, ৮ম

... ...

অষ্ট সাত্ত্বিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী আর।
সহজ প্রেম বিংশতিভাব অলঙ্কার ॥
এত ভাবভূষায় ভূষিত রাধা অঙ্গ।
দেখিয়া উছলে কৃষ্ণের সুখাদি তরঙ্গ ॥

পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃতাংশে বলা হইয়াছে—'ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ' অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকাশ বা আবির্ভাব। এ কথার মর্ম্ম এই—শ্রীরাধাই মূল কান্তা-শক্তি। শ্রীকৃষ্ণকে রাসাদি লীলারস আস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীরাধাই সমস্ত ব্রজদেবীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। রূপে, ভাবে এবং রসবৈদগ্ধ্যাদিতে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে, এইরূপে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে অনন্ত রস-বৈচিত্র্য আস্বাদন করাইয়া থাকেন। নিম্নোক্ত শ্লোকগুলিতে এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে—

শ্রীরাধা ও ব্রজদেবীগণ

আকার-স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রসভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে ॥

রাধাকৃষ্ণ একই তত্ত্ব—
লীলাতে দ্বিধা-কৃত

পরমার্থতঃ রাধাকৃষ্ণ একই তত্ত্ব, যেমন অগ্নি ও দাহিকাশক্তি। কিন্তু স্বরূপতঃ এক হইলেও লীলারস আস্বাদনের জন্য তাঁহারা পৃথক্ বিগ্রহ ধারণ করেন। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ সত্ত্বেও ভেদ হয়—

রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥ আদি, ৪র্থ

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও এইরূপ কথাই আছে। তথায় উক্ত হইয়াছে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাংশস্বরূপা, মূলপ্রকৃতি—'মমার্দ্ধাংশ-স্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী'।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পরস্পর কি সম্বন্ধ তাহা পুরাণকার এইরূপে বিশদ করিয়াছেন—

'যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদোহি নাবয়োর্ধ্রুবম্।
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি॥
যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বয়ি সন্ততম্।'

—'তুমি যেখানে, আমিও সেখানে, আমাদের মধ্যে নিশ্চিতই কোন ভেদ নাই। দুগ্ধে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনি আমি তোমাতে সর্ব্বদাই আছি।'

'সৃষ্টেরাধারভূতা ত্বং বীজরূপোঽহমচ্যুতঃ।'
—'তুমি সৃষ্টির আধারভূতা, আমি অচ্যুতবীজরূপী।'

'কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্তয়ৈব রহিতং যদা।
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্॥
'সর্ব্বশক্তিস্বরূপাসি সর্ব্বেষাঞ্চ মমাপি চ।'

'—আমি যখন তোমাব্যতীত থাকি, তখন লোকে আমাকে কৃষ্ণ বলে, তোমার সহিত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলে। তুমি সকলের এবং আমার সর্ব্বশক্তিস্বরূপা।'

'ত্বঞ্চ সর্ব্বস্বরূপাসি সর্ব্বরূপোঽহমক্ষরে।'
'ন শরীরী যদাহঞ্চ তদা ত্বমশরীরিণী।'
'সর্ব্ববীজস্বরূপোঽহং যথা যোগেন সুন্দরি।
ত্বঞ্চ শক্তিস্বরূপাসি সর্ব্বস্ত্রীরূপধারিণী॥'

—'হে অক্ষরে, তুমি সর্ব্বস্বরূপা, আমি সর্ব্বরূপ। আমি যখন শরীরী নই, তখন তুমিও অশরীরিণী॥ হে সুন্দরি, আমি যখন যোগদ্বারা সর্ব্ববীজস্বরূপ হই, তখন তুমি শক্তিস্বরূপা সর্ব্বশ্রীরূপধারিণী হও।'—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ১৫ম অঃ

'মমাধারা সদা ত্বঞ্চ তবাত্মাহং পরস্পরম্।
যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ সমৌ প্রকৃতিপুরুষৌ।
নহি সৃষ্টির্ভবেদ্দেবি দ্বয়োরেকতরং বিনা॥'—শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ৬৭ম অঃ

'তুমি সদাই আমার আধার, আমি তোমার আত্মা, যেখানে তুমি সেখানেই আমি, তুল্য প্রকৃতি-পুরুষ। দুইএর একের অভাবে সৃষ্টি হয় না।'

পদ্মপুরাণেও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব অনুরূপ ভাষায়ই ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

'তৎপ্রিয়া প্রকৃতিস্তাদ্যা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা'—পাতাল খণ্ড

অর্থাৎ যিনি অদ্বয় পরতত্ত্ব, লীলায় তিনিই দ্বিধা-কৃত প্রকৃতি পুরুষ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে লীলা নিত্য, সুতরাং শ্রীরাধা-কৃষ্ণে চিরন্তন-সাযুজ্য।

গোলোকে রাধা-কৃষ্ণের নিত্যরাস। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বলেন—শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার বামপার্শ্ব হইতে এক কন্যার আবির্ভাব হইল—

'আবির্বভূব কন্যৈকা কৃষ্ণস্য বামপার্শ্বতঃ।'

ইনি আবির্ভূত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার সহিত রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং স্মিতমুখে প্রাণনাথের মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—

'সা চ সম্ভাষ্য গোবিন্দং রত্ন-সিংহাসনে বরে।
উবাস সস্মিতা ভর্ত্তুঃ পশ্যন্তী মুখপঙ্কজম্॥'

ইনিই শ্রীরাধা। একই, লীলাতে দ্বিধা-কৃত। এই তত্ত্ব শ্রুতি-মূলক, ইহার মূল উপনিষদে।

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব—দার্শনিক ভিত্তি

পুরাণে ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব যেরূপ বিবৃত আছে তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। পুরাণসমূহে লীলাখ্যানাদি সহায়ে শ্রুতিরই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। লীলা সত্য, প্রকৃতপক্ষে লীলার মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি, ধরিতে পারি। কিন্তু সেই লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে উহার মূলে যে বৈদান্তিক তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা অবধারণা করা আবশ্যক। এই হেতুই সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণই তাঁহাদের মতের পরিপোষণার্থ শ্রুতির শরণ লইয়াছেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব এবং প্রেমধর্ম্মের মূলগত বৈদান্তিক ভিত্তিটি কি?

শ্রুতি বলেন,—তিনি এক ও অদ্বিতীয়—'আত্মৈব ইদম্ অগ্র আসীৎ এক এব।'

কিন্তু সেই 'একমেবাদ্বিতীয়' একাকী রমিত হইলেন না, তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন, তিনি কামনা করিলেন আমার জায়া হউক—'স বৈ নৈব রেমে—তস্মাৎ একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ—স অকাময়ত জায়া মে স্যাৎ—বৃহ ১।৪।৩ অকাম, আপ্তকাম, আত্মারাম পুরুষে এই প্রথম কামের উদয় হইল। তারপর?—

প্রেমধর্ম্মের বৈদন্তিক ভিত্তি

তাঁহাতে পুরুষ-প্রকৃতি সম্পৃক্ত, একীভূত ছিল—এখন তিনি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পতি ও পত্নী হইলেন—'স হ এতাবান্ আস—যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ। স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নীচ অভবতাম্।'—বৃহ ১।৪।৩

একই, পতি ও পত্নী উভয়ই হইলেন। পতি পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, পত্নী পরা প্রকৃতি শ্রীরাধা।

'রাধা কৃষ্ণ ঐচ্ছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥'—চৈঃ চঃ

প্রথমে আত্মারাম পুরুষে কামের উদয় হইল 'কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি'-ঋক্। তাহার ফলে পুরুষ, প্রকৃতি-পুরুষ হইলেন। এই যুগল-মিলনের এক ফল সৃষ্টি অন্য ফল বিলাস, প্রেমরস আস্বাদন।—

'প্রকৃতি হইলা কৃষ্ণ পুরুষ আপনে।
বিভিন্ন আকার হইল 'রমণ' কারণে ॥
বিলাস কারণ আর সৃষ্টির কারণ।
বিলাসে উপজে প্রেম ভাবের লক্ষণ ॥'—দুর্ল্ভসার

পুরুষ-প্রকৃতি যোগে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা সকল শাস্ত্রেই বিবৃত আছে (গীঃ ১৪।৩ দ্রঃ)। সে কথা এখন আমাদের আলোচ্য নয়, সেখানে প্রকৃতির নামান্তর সন্ধিনী শক্তি। এখন রসস্বরূপের আলোচনা হইতেছে, এস্থলে প্রকৃতির নামান্তর হ্লাদিনী শক্তি, যাহাকে রাধিকা বলা হয়। পরম পুরুষকে আত্মারাম বলা হয়, এ কথার অর্থ, তিনি আত্মাতে রমিত হন, আত্মার সহিত রমণ করেন। ভক্তিশাস্ত্র বলেন, রাধিকাই তাঁহার আত্মা, রাধিকার সহিত রমণ করেন বলিয়াই তাঁহাকে আত্মারাম বলা হয়—

'আত্মাতু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাৎ অসৌ।
আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বাদিভিঃ।'—স্কন্দপুরাণ

তিনি আবার আত্মার আত্মা, রাধিকারও আত্মা। তাই তাঁহার প্রতি রাধিকার যেরূপ আকর্ষণ, রাধিকার প্রতিও তাঁহার সেইরূপ আকর্ষণ। প্রেমরস আস্বাদন উভয়তঃ। শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনিতে পাই—

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর রস করে মোরে বশ ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল।
রাধিকার স্পর্শে মোরে করে সুশীতল ॥ —চৈঃ চঃ

'কহিবে রাধারে তাহার অন্তরে
সদাই আছি যে বাঁধা।
করে করি কর জপি নিরন্তর
এ দুই অক্ষর রাধা।'

আবার শ্রীরাধিকার মুখে শুনি—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥'

'সখিরে! কি পুছসি অনুভব মোয়।
কানুক পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
নিতি নিতি নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাঁখলু
তবহুঁ হিয়া জুড়ন নে গেল ॥'—বিদ্যাপতি

আত্মার ও পরমাত্মার এইরূপ নিত্য-সম্বন্ধ। ইহাই বৈষ্ণব শাস্ত্রে নিত্য লীলায় প্রকটিত।

প্রঃ। রাধাকৃষ্ণ প্রকৃতি-পুরুষ, এ তত্ত্ব বুঝিলাম। গোপী-তত্ত্ব কি? গোপীগণও তো অনেক, শতসহস্র, কোটি, এই রকম কথাও পুরাণাদিতে দেখা যায়।

উঃ। প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণ বুঝা হয় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহারই অংশরূপে বিভিন্ন প্রকাশ

(৯৭।৯৮ পৃঃ)। গোপীগণ কেন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ, আর সবই প্রকৃতি। বৈষ্ণবশাস্ত্রে শতসহস্র, কোটি কোটি গোপী, এইরূপ অনির্দ্দেশ্য সংখ্যার উল্লেখ আছে, উহার অর্থ এই যে জীবমাত্রেই প্রকৃতি। তাই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে, প্রেম-ধর্ম্মে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ, আর ভক্তমাত্রেই প্রকৃতি; ভগবান্ রমণ, ভক্ত রমণী। পুরুষাভিমান থাকিলে তো 'গোপী-অনুগা' হইয়া প্রকৃতিরূপে সেবা করা যায় না। তাই শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রার্থনা—'ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব'।

প্রেমিকা মীরাবাঈ বৃন্দাবনে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে গোস্বামিপাদ বলিয়া পাঠাইলেন—আমি তো প্রকৃতির মুখ দর্শন করি না, কিরূপে সাক্ষাৎ করিব? তাহাতে মীরাবাঈ বলিয়াছিলেন—গোঁসাইজি কবে থেকে পুরুষ হলেন? আমরা তো জানি, ব্রজে সকলেই প্রকৃতি, এক শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ। শ্রীভক্তমালগ্রন্থ হইতে আখ্যায়িকাটি উদ্ধৃত করিতেছি—

'বৃন্দাবনে গিয়া বাঈ আনন্দে মগন।
বাঞ্ছা হৈল শ্রীরূপ-গোস্বামী দরশন॥
কহি পাঠাইল শ্রীরূপেরে কার দ্বারে।
দরশন করি যদি কৃপা করে মোরে॥
গোসাঞি কহেন মুই করি বনে বাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ॥
এ কথা শুনিয়া বাঈ ক্ষোভ পাই মনে।
পুন কহি পাঠাইল গোসাঞির স্থানে॥
এতদিন শুনি নাই শ্রীমন্ বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে॥
পুরুষ কোকিল ভ্রমরাদির অগম্য।
তেঁহ যে আইলা তাতে নাহি বুঝি মর্ম্ম॥
প্যারীজির প্রিয় সখী ললিতা জানিলে।
কেমনে রহিবে তেঁহ অন্তঃপুর স্থলে॥
এতেক প্রহেলী যদি কহি পাঠাইলা।
শুনিয়া শ্রীরূপ কিছু লজ্জিত হইলা॥'

প্রকৃতি-পুরুষ, সৃষ্টি-স্রষ্টা, জীব-ব্রহ্ম—এ সকল তত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে নিম্নোক্ত শ্রুতি-বাক্য কয়েকটি স্মরণ করা আবশ্যক, এগুলি বিভিন্ন স্থলে পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে—

'সোঽকাময়ত বহু স্যাম্'—তৈত্তি ২।৬

—সেই একবেমাদ্বিতীয় পুরুষ কামনা করিলেন, আমি এক আছি, বহু হইব।

'তদাত্মানম্ স্বয়মকুরুত'—তৈত্তি ২।৭

—'তখন তিনি আপনিই আপনাকে এইরূপ করিলেন।' সে কিরূপ ?—

'যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি॥—মুঃ ২।১।১

সৃষ্টিতত্ত্ব—বৈদান্তিক ভিত্তি

—'যেরূপ সুদীপ্ত অগ্নি হইতে স্বজাতীয় সহস্র সহস্র অগ্নিকণা নির্গত হয়, তদ্রূপ অক্ষর হইতে বিবিধ জীব উদ্ভূত হয় এবং তাহাতে বিলীন হয়।'

যাহা হইতে জীবসকল উদ্ভূত হয় সেই পুরুষের স্বরূপ কি ?—

'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।'—তৈত্তি ২।৭

—'তিনি রসস্বরূপ। এই জীব সেই রস লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়।'

'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রত্যয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।' তৈত্তি ৩।৬

—'ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। আনন্দ হইতেই ভূতসকল জন্মে, আনন্দদ্বারাই জীবিত থাকে, আনন্দাভিমুখে গমন করে এবং আনন্দেই বিলীন হয়।'

এই শ্রুতি-বাক্যগুলি হইতে আমরা জানিতে পারি পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের স্বরূপ কি, জীবের স্বরূপ কি, পরমাত্মা ও জীবাত্মার বা জীব ও ব্রহ্মে সম্পর্ক কি, জীব কোথা হইতে আসিল, কোথায় চলিয়াছে, অন্তিমে কোথায় পৌঁছিবে অর্থাৎ মানব জীবনের লক্ষ্য কি ?

এই কথাগুলি একটু বিস্তার করিয়া বলিতেছি—

স্ফুলিঙ্গবাদ, জীব-ব্রহ্মে ভেদাভেদ সম্বন্ধ

১। জীব ও ব্রহ্মে, জীবাত্মা পরমাত্মায় ভেদাভেদ সম্বন্ধ, যেমন অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। স্ফুলিঙ্গ অগ্নিই ('সরূপাঃ') ; কিন্তু অগ্নি-কণা। ব্রহ্ম বিভু, জীব অণু। ব্রহ্ম বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, সকলের মধ্যেই আছেন ; তিনি সকলের আত্মার আত্মা, অখিলাত্মা।

ভক্ত-ভগবানে আকর্ষণ উভয়তঃ

২। জীব ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে, ব্রহ্মের দিকেই চলিয়াছে, ব্রহ্মেই মিশিবে। অখিলাত্মা ও জীবাত্মা মূলতঃ এক, সুতরাং উহাদের পরস্পর আকর্ষণ স্বাভাবিক। ভগবান্ জীবের প্রিয়, জীবও ভগবানের প্রিয়। ভগবানকে না পাইলে জীবের চলেনা, জীবকে না পাইলেও ভগবানের চলেনা। সন্তানকে বাদ দিলে মাতৃত্ব নাই, পত্নীকে বাদ দিলে পতিত্ব নাই, জীবকে বাদ দিয়াও ঈশ্বরত্ব নাই, ভগবত্তা নাই।

জ্ঞানের পথ

অব্যক্ত, অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, অসীম যাহা তাহাতে লীলা নাই, সৃষ্টি নাই। উহা সত্তা মাত্র, তত্ত্বমাত্র। উহার সহিত আমাদের জীবনের কোন যোগাযোগ নাই। জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে আমাদের

আত্মবোধের মধ্যদিয়া সে অব্যক্ত তত্ত্ব উপলব্ধ হইতে পারে ; উহা জ্ঞানের পথ। কিন্তু অব্যক্ত যখন ব্যক্ত হইলেন, তখন এই রূপ-রসময় বিচিত্র জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, নিয়ন্তা, জীবের 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' রূপেই আমরা তাঁহাকে স্পষ্টতররূপে বুঝিতে পারি, চিন্তা করিতে পারি ; ইহা ভক্তির পথ। আরও ঘনিষ্ঠতর রূপে, সংসারের বিবিধ সম্বন্ধের মধ্য দিয়া, দাস-প্রভু, পিতা-পুত্র, সখা-সখী, কান্ত-কান্তা সম্বন্ধের মধ্য দিয়াও আমরা তাঁহাকে ধরিতে পারি, ইহা প্রেমের পথ, ব্রজের ভাব। তাই, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, নিত্যসখা, নিত্য-কান্তা। নিত্য বস্তুর নিত্যদাস তো অনিত্য হইতে পারে না। ব্যক্ত ও অব্যক্তে, পুরুষ ও প্রকৃতিতে, জীবে ও ঈশ্বরে নিত্য-সম্বন্ধ, আর তাহা মধুর সম্বন্ধ, কেননা তিনি মধুব্রহ্ম, মধুর উৎস। কান্ত-কান্তার সম্পর্ককে রসশাস্ত্রে 'মধুর' সম্পর্ক বলা হয়, কিন্তু তাঁহার সহিত সকল সম্পর্কই মধুর, সুমধুর।

ভক্তির পথ

প্রেমের পথ

'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।'—রবীন্দ্রনাথ

৩। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, সেই রস-স্বরূপই ব্রজে প্রকট, তাই ব্রজলীলা, আনন্দ-লীলা। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্ম-তত্ত্ব, ব্রজের গোপ-গোপী, পশুপাখী, তরুলতা সকলই জীবতত্ত্ব, প্রকৃতি-তত্ত্ব। এ উভয়ে পরস্পর স্বাভাবিক আকর্ষণ, কেননা একই দুই হইয়াছেন, বহু হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই ভালবাসেন, সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন। গোপীজনের রাসলীলাই প্রেমরসের চরম, কিন্তু সমগ্র ব্রজলীলাই রস-লীলা—বাৎসল্য রস, সখ্য রস, দাস্যরস—সকলই রসের লীলা, প্রেম-লীলা। এই রস-লীলার চিত্র শ্রীভাগবত-মুখে পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (৫৯।৬৪ পৃঃ)।

ব্রজে আনন্দলীলার চিত্র

৪। বস্তুতঃ ভক্ত ভাবুকের চিত্তে সমগ্র ব্রজলীলাটি আনন্দময়ের আনন্দ-লীলা, প্রেম-লীলা বলিয়াই প্রতীত হয়। কেননা যিনি আনন্দস্বরূপ তিনিই ব্রজে প্রকট। ব্রজের এই লীলাময় প্রেমঘন রসরাজকে যদি ব্রজে আবদ্ধ না রাখিয়া জগন্ময় জগৎস্রষ্টা বলিয়া চিন্তা করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি, তাহার এই জগৎ-সৃষ্টিরূপ লীলাও রস-লীলা, আনন্দ-লীলা। তাহা হইলে বুঝিতে পারি, ঋষিগণ কেন বলিয়াছেন—"ভূত সকল আনন্দ হইতেই আসিয়াছে, আনন্দদ্বারাই জীবিত আছে, আনন্দের দিকেই চলিয়াছে, আনন্দেই মিলিত হইতেছে (২২।১০৪ পৃঃ)"। তাহা হইলে বুঝিতে পারি বেদবাক্য—'ইনি সর্ব্বভূতের মধু, সর্ব্ব-

জগতে আনন্দলীলার চিত্র

ভূত ইহার মধু। এই পৃথিবীতে যিনি অধ্যাত্মভাবে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, ইনিই তিনি, ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সব (৩১ পৃঃ)।' তাহা হইলে বুঝিতে পারি কবি-বাক্য—

'আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্রতর বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।'—রবীন্দ্রনাথ।

'তুমি সুন্দর তাই তোমার বিশ্ব সুন্দর শোভাময়,
তুমি উজ্জ্বল তাই নিখিল বিশ্ব নন্দন প্রভাময়,
তুমি প্রেমের চিরনিবাস হে, তাই প্রাণে প্রাণে প্রেম পশে হে' (৩০ পৃঃ)।

'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমৃত আনন্দ পড়িছে ঝরিয়া'—(৩৩ পৃঃ)।

এইরূপই ছিল ঋষিগণের অনুভূতি (৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাঁহারা প্রজ্ঞানেত্রে দর্শন করিয়াছেন, সৃষ্টিতে সর্ব্বত্রই সেই আনন্দময়ের লীলা-বিলাস, যাহা কিছু প্রকাশমান সকলই আনন্দময়, অমৃতময় ('আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি')। তাঁহারা এই আনন্দময় পুরুষকে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, বিভু ইত্যাদি নাম দিয়াছেন। এই সকল নামের অর্থ—ইনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্রই আছেন। শ্রীভাগবত লীলা-বর্ণনায় প্রদর্শন করিয়াছেন, ব্রজের এই বালকটিও বিভু, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বত্রই আছেন।

রাসলীলায় কি দেখি?—

'তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ'।

'অঙ্গনাম্ অঙ্গনাম্ অন্তরা মাধবঃ, মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা'।

দুই গোপিকার মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণ, দুই কৃষ্ণের মধ্যে মধ্যে গোপিকা অর্থাৎ 'যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি'—তিনি বিভু বস্তু বলিয়াই ইহা সম্ভবপর—গোপী জীবতত্ত্ব, জীবাত্মা ; কৃষ্ণ পরমাত্মা ; উভয়ের প্রেম-লীলাই রাসলীলা।

শ্রীকৃষ্ণই ঋষিশাস্ত্রের ভূমা—বিভু

পুলিন-ভোজন লীলায় দেখি, শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থলে এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে সখাগণ বসিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেকেই দেখিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাহার মুখোমুখী, তাঁহার দিকেই চাহিয়া আছেন।

তিনি সর্ব্বতোমুখ। উপনিষদে এবং শ্রীগীতায় পরম পুরুষের এইরূপ বর্ণনা আছে—

'সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্' (গীঃ ১৩।১৩, শ্বেত ৩।১৬)—সর্ব্বদিকে তাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বদিকেই তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ। লীলা-বর্ণনায় এই তত্ত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেমন প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বেই শ্রীকৃষ্ণ (মধুর ভাব), তেমন প্রত্যেক সখার সম্মুখেই শ্রীকৃষ্ণ (সখ্যভাব)।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভূমা, বিভু। সেই অখণ্ড রসস্বরূপই খণ্ডরূপে বিশ্বময় আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই রসের কিঞ্চিন্মাত্র আস্বাদন পাইয়াই মানুষ কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্যাদি কলা সৃষ্টি করিয়াছে। সেই প্রেমের কিঞ্চিন্মাত্র আস্বাদন পাইয়াই মানুষ স্নেহ, প্রীতি, বাৎসল্য, সখ্য, দাম্পত্যাদি প্রেমরস আস্বাদন করিতেছে।

কিন্তু তিনি এই সৃষ্টিলীলা করেন কেন? তিনি তো পূর্ণ, আপ্তকাম আত্মারাম, তাঁহার তো কোন অভাব নাই, প্রয়োজন নাই, কামনা নাই। তাঁহার এই সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার কারণ কি?—ইহার প্রকৃত উত্তর, বেদ-বেদান্তে, পুরাণে, দর্শনে, কোথায়ও মিলেনা। মানুষ ইহার উত্তর দিতে পারেনা। তাই বেদান্ত-দর্শনে ঋষি বাদরায়ণ এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন—'লোকবৎ তু লীলা-কৈবল্যম্'—ইহা খেলামাত্র, লোকে যেমন বিনা প্রয়োজনেও আমোদের জন্য খেলা করে, তাঁহার এই সৃষ্টি-ব্যাপারটিও তাই। (লীলা শব্দের অর্থই খেলা)।

স্বামী বিবেকানন্দ এই সৃষ্টিলীলাতত্ত্বটি এইরূপ ভাবে বুঝাইয়াছেন।—

যেমন ছেলেরা খেলা করে, যেমন মহাযশস্বী রাজা-মহারাজগণও আপনাদের খেলা খেলিয়া যান, সেইরূপেই প্রেমের আধার প্রভুও নিজে জগতের সহিত খেলা করিতেছেন।

ভগবান্ পূর্ণ, তাঁহার কোন অভাব নাই, কেন তিনি এই নিয়ত কর্ম্মময় সৃষ্টি লইয়া ব্যস্ত থাকেন? তাঁহার কি উদ্দেশ্য? ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিষয়ে আমরা যে সকল উপন্যাস কল্পনা করি, সেগুলি গল্পহিসাবে সুন্দর হইতে পারে, উহাদের আর কোন মূল্য নাই। বাস্তবিকই সবই তাঁহার খেলা। তাঁহার পক্ষে সমস্ত জগৎটি নিশ্চিতই একটি মজার খেলা মাত্র। যদি তুমি খুব নিঃস্ব হও, তবে সেই নিঃস্বত্বকেই একটি মহা তামাসা বলিয়া বিবেচনা কর—বড় মানুষ হও তো বড়-মানুষত্বকেই তামাসারূপে সম্ভোগ কর। বিপদ আসে তো, তাহাই সুন্দর তামাসা, আবার সুখ পাইলে মনে করিতে হইবে এও এক সুন্দর তামাসা। জগৎ কেবলমাত্র ক্রীড়াক্ষেত্র—আমরা এখানে বেশ নানারূপ মজা উড়াইতেছি—যেন খেলা হইতেছে, আর ভগবান্ আমাদের সহিত

সৃষ্টি—খেলামাত্র, ইহার অন্য কারণ নাই

সর্ব্বদাই খেলা করিতেছেন, আমরাও তাঁহার সহিত খেলিতেছি। ভগবান্ আমাদের অনন্ত কালের খেলুড়ে, অনন্ত কালের খেলার সঙ্গী। একবার খেলার সাঙ্গ হইল; অল্লাধিক কালের জন্য বিশ্রাম—আবার খেলা আরম্ভ, আবার জগতের সৃষ্টি। কেবল **যখন ভুলিয়া যাও, সবই খেলা, আর তুমিও এ খেলার সহায়ক, তখনই, কেবল তখনই দুঃখ-কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়।** তখনই হৃদয় গুরুভারাক্রান্ত হয়; আর সংসার তোমার উপর গুরুবিক্রমে চাপিয়া বসে। কিন্তু যখনই তুমি এই দুদণ্ড জীবনের পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাবলীতে সত্যবোধ ত্যাগ কর, আর যখন সংসারকে ক্রীড়ারঙ্গভূমি আর আপনাদিগকে তাঁহার ক্রীড়ার সহায়ক বলিয়া মনে কর, তৎক্ষণাৎ তোমার দুঃখ চলিয়া যাইবে। আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহারই ক্রীড়ার সহায়ক। অহো, কি আনন্দ! আমরা তাঁহার ক্রীড়ার সহায়ক!

জীব এই খেলার সাথী

এই জগৎ-লীলা, আনন্দ-স্বরূপের আনন্দলীলা, **জীব যখন ইহা বুঝে যে সে এই খেলার সাথী তখনই মানব-জীবন সার্থক হয়।**

জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ,
ধন্য হলো, ধন্য হলো, মানব-জীবন। (২৫ পৃঃ)

খেলিতে হইলেই খেলার সাথী চাই। এক, অদ্বিতীয়, আত্মারাম হইয়া বসিয়া থাকিলে তো খেলা হয় না। তাই উপনিষৎ বলেন,—'তস্মাৎ একাকী ন রমতে'—একা একা ভাল লাগে না, তাই তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন ('দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ' ১০১ পৃঃ), বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন ('বহু স্যাম্' ১০৩ পৃঃ)। এই তো সৃষ্টির মূল তত্ত্ব।

গোস্বামিশাস্ত্র এই কথাটিই মধুর করিয়া বলেন—

'রাধা-কৃষ্ণ এক-আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে, রস-আস্বাদন করি॥'

কিন্তু কেবল দুই হইলেও হয় না, বহু না হইলে তো রাসাদি লীলা হয় না, তাই 'শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার'—

'বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানাভাবে রসভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে॥'

বহু কান্তাই বহু জীব। কান্ত একমাত্র তিনি। কান্ত-কান্তাভাব বা রাসলীলা সর্ব্বোচ্চ ভগবৎপ্রেমের উজ্জ্বলচিত্র।

সুতরাং ইহা সহজবোধ্য—এই লীলা নিত্যলীলা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রমতেও লীলা নিত্য। গোলোকে নিত্য রাস, তাহাই ব্রজে প্রকট। বৃন্দাবনকে নিত্য-বৃন্দাবনও বলা হয়। উহা চিন্ময়। একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে ভক্তের 'হৃদি-বৃন্দাবন' বা মন-বৃন্দাবনও বলা যায়, যেখানে নিত্য রাধা-কৃষ্ণলীলা, আত্মা-পরমাত্মার প্রেমলীলা, 'প্রেমরসাস্বাদন।'

নিত্য-লীলা

'অন্যের হৃদয় মন আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করে মানি,
তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা জানি।'—কবিরাজ গোস্বামী

বৈষ্ণবশাস্ত্রের সকল পরিভাষা গ্রহণ না করিয়াও মানবমাত্রেই, সকল ধর্ম্মের সাধকমাত্রেই—প্রেমভক্তির সাধনায় এই বৈষ্ণবিক ভাবধারা গ্রহণ করিতে পারেন। কেননা, ইহা সার্ব্বজনীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ভক্তিসাধনার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ।

স্বামীজি রাসলীলাতত্ত্বটি এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'মানুষ প্রেমের ঐশ্বরিক আদর্শকে আর একরূপে প্রকাশ করিয়াছে। উহার নাম মধুর, আর উহাই সর্ব্বপ্রকার প্রেমের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। স্ত্রীপুরুষের প্রেম যেরূপ মানুষের সমুদয় প্রকৃতিটিকে ওলট-পালট করিয়া ফেলে, আর কোন্ প্রেম সেরূপ করিতে পারে? এই মধুর প্রেমে ভগবান্‌কে আমাদের পতিরূপে চিন্তা করা হয়। আমরা সকলে স্ত্রী, জগতে আর পুরুষ নাই, কেবল একমাত্র পুরুষ আছেন তিনিই আমাদের সেই প্রেমাস্পদ একমাত্র পুরুষ।'

অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, ভগবদ্ভক্তগণ এই ভগবৎপ্রেমের কথা বলিতে গিয়া সর্ব্বপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভাষা উহা বর্ণনা করিবার উপযোগী করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। মূর্খেরা উহা বুঝে না—তাহারা কখনও উহা বুঝিবে না। তাহারা উহা কেবল জড়দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা এই আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মত্ততা বুঝিতে পারে না। কেমন করিয়া বুঝিবে?

মানবীয় ভাষায় ভগবৎ-প্রেমের বর্ণনা

'হে প্রিয়তম তোমার অধরের একটিমাত্র চুম্বন, যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ তোমার জন্য তাহার পিপাসা বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়। তিনি তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যান।'

'সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥'—ভাঃ ১০।৩১।১৪

প্রিয়তমের সেই চুম্বন, তাঁহার অধরের সহিত সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও যাহা ভক্তকে পাগল করিয়া দেয়, যাহা মানুষকে দেবতা করিয়া তুলে; ভগবান্ যাহাকে

একবার তাঁহার অধরামৃত দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহার সমুদয় প্রকৃতিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে জগৎ উড়িয়া যায়, তাঁহার পক্ষে চন্দ্রসূর্য্যের আর অস্তিত্ব থাকে না, আর সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ সেই এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে মিলাইয়া যায়। ইহাই প্রেমোন্মত্ততার চরমাবস্থা। প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক আবার ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমও তাঁহার নিকট তত উন্মাদকর নহে। ভক্তেরা অবৈধ (পরকীয়) প্রেমের ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, কারণ উহা অতিশয় প্রবল। যতই ঐ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয় ততই উহা প্রবলভাব ধারণ করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কিরূপে লীলা করিতেন, কিরূপে সকলে তাঁহাকে উন্মত্ত হইয়া ভালবাসিত, কিরূপে তাঁহার সাড়া পাইবামাত্র গোপীরা—ভাগ্যবতী গোপীরা—সমুদয় ভুলিয়া, জগৎ ভুলিয়া, জাগতিক কর্ত্তব্য, জগতের সব বন্ধন, ইহার সমুদয় সুখদুঃখ ভুলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, মানবীয় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। মানুষ—মানুষ—তুমি ঐশ্বরিক প্রেমের কথা কও, আবার জগতের সব ভ্রমাত্মক বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতে পার। তোমার কি মন মুখ এক ? যেখানে রাম আছে সেখানে কাম থাকিতে পারে না, যেখানে কাম আছে, সেখানে রাম থাকিতে পারে না।

প্রেমোন্মত্ততা

রাসলীলা কি রূপক ?

প্রঃ। ব্রজলীলা যদি জগৎ-লীলা বলিয়াই ব্যাখ্যাত হয়, হৃদয়-বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ-লীলা যদি আত্মা-পরমাত্মার সম্বন্ধই ব্যক্ত করে, তাহা হইলে তো ব্রজলীলাটি একটি রূপক হইয়া পড়ে। স্বামীজি যে বলিলেন, মানবীয় প্রেমের ভাষায় ভগবৎ-প্রেমের বর্ণনা, এ কথায়ও রূপকের ভাবই প্রকাশ পায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তগণ কি তত্ত্বটি এইরূপ ভাবে গ্রহণ করেন, রাসলীলাকে রূপক বলিয়া গ্রহণ করেন ?

উঃ। না, তা তাঁহারা করেন না। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের উপাসক, শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসক। তাঁহারা তো রূপকের উপাসনা করেন না। শ্রীগৌরাঙ্গও একাধারে রাধা-কৃষ্ণ, 'রসরাজ-মহাভাব'——'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্'—

'জয় নিজ কান্তা কান্তি কলেবর
নিজ প্রেয়সী-ভাব বিনোদ।'

তাঁহাদের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন রূপক নহেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণও তেমনি রূপক নহেন, লীলাও রূপক নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট, রাধাকৃষ্ণ-লীলা তাঁহাদের স্বানুভূতিতে দৃষ্ট।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক সঙ্গীত, পদাবলী ইত্যাদির কোনরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও তাঁহারা পছন্দ করেন না। কেননা, জীব-ব্রহ্ম, আত্মা-পরমাত্মা ইত্যাদি

বিষয়ক তত্ত্বালোচনা তাঁহাদের নিকট শুষ্ক নীরস বোধ হয়, উহাতে রসাস্বাদনের ব্যাঘাত ঘটে। যাঁহাদের মানসপটে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি সতত বিরাজিত, যাঁহারা মধুর লীলারস-আস্বাদনে সতত লোলুপ, তাঁহারা নিরাকার তত্ত্বের নীরস আলোচনার সুখ পাইবেন না, ইহা স্বাভাবিক।

বস্তুতঃ, রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক মধুর পদাবলী সাহিত্যের যে একটা অপূর্ব্ব মাদকতা শক্তি আছে তাহাতে চিত্ত যেরূপ ভক্তিরসে দ্রব হয়, সেরূপ শুষ্ক তত্ত্বালোচনায় হইতে পারে না, কাজেই ভক্তজনের উহা ভাল লাগে না। একদিন একটি সন্ন্যাসী সাধু, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের সহিত অতি উৎসাহের সহিত সাকার-নিরাকার, আত্মা-পরমাত্মা ইত্যাদি বিষয়ে তত্ত্বালোচনা করিতেছিলেন। তখন দৈনিক সাধন-ভজনের সময় উপস্থিত, ও-সকল কথা তাঁহার বড় ভাল লাগিতেছিল না। তিনি কহিলেন,—আচ্ছা, তত্ত্বালোচনা তো হইল, এখন একটু নাম-কীর্ত্তনাদি করি। এই বলিয়া তিনি একটি গান করিলেন—

মধুর পদাবলীর মাদকতা শক্তি

দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে চাঁদমুখ না দেখিলে
মরমে মরিয়া আমি থাকি, সখি গো!
তুই বাহু পসারিয়া হৃদি মাঝে আকর্ষিয়া
নয়নে নয়নে তাঁরে রাখি, সখি গো!

ভক্তচূড়ামণি এই পদটি গান করিতে করিতে স্বয়ং ভাবে গদগদ, গলদশ্রুলোচন, আর সন্ন্যাসী শ্রোতাটিও ততোধিক। ভক্তমুখে একটি সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহার জ্ঞান-চর্চ্চার কণ্ডূতি প্রশমিত হইল।

বলা বাহুল্য, পদটিতে রসও আছে, তত্ত্বও আছে। জীবাত্মা-পরমাত্মার নিত্য সম্পর্ক এই পদটি হইতে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে হৃদ্‌গত হয়, গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ শুষ্ক বাগ্‌-বিতণ্ডায় তাহা হয় না।

গৌড়ীয় গোস্বামিশাস্ত্র মতে এই রাধাপ্রেমই সাধ্য-শিরোমণি। কিন্তু মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া সাধন করা জীবের পক্ষে সাধ্য নয়। তাই গোস্বামি-শাস্ত্রে সখীভাব গ্রহণ করিয়া সাধনের বিধি আছে। ইহাই গোপী-অনুগা ভজন। এই সখীতত্ত্ব স্থাপন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বৃন্দাবন-লীলার উপর এক অভিনব আলোকপাত করিয়াছেন।

সখীতত্ত্ব—গোপী-অনুগা ভজন

'সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহা কোটি সুখ পায়॥

সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাহা যেই করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিনে চিন্তে রাধা-কৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধ দেহে চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥'—চরিতামৃত

তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশ—
'অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥'

এইরূপ মানস-সেবাদ্বারাই দেহান্তে সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া সাধক রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলার সাথী হইতে পারেন। ইহাই বৈষ্ণব সাধনার গূঢ় সঙ্কেত। শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের নিম্নোক্ত পদটিতে এই তত্ত্বই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—

'বৃন্দাবনে দুইজন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সময় বুঝিয়া রহে সুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব কবে,
তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে॥
যুগল চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি
অনুরাগে থাকিব সদাই।
সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধ দেহে পাব তাহা
পক্কাপক্ক সুবিচার এই॥
পাকিলে সে প্রেমভক্তি অপক্কে সাধন কহি,
ভকত লক্ষণ অনুসারে।
সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধদেহে তাহা পাই
পক্ক অপক্কের এ বিচারে॥
নরোত্তম দাসে কয় এই যেন মোর হয়
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ গণনাতে আমারে গণিবে তাতে
তবহু পূরিবে অভিলাষ॥'

বৈধীভক্তি-সাধনদ্বারা ভক্তি পরিপক্ক হইলেই উহা প্রেমভক্তি বা রাগানুগা ভক্তিতে পরিণত হয়। উহার ফল সিদ্ধদেহে নিত্যলীলায় সখীত্ব লাভ। সংক্ষেপে, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তের সাধ্য-সাধন তত্ত্ব।

যে ভক্তজনের চিত্ত এইরূপ নিত্যলীলার অনুধ্যানে সতত যুক্ত থাকে সেই লীলাময় নিত্যধামে ঠিক এইরূপেই তাঁহার অনুভূতির বিষয়ীভূত হইবেন না, ইহা কে বলিতে পারে? যাঁহার যেরূপ ভাবনা তাঁহার সিদ্ধিও তদ্রূপ ('যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী')। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—'যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি'। সনাতন ধর্ম্মে এইরূপ উদার মহাবাক্য থাকিতে, এ সকল রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিবার কাহার কি যুক্তি আছে? হইতে পারে, কাহারও কাছে রূপক, কিন্তু শ্রদ্ধাশীল ভক্তের কাছে নয় এবং 'ভক্ত-পরাধীন' ভগবানের কাছেও নয়। শ্রীভগবান্ তো রূপক নন।

আবার ঐ উদার ভগবদুক্তির প্রমাণবলেই একথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, অপর ভক্তজন যদি অন্যভাবে তাঁহাকে চিন্তা করেন তবে তিনি সেইভাবেই তাঁহার অনুভূতির বিষয়ীভূত হইবেন। তাঁহাতে অসম্ভব কি আছে?

প্রেমিকা মীরাবাঈর উক্তি আছে—

'মেরে তো গিরিধারী গোপাল—দুসরা ন কোই।
যাঁকো শির ময়ূর মুকুট মেরো পতি সোই॥'

ইহা শ্রীভাগবতের গোপীভাব। প্রেমিকা করমেতি বাঈ-এর সহিত গিরিধারীর পরিণয়-বন্ধনের কাহিনীও আছে।

এই ভাব, এইরূপ মধুর ভাবাশ্রয়ে অন্তরঙ্গ সাধন-প্রণালী কেবল আমাদের দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে নয়, অন্যান্য দেশের প্রেমিক সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত আছে। ইংরেজীতে ইহাদিগকে মিষ্টিক (mystics) বা অন্তরঙ্গ সাধক বলে এবং এই সাধন-প্রণালীকে mysticism (অন্তরঙ্গ সাধন-প্রণালী) বলে। আমাদের শাস্ত্রে সাকার-বাদ আছে, অবতার আছেন, প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ আছেন, প্রেমময়ী শ্রীরাধা আছেন, প্রেমিকা গোপিকা আছেন, সুতরাং আমরা এই মধুরভাব সহজেই বুঝিতে পারি, ধরিতে পারি। কিন্তু খ্রীস্টীয়াদি ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সকলের অনুরূপ কিছু না থাকিলেও, অন্তরঙ্গ সাধকগণ ঈশ্বরকে প্রেমময় 'পুরুষ'-রূপেই চিন্তা করেন, এবং কান্তাভাবেই ভজনা করেন।

পাশ্চাত্য মিষ্টিক বা অন্তরঙ্গ সাধক

তাঁহারা ভগবৎপ্রেম-প্রকাশের প্রতীকরূপে আলিঙ্গন, চুম্বনাদি আদিরসের ভাষারও

ব্যবহার করেন। তাঁহাদের প্রেমোচ্ছ্বাস ও প্রেমরস বর্ণনা এবং শ্রীভাগবত ও পদাবলী সাহিত্যের বর্ণনা প্রায় শব্দশঃই একরূপ। নিয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

Let Him kiss me with the kisses of His mouth.
—Song of Solomon

'বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্—(১০৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

Behold Thou art fair, my Beloved! yea pleasant,
Also our bed is green.
... ...
His left hand is under my head
And His right hand doth embrace me.
By night on my bed—I sought him
Whom my soul loveth.
His left hand should be under my head
And His right hand should embrace me.
Ye stir not up nor awake
My Love until He please. —Song of Solomon

সখি! হের দেখ্ সিয়ে বা।
চন্দ্রবদনী, ঘুমাইয়া ধনী,
শ্যাম অঙ্গে দিয়ে পা॥
নাগরের বাহু শীথান ক'রেছে,
বিথান বসন ভূষা।
নাসার নিঃশ্বাসে বেশর তুলিছে,
হাসিখানি আছে মিশা॥ —জগন্নাথ দাস

এই দুটি চিত্র, ভাবে ও ভাষায় প্রায় একরূপ নহে কি? আবার দেখুন,

Upon my flowery breast
Wholly for Him and save Himself for none,
There did I give sweet rest
To my Beloved one,
The fanning of the cedars breathed thereon,
All things I then forgot,
My cheek on Him who for my coming came.
All ceased and I was not,
Leaving my cares and shame
Among the lilies and forgetting them,
—St. John of the Cross

'অতসী কুসুম সম শ্যাম সুনাগর
নাগরী চম্পক গোরী।
নব জলধর জনু চাঁদ আগোরল
ঐছে রহল শ্যাম কোরি॥
বিগলিত কেশ কুসুম শিখি চন্দ্রক
বিগলিত নীল নিচোল।
দু'হক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম-হিল্লোল॥'

খ্রীস্টীয় সাধু সেণ্ট জন এবং নব রসিকের অন্যতম বিদ্যাপতি প্রায় অনুরূপ ভাষায়ই প্রেমরস-আস্বাদনের বর্ণনা করিয়াছেন।

If thy soul is to go on to higher spiritual blessedness, it must become woman,—yes, however manly you may be among men.—F. W. Newman.

'ছাড়িয়া পুরুষদেহ কবে বা প্রকৃতি হ'ব'—শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর

The soul thus spake to her Desire—Fare forth and see where my Love is ; say to Him that I desire to love. So Desire sped forth (to the Lord) and cried, 'Lord, I would have thee know that my lady can no longer bear to live. If Thou wouldst flow forth to her, then might she swim ; but the fish cannot long exist that is left stranded on the shore. 'Go back', said the Lord, 'bring to me that hungry soul, for it is this alone that I take delight. —প্রেমিকা মেথ্‌থিল্ড (Mechtchild)

শ্রীরাধিকার মুখেও রাম রায় এইরূপ কথা দিয়াছেন—

'ন খোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন।
দুহুঁ কেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥'

পাঁচবাণ, কাম, Desire,—এখানে আপ্তদূতী। বৈষ্ণব পরিভাষায় কামই প্রেম, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য মিষ্টিকগণ এই সকল ভাষা কিরূপ অর্থে ব্যবহার করেন তাহাও স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

'Let Him kiss me with kissess of His mouth' (১১৪ পৃঃ)—Who is it that speaks these words ? It is the Bride. Who is the Bride ? It is the soul thirsting for God'—St. Bernard.

—প্রিয়তমের মুখ-চুম্বন চাহে কে ? —প্রিয়তমা বধূ। বধূ কে। —ভগবৎপ্রেম-পিপাসু মানবাত্মা।

ভক্তজন যে প্রেমভক্তির সাধনা করেন, প্রেমরস আস্বাদন করেন, সেই ভক্তজন বলিতে তাঁহার দেহটা তো বুঝায় না। আর প্রেমরস বলিতে দৈহিক সুখও বুঝায় না। মানবাত্মাই প্রেমরসপিপাসু এবং প্রেমরসের আস্বাদক, আর প্রেমভক্তির বিষয় হইলেন শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্মা। সুতরাং এই লীলায় ভক্ত ও ভগবানের, আত্মা ও পরমাত্মার প্রেম-সম্পর্কই বুঝায় এ কথায় রূপকত্ব কিছু নাই এবং এবিষয়ে মতভেদও থাকিতে পারে না। মতভেদ উপস্থিত হয় এই কারণে যে সেই শ্রীকৃষ্ণ বস্তুটিকে সকলে একভাবে দেখেন না। যিনি তাঁহাকে যে ভাবে দেখেন, তাঁহার ভাব-ভক্তিও সেই ভাবেই প্রকাশিত হয়। ঋষিগণও তাঁহাদের ইষ্টবস্তুকে 'সুন্দর', 'প্রিয়', 'মধু', 'প্রেমাস্পদ', 'দয়িত', 'বণিত" ইত্যাদি শব্দে আখ্যাত করিয়াছেন। শ্রীভাগবতও গোপিকা-মুখে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এই সকল কথাই দিয়াছেন। ঋষিগণ তাঁহাকে দেখিয়াছেন ভূমারূপে, অখিলাত্মা-রূপে এবং তদনুরূপ তাঁহাদের অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন (৩২ পৃঃ)। শ্রীভাগবতেও ব্রজলীলার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে কেবল ইঙ্গিতে নয় স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন ব্রজে অখিলাত্মারই প্রকাশ (৬১ পৃঃ)। তাই তিনি ব্রজের সকলের প্রিয়, ব্রজবাসিগণ সকলেই তাঁহার প্রিয়, অখিলাত্মা সকলেরই আত্মা, আত্মা সকলেরই প্রিয়, সকল প্রিয় বস্তু হইতে প্রিয় ('প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি')। এই প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছি, সেই আনন্দস্বরূপ অখিলাত্মার প্রকাশ কেবল ব্রজে নয়, অখিল জগতে। তাই তাঁহার এই জগৎ-লীলা, আনন্দ-লীলা। ঋষিগণের এইরূপই অনুভূতি।

ঋষিগণ বলেন—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' (৩২ পৃঃ)

গোপীগণ বলেন—যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূরে।' (৩৭ পৃঃ)

প্রঃ। এক শ্রেণীর জ্ঞানীলোকে বলিতে পারেন, গোপীগণ অজ্ঞ, ঋষিগণ প্রাজ্ঞ, ঋষিবাক্যই সত্য।

উঃ। না উভয়ই সত্য। তিনি ভাবগ্রাহী, প্রেমময়, প্রেমের চক্ষে অজ্ঞে বিজ্ঞে পার্থক্য নাই।

'মূর্খো বদতি বিষ্ণায় বুধো বদতি বিষ্ণবে।
নম ইত্যেবমর্থঞ্চ দ্বয়োরেব সমং ফলম্॥'—নাঃ পঞ্চরাত্র।

—'মূর্খ লোকে 'বিষ্ণায় নমঃ' এবং পণ্ডিত লোকে 'বিষ্ণবে নমঃ' এইরূপ বলিয়া থাকেন, কিন্তু উভয় বাক্যের ফল ও অর্থ এক প্রকারই।'

জীবের দুঃখ কেন

প্রঃ। শাস্ত্র বুঝিলাম, ব্যাখ্যাও সুসঙ্গত, সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌম সত্য, ইহাও বুঝিলাম। কিন্তু এইটি বুঝা কঠিন, তিনি আনন্দস্বরূপ, জীবজগতে তাঁহারই অভিব্যক্তি; জগৎলীলা—আনন্দলীলা; তবে সকলে আনন্দ অনুভব করিতে পারে না কেন? জীবের দুঃখ কেন?

উঃ। এই প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধানেই তো সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্রাদি ব্যস্ত। এই রহস্য বুঝিতে না পারিয়াই তো দুঃখবাদ, যুক্তিবাদ, শূন্যবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, নিরীশ্বরবাদ ইত্যাদি কত বাদ-বিতণ্ডার উদ্ভব হইয়াছে। এ বিষয়ে অন্য গ্রন্থে যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, সুতরাং পুনরুক্তি অনাবশ্যক বোধ করি।*

ভক্তিশাস্ত্রে এ প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া হয় তাহা শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

'কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।
মায়য়ান্তর্হিতৈশ্বর্য্য ঈয়তে গুণসর্গয়া॥' ভাঃ ৭।৬।২৩

—শুদ্ধ আনন্দানুভবরূপেই পরমেশ্বর প্রকটীভূত হয়েন অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুভব আনন্দেরই অনুভব, কেননা তিনি আনন্দস্বরূপ। কিন্তু তিনিই জীবজগতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, অপ্রকট কেন? সর্ব্বত্র সকলের সেই আনন্দ অনুভূত হয় না কেন?—তাহার কারণ, তিনি সৃষ্টিকারিণী ত্রিগুণাত্মিকা মায়াদ্বারা আপনার স্বরূপ অন্তর্হিত করিয়া রাখেন।

জীব আনন্দস্বরূপকে পায় না কেন

শ্রীগীতাতেও অনুরূপ ভগবদুক্তি আছে—

'ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥' গীঃ ৭।১৩
'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।' গীঃ ৭।২৫

—'এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা (সত্ত্বরজস্তমোগুণদ্বারা) সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে, এ সকলের অতীত অক্ষয় আনন্দস্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না। আমি যোগমায়ায় সমাচ্ছন্ন থাকায় সকলের নিকট প্রকাশিত হই না।'

কারণ, জীব মায়া-মোহিত

ত্রিগুণ, মায়া, যোগমায়া—এ সকল একই কথা।

প্রঃ। তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইল এই যে, তিনি আপনিই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়া দ্বারা এই সৃষ্টি করিয়াছেন,

* গ্রন্থকার-সম্পাদিত শ্রীগীতা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

অথচ সেই মায়াদ্বারাই, ত্রিগুণের দ্বারাই আপনার আনন্দস্বরূপটি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। তাহা হইলে জীব তাহাকে পাইবে কিরূপে? সে তো মায়ার অধীন, ত্রিগুণের অধীন, ত্রিগুণের ফল যে সংসারের শতমুখী, কামনা-বাসনা তাঁহারই অধীন, সে মায়া তো তাঁহারই সৃষ্টি। তবে জীবের উপায় কি? সে কিরূপে মায়া অতিক্রম করিবে?

মায়া কাটিবার উপায় কি?

তাহাও পরেই বলিয়াছেন—

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' ॥৭।১৪

—'ত্রিগুণাত্মিকা আমার এই মায়া নিতান্ত দুস্তরা। যাহারা আমার শরণাগত হয়, কেবল তাহারাই এই সুদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে।'

ভগবৎ-শরণাগতি

প্রঃ। তিনি বলিতেছেন, এ আমারই মায়া। তাহা হইলে তিনিই মায়াদ্বারা আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, জীবকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। আবার বলিতেছেন, আমার নিকট আসিলেই, আমার শরণ লইলেই মায়া দূর হইয়া যাইবে। এ কেমন কথা হইল? এ তো বেশ খেলা!

উঃ। হ্যাঁ, ইহা খেলামাত্র (১০৭ পৃঃ), খেলার ভাব লইয়াই ইহার ব্যাখ্যাও করা যায়। সৃষ্টির আনন্দ, বহু হইবার আনন্দ, আবার সেই বহু হইতে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়া লুকোচুরি খেলার আনন্দ, তাই ইহা আনন্দের খেলা। রাসলীলায় রাসমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণের সহসা অন্তর্ধান কেন? এই ব্যাপারটি না থাকিলে গোপীপ্রেম, ভগবৎপ্রেম যে কী বস্তু তাহা ভাগবতকার এমনভাবে বুঝাইতে পারিতেন না। তিনি লুকাইয়া আছেন, চিরকাল লুকাইয়া থাকিবার জন্য নহে, দেখা দিবার জন্যই, তিনি তো দেখা দিবার জন্যই ব্যাকুল, তিনি চান জীব তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করুক, নচেৎ খেলা হয় না। তিনি লীলাচ্ছলে প্রকৃতির আবরণে, জীবের কামনা-বাসনার অন্তরালে লুকাইয়া আছেন, ধরা দিবার জন্যই। জীব তন্মনা হইয়া কৃষ্ণবিরহবিধুরা গোপাঙ্গনার ন্যায়—'কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ', 'কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ', 'তন্মনস্কাঃ', 'তদালাপাঃ', 'তদাত্মিকাঃ' গোপাঙ্গনাগণের ন্যায় তাহার অন্বেষণ করুক, তিনি হাসিমুখে দেখা দিবেন ('তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ')।

তন্ময় হওয়া চাই

গোপীগণ যদি বলিতেন—কৃষ্ণ তো চ'লে গেলেন, চল আমরা বাড়ী যাই, গৃহকর্ম্মও তো আছে, তা হ'লে আর কৃষ্ণ মিলিত না। তুমনা হইলে কৃষ্ণ মিলেনা, তন্মনা হওয়া চাই। উহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সারকথা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সচ্চিদানন্দ—সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ প্রতাপঘন

সচ্চিদানন্দের ত্রিবিধ শক্তি—সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী—কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম। শক্তির প্রকাশ লীলায় (৪৯-৫৩ পৃঃ দ্রঃ)। আমরা পূর্ব্ব আলোচনায় দেখিয়াছি, ব্রজলীলায় প্রধানতঃ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ ; ব্রজে তিনি রসময় প্রেমঘন।

এক্ষণে আমরা মথুরা-দ্বারকা লীলার আলোচনা করিব। এ লীলায় প্রধানতঃ তাঁহার সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ, ইহা কর্ম্মশক্তি। ইহার ফল প্রতাপ। এই শক্তিবলেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন, সংহার করেন। এই শক্তির প্রেরণায়ই জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি। ইহার কণামাত্র লাভ করিয়া মানব শিক্ষা-সমৃদ্ধি-শিল্প-সম্ভার-পূর্ণ বিচিত্র বিরাট সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা আলোচনায় আমরা দেখিব, তিনি মূর্ত্তিমান কর্ম্মশক্তি, তিনি সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ, সর্ব্বশক্তিমান্, প্রতাপঘন।

মথুরা-দ্বারকা লীলায় কর্ম্মশক্তির প্রকাশ

যিশু, বুদ্ধাদিও অবতার বলিয়া পূজিত। তাঁহারা ধর্ম্ম, প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া মানবাত্মাকে উন্নীত করিয়াছেন, জীবের উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণেও সে সকলের অভাব নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অন্যত্র দেখা যায় না। কোন অবতারই একথা বলেন না—'আমি সতত কর্ম্ম করি, তোমরাও কর্ম্ম কর।' বরং অনেকে ইহার বিপরীত কথাই বলেন। শ্রীগীতায় কিন্তু শ্রীভগবান বলিতেছেন—

যিশু-খ্রীষ্টাদি ও শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্য

'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয় জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।'—গীঃ ৩।২২-২৪

—'হে পার্থ, ত্রিলোকে আমার করণীয় কিছু নাই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নাই, তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত আছি।

'যদি আমি অনলস হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তবে মানবগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্ত্তী হইবে। যদি আমি কর্ম্ম না করি তবে এই লোকসকল উৎসন্ন যাইবে।'

তিনি অতন্দ্রিতভাবে কর্ম্ম করেন। কেননা, তিনি কর্ম্ম না করিলে তাঁহার অনুসরণে জীব কর্ম্ম করিবে না। কর্ম্মলোপে বিশ্বলোপ। বিশ্বনাথই লোকরক্ষার্থ ও লোকশিক্ষার্থ অবতীর্ণ। তিনি বিশ্বের স্রষ্টা, নিয়ন্তা, পালক, রক্ষক। তাই তাঁহার উপদেশে সর্ব্বত্রই দেখি কর্ম্ম-প্রেরণা।

শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মপ্রেরণা ও কর্ম্মোপদেশ

এইরূপ কর্ম্মোপদেশ ও কর্ম্মপ্রেরণা যে কেবল শ্রীগীতাগ্রন্থেই দেখা যায় তাহা নহে। মহাভারতের অন্যান্য স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের মুখে কর্ম্ম-মাহাত্ম্যের অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। উদ্যোগপর্ব্বে সঞ্জয়যান পর্ব্বাধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন—

'শুচি ও কুটুম্ব-পরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক জীবনযাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ, কেহ বা কর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যাদ্বারা কর্ম্ম-সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কর্ম্মনুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল; অতএব যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির জলপান করিবামাত্র পিপাসা শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয়, কর্ম্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।

কর্ম্ম-মাহাত্ম্য বর্ণনা

'দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন, সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন, দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন, চন্দ্রমা কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলি-পরিবৃত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন, হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্ম-সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, পৃথিবী কর্ম্মবলে নিতান্ত দুর্ব্বহভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন।

'স্রোতস্বতী কর্ম্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে। অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্মবলে দশদিক্ ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ বিসর্জ্জন এবং প্রিয়বস্তু সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা ও ধর্ম্ম

প্রতিপালন পূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়নিরোধ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সরা, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন"—মভা, কাঃ প্রঃ সিংহ অনুবাদ, উদ্যোঃ। ২৮ অঃ

এই অপূর্ব্ব কর্ম্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, এই বিশ্বসৃষ্টি কর্ম্মেরই অভিব্যক্তি, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মের সৃষ্টি, বিশ্ব-ব্যাপার কর্ম্মের দ্বারাই চালিত হইতেছে। দেব-নর, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র, সরিৎ-সাগর-গিরি সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া বিশ্বের ধারণ, রক্ষণ, পালন-পোষণে সহায়তা করিতেছে। প্রত্যেকেরই বিধি-নির্দ্দিষ্ট স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম আছে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে মানবসমাজ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত, প্রত্যেক বর্ণের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-কর্ম্ম আছে, উহাকেই স্বকর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম বলে, স্বধর্ম্ম-পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। উহার অপালন পূর্ব্বকালে নিন্দনীয় ও দণ্ডনীয় ছিল, কেননা প্রত্যেকে তাঁহার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম না করিলে সমাজরক্ষা হয় না। শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।' ইংরাজীতে ইহাকে বলে Duty।

'Stern Daughter of the Voice of God,
Thy name is Duty.'—

—এখানে কবি বলিতেছেন, কর্ত্তব্যের ডাক ঈশ্বর হইতে আইসে।

'I slept and dreamt that life was Beauty
I woke and found that life was Duty.'

—'নিদ্রায় দেখিনু হায়! মধুর স্বপন,—
কি সুন্দর সুখময় মানব-জীবন।
জাগিয়া মেলিনু আঁখি চমকিনু পুনঃ দেখি—
কঠোর কর্ত্তব্য-ব্রত জীবন-যাপন।'—প্রভাত-চিন্তা

বস্তুতঃ কর্ম্মের প্রবৃত্তি, কর্ত্তব্যের প্রেরণা, জীব ঈশ্বর হইতেই পাইয়াছে। কর্ম্মশক্তিও তাঁহারই, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, দেবগণের শক্তিও তাঁহারই শক্তি, মানুষের শক্তিও তাঁহারই শক্তি। শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—'মনুষ্যে আমি পৌরুষ' ('পৌরুষং নৃষু'), তাঁহা হইতেই সকলের কর্ম্মশক্তি, কর্ম্মোদ্যম, পুরুষকার। এজন্য শক্তিমানের গৌরব করিবার কিছু নাই।

একদা দেবগণ যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিজয়গর্ব্বে আত্মগৌরব অনুভব করিতেছিলেন। তখন ব্রহ্ম ছদ্মবেশে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'তোমাদের কাহার

১৬

কি সামর্থ্য আছে, বল।’ অগ্নি বলিলেন—এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎ-সমস্তই আমি দগ্ধ করিতে পারি। বায়ু বলিলেন—এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎ-সমস্তই আমি উড়াইয়া নিতে পারি। তখন ব্রহ্ম তাঁহাদের সম্মুখে একগাছি তৃণ রাখিয়া বলিলেন—‘তোমাদের যত শক্তি থাকে প্রয়োগ কর।’ অগ্নি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণটি দগ্ধ করিতে পারিলেন না (‘সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্’—কেন, ৩৷৫৷৬)। বায়ু সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহা উড়াইতে পারিলেন না। (‘সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুম্’)। উপনিষদের ঋষি দেবতাবিষয়ক এই আখ্যানে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বটিই পরিস্ফুট করিয়াছেন—শক্তি দেবগণের নহে, ব্রহ্মের।

শক্তি কাহার?

মহাভারতের একটি আখ্যানেও দেখি, এই তত্ত্বই পরিস্ফুট। কুরুক্ষেত্র-অন্তে প্রভাসে যদুবংশের ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান হইলে, অর্জ্জুন দ্বারকা হইতে যদু রমণীগণকে হস্তিনায় লইয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে দস্যুগণ লগুড় হস্তে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। ধনঞ্জয় রোষভরে গাণ্ডীব গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু এ কি! তাঁহার বাহু বলহীন! পরিশেষে অতিকষ্টে শরাসনে জ্যারোপণ করিলেন (‘চকার সজ্জং কৃচ্ছ্রেণ’), কিন্তু অস্ত্র সকল স্মরণে আইসে না! (‘চিন্তয়ামাস চাস্ত্রাণি ন চ সস্মার তান্যপি’)। ফলে, দস্যুগণহস্তে তিনি পরাস্ত হইলেন। শক্তি পার্থের নহে, পার্থ-সারথির। তাঁহার অন্তর্ধানে পুরুষকারের প্রতিমূর্ত্তি, কুরুক্ষেত্র-বিজয়ী পার্থ পৌরুষহীন।

সর্ব্বশক্তিমত্তার ফল অখণ্ড প্রতাপ। শ্রীকৃষ্ণের বল-বিক্রমের বিস্তর কাহিনী পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, তবে সে-সকল বর্ণনা অনেকস্থলেই অতি-প্রাকৃত ঘটনায় অতিরঞ্জিত। যিনি ঈশ্বর তাঁহার পক্ষে অলৌকিক শক্তিপ্রকাশ কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, সুতরাং ঐ সকল বর্ণনার কোন বিশিষ্টতা এবং সার্থকতা নাই। তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যের সহিত লীলা করিয়াছেন, মনুষ্যোচিত বল-বিক্রম ও পৌরুষের যে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ লোকশিক্ষার্থ তাহাই তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে বিশেষ প্রয়োজন স্থলে অলৌকিক ঐশী শক্তির প্রকাশও করিয়াছেন—যেমন অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন। তিনি মানুষী শক্তিদ্বারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, এবং এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ হইতে নিম্নোক্ত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

‘মনুষ্যধর্ম্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মুঞ্চতি

মনসৈব জগৎস্বষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ।
তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোঽয়মুদ্যমবিস্তরঃ॥
মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেমেবনুবর্ত্ততঃ।
লীলা জগৎপতেস্তস্য চ্ছন্দতঃ সম্প্রবর্ত্ততে॥' ৫।২২।১৪।১৫।১৮

—'তিনি পরমেশ্বর হইলেও মনুষ্যধর্ম্মশীল রূপেই তাঁহার এই লীলা। যিনি সঙ্কল্পমাত্রেই জগতের স্বষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন, তাঁহার শত্রুক্ষয়ের জন্য ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্রসহ যুদ্ধাদি উদ্যমের প্রয়োজন কি? বস্তুতঃ মনুষ্যদেহধারিগণের চেষ্টা অনুবর্ত্তন করিয়াই তিনি এই সকল লীলা করিয়া থাকেন।'

শ্রীকৃষ্ণের অনন্যসাধারণ বল-বিক্রম বিষয়ে দুর্য্যোধনাদিও বিশেষ সচেতন ছিলেন। যখন যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, তখন দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য 'বায়ুবেগশালী তুরঙ্গসমূহের সাহায্যে' ('সদশ্বৈঃ অনিলোপমৈঃ') দ্রুত দ্বারকানগরে গমন করিলেন। ধনঞ্জয়ও ঐ দিনই ঐ সময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল মূল মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

'বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তকসমীপস্থ প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ধনঞ্জয় পশ্চাৎ প্রবেশপূর্ব্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পাদতল-সমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয়, পরে দুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সৎকারপূর্ব্বক আগমনহেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।'

দুর্য্যোধন সহাস্যবদনে কহিলেন—"হে যাদব, এই উপস্থিত যুদ্ধে আমাকে আপনার সাহায্যদান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদিগের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহার্দ্দ্য, তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তিরই পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়, অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।" কৃষ্ণ কহিলেন—"হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি। এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়েরই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত। তৎপর ভগবান্ ধনঞ্জয়কে কহিলেন—"হে কৌন্তেয়, অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা এক অর্ব্বুদ গোপ এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক, আর অন্য পক্ষে নিরস্ত্র হইয়া

আমি থাকি, আমি যুদ্ধে বিরত থাকিব, এ যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না ('অযুদ্ধমানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোঽহমেকতঃ')। ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহাই অবলম্বন কর।"

জনার্দ্দন সমরে বিরত থাকিবেন শ্রবণ করিয়াও ধনঞ্জয় তাঁহাকেই বরণ করিলেন। দুর্য্যোধন অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া এবং কৃষ্ণ যুদ্ধে বিরত থাকিবেন জানিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইলেন, তিনি মনে করিলেন অর্জ্জুনকে জয় করিয়াছি, যুদ্ধ-জয় সুনিশ্চিত ('কৃষ্ণং চাপহৃতং মত্বা জিতং মেনে ধনঞ্জয়ম্')

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন—'আমি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ইহা জানিয়াও আমাকে বরণ করিলে কেন? আমাকে লইয়া কি করিবে?' অর্জ্জুন সসঙ্কোচে কহিলেন—'আমার মনে একটা আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা আপনি পূর্ণ করুন, আপনি আমার সারথ্য গ্রহণ করুন।' বাসুদেব কহিলেন—'তুমি আমার সহিত যে স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, তাহা নিতান্ত উপযুক্ত; আচ্ছা, আমি তোমার সারথ্য করিব' ('উপপন্নমিদং পার্থ যৎ স্পর্দ্ধেথা ময়া সহ। সারথ্যন্তে করিষ্যামি'॥)।

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য নিতান্ত হেয় কর্ম্ম বলিয়া গণ্য। শ্রীকৃষ্ণকে এরূপ অনুরোধ করিবার স্পর্দ্ধা একমাত্র অর্জ্জুনেই সম্ভব। ভক্তের ভগবান্।

'উদ্যোগপর্ব্বের এই অংশ সমালোচনা করিয়া আমরা এই কয়টি কথা বুঝিতে পারি—

শ্রীকৃষ্ণের নিরপেক্ষতা

প্রথম—কৃষ্ণ সর্ব্বত্র সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাণ্ডবদিগের পক্ষ, এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ। উপরে দেখা গেল, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য।

দ্বিতীয়—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগ-যুক্ত। প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন, তারপর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত হইল এবং অগত্যা তাঁহাকে এক পক্ষে বরণ হইতে হইল তখন তিনি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয়েই দেখা যায়না, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বত্যাগী ভীষ্মেও নহে।'—বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীকৃষ্ণ এ যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না, ইহা শুনিয়া দুর্য্যোধন আশ্বস্ত ও উৎফুল্ল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন, ইহা শুনিয়াই অন্ধরাজ ভয়ে অস্থির হইয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন—"কৃষ্ণ যাঁহাদিগের অগ্রণী, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।' ('প্রবেপতে মে হৃদয়ং ভয়েন শ্রুত্বা কৃষ্ণাবেকরথে সমেতৌ')-মভা, উদ্যোঃ ২১।২২

শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্যবীর্য্য-বল-বিক্রম সম্বন্ধে অন্যত্র তিনি বলিতেছেন—

"হে সঞ্জয়, বাসুদেব যে সকল অনন্যসাধারণ দিব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। মহাত্মা বাসুদেব বাল্যকালে যখন গোকুলে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, তৎকালেই তাঁহার বাহুবল ভুবনত্রয়ে বিখ্যাত হইয়াছিল। তিনি উচ্চৈঃশ্রবার তুল্য বল ও সমীরণের ন্যায় বেগশালী যমুনাতীরবাসী অশ্বরাজকে বধ করিয়াছেন। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ প্রলম্ব, নরক, জম্ভ, মহাশূর পীঠ ও সুরতুল্য মুরকে বিনাশ করিয়াছেন। তিনি বিক্রমপূর্ব্বক জরাসন্ধের প্রতিপালিত মহাতেজাঃ কংসকে স্বগণের সহিত সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছেন। সেই জনার্দ্দন অক্ষৌহিণীপতি মহাবাহু জরাসন্ধকে অন্যদ্বারা নিপাতিত করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে পরাক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল অর্ঘ্য-বিষয়ে বিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে পশুবৎ ছেদন করিয়াছিলেন। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মাগধ, কাশী, কৌশল, বাৎস্য, গার্গ, করূষ, পৌণ্ড্র, আবন্ত্য, দাক্ষিণাত্য, পার্ব্বত্য, দাশেরক, কাশ্মীরক, ওরসিক, পৈশাচ, মুদ্গল, কাম্বোজ, বাটধান, চোল, পাণ্ড্য, ত্রিগর্ত্ত, মালব, দরদ, নানাদিক্ দেশ হইতে সমাগত খস ও শকগণ এবং সানুচর যবনগণকে জয় করিয়াছিলেন।' মভাঃ দ্রোণ ১১।১২

শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড অপ্রতিহত প্রতাপ

এই বর্ণনা আরো সুবিস্তৃত, কতকাংশ এস্থলে পরিত্যক্ত হইল। শেষে ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন—'ইহা কখন শ্রবণগোচর হয় নাই যে, রাজাদিগের মধ্যে একজনও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন নাই।'

এ সকল বর্ণনার ঐতিহাসিক আলোচনায় আমাদের প্রবেশ করা নিষ্প্রয়োজন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কথার স্থূলমর্ম্ম এই যে,—শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড ও অপ্রতিহত প্রতাপ, কেহই উহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। তিনি অপরাজেয়, তাই তিনি বলিয়াছেন—'যদি কৌরবগণ পাণ্ডবগণকে জয় করেন, তাহা হইলে মহাবাহু বাসুদেব তাঁহাদিগের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট শস্ত্রগ্রহণ-পূর্ব্বক সমুদয় নরপতি ও কৌরবকে সংহার করিয়া কুন্তীকে মেদিনী প্রদান করিবেন।'

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এত সকল রাজ্য আক্রমণ এবং রাজগণকে পরাজিত বা নিহত করিয়াছেন কেন? রাজ্য বিস্তারের জন্য নহে, জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া নহে, দিগ্বিজয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষাবশতঃ নহে, তিনি এ-সকল করিয়াছেন, লোকরক্ষার্থে, কর্ত্তব্যানুরোধে। তিনি অন্যকে রাজ-সিংহাসন দিয়াছেন; নিজে কখনও রাজ-সিংহাসনে বসেন নাই। কংসকে বধ করিয়া তাহার পিতা উগ্রসেনকেই সিংহাসনে বসাইয়াছেন, জরাসন্ধ,

শিশুপাল আদিকে বধ করিয়া, সিংহাসন তাহাদের পুত্রাদিকেই দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্য কি তাহার আলোচনায় এ-সকল বিষয় স্পষ্টীকৃত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের উদ্দেশ্য ও কার্য্য

অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রীগীতাতে এইরূপ ভগবদুক্তি আছে—

'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥' গীঃ ৪।৭-৮

শ্রীগীতার বাক্য

—'যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সময় আপনাকে সৃষ্টি করি (দেহধারণ-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হই)। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই।'

পুরাণাদিতে দেখা যায়, কৃষ্ণ-অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অন্যান্যেও বিভিন্নরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিদুর বলেন—

'অজস্য জন্মোৎপথনাশনায়, কর্ম্মাণ্যকর্ত্তুর্গ্রহণায় পুংসাম্'—ভাঃ ৩।১।৪৩

বিদুরের বাক্য

—'জন্মরহিত ভগবানের জন্ম উৎপথগামীদের বিনাশ জন্য; কর্ম্মরহিত ভগবানের কর্ম্ম জীবসকলের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য।'

শ্রীশুকদেব ও কুন্তীদেবীর বাক্য

শ্রীশুকদেব ও কুন্তীদেবীর উক্তি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে (৫৪ পৃঃ)। তাঁহার বহু-বিচিত্র লীলাকথার অনুধ্যানে যাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপে উদিত হইয়াছেন, তিনি তদ্রূপই প্রকাশ করিয়াছেন। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ তাঁহাকে রসময় প্রেমময় ব্রজেন্দ্র-নন্দন-রূপেই চিন্তা করেন, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রেমরস আস্বাদনের জন্য এবং ব্রজের নির্ম্মল রাগ, গোপীভাব, জীবকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহার অবতার। স্থূল কথায়, লোকরক্ষা ও লোকশিক্ষা, এ উভয়ই তাঁহার অবতার-লীলার উদ্দেশ্য।

এ প্রসঙ্গে মহামনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

'কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে মানবরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্ত শক্তিমান,

বঙ্কিমচন্দ্রের মত

তাঁহার কাছে কংস-শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা দুরাত্মা-বিশেষের নিধন। আসল কথা, "ধর্ম্ম-সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"।

এই ধর্ম্ম-সংরক্ষণ কেবল সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন দ্বারাই হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ-পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ, ইহা ভাবিলে তাঁহার সকল কার্য্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্রস্বরূপ রত্নভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শ-পুরুষ-তত্ত্ব।

মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন জন্যই ঈশ্বরের শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতার গ্রহণ। আমি কৃষ্ণ-চরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে এই বুঝাইয়াছি যে, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য ভগবানের মানবদেহ ধারণ। অন্য উদ্দেশ্য সম্ভবে না। আদর্শ মনুষ্য আদর্শ কর্ম্মী।'

'আমি নিজে কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ধর্ম্ম-স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রূপক নহেন।'

'কৃষ্ণ স্বজীবনে দুইটি কার্য্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—"ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন এবং ধর্ম্মপ্রচার।"

যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করা কৃষ্ণের জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য। এই ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা কেন উপলব্ধ হইয়াছিল, কিরূপে 'ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান' ঘটিয়াছিল তাহা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে হইলে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাটা পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। পৌরাণিক আখ্যানাদির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তবে সে সকল অসম্পূর্ণ এবং নানারূপ অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশে অতিরঞ্জিত ও অস্পষ্ট।

কিন্তু মহাভারতের একস্থলেই তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন রাজগণের ও রাষ্ট্র-সমূহের অবস্থা অনেকটা বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাই, এবং সে বর্ণনা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত। তাহা অংশতঃ মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল। তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণ এবং ঋষিগণ ও ঋত্বিক্‌গণ সকলেই এ-বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির 'অপ্রমেয় মহাবাহু সর্ব্বলোকোত্তম' কৃষ্ণের সহিত

পরামর্শ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ, তিনি অবশ্য আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন'।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করা হইল। তিনি আসিলে যুধিষ্ঠির বলিলেন,— 'আমি রাজসূয়যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয় এমন নহে, যাহাতে উহা সম্পন্ন হয় তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য এবং যিনি সমুদয় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র। আমার অন্যান্য সুহৃদ্‌গণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদ্‌ঘোষণ করেন না, কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা যায় না। তুমি উক্ত প্রকার দোষ-রহিত এবং কামক্রোধবর্জ্জিত ; অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।'

যুধিষ্ঠির যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন তাহাই শুনিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিছু মিষ্ট কথার ভূমিকা করিয়া অপ্রিয় সত্য কথাটিই স্পষ্টতঃ বলিলেন,—সম্রাট্ ব্যতীত রাজসূয়যজ্ঞ অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে, আপনি ভারতের সম্রাট্ নহেন, এক্ষণে জরাসন্ধ ভারতের সম্রাট্।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হে মহারাজ আপনি সর্ব্বগুণে গুণবান্, অতএব রাজসূয়যজ্ঞ করা আপনার পক্ষে অবিধেয় নহে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি আপনাকে কিছু কহিতেছি, শ্রবণ করুন।...এক্ষণে মহীপতি জরাসন্ধ স্বীয় বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

পরাজিত করিয়া স্ববশে আনয়ন-পূর্ব্বক তাহাদের কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন। যে রাজা সকলের প্রভু এবং সমস্ত জগৎ যাঁহার হস্তগত, নিয়মানুসারে তিনিই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। প্রতাপশালী শিশুপাল মহীপতি জরাসন্ধের আশ্রয় লইয়া তাঁহার সেনাপতি হইয়াছেন। মায়াযোধী বীর্য্যবান্ করুষাধিপতি বক্র শিষ্যের ন্যায় তাঁহাকে সেবা করিতেছেন। মহাবল-পরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দন্তবক্র, করুষ, করভ ও মেঘবাহন তাঁহার বশীভূত হইয়াছেন। যিনি মুরু ও নবকদেশ শাসন করেন, আপনার পিতৃবন্ধু মহাবল পরাক্রান্ত যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত সতত তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিয়া থাকেন।

যিনি আপনার প্রতি অতিশয় স্নেহবান্, যিনি পশ্চিম-দক্ষিণভাগের অধিপতি,

সেই শত্রুনিসূদন কুন্তিবংশবর্দ্ধন আপনার মাতুল পুরুজিৎ জরাসন্ধের অনুগত। যে দুরাত্মা আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া মনে করে, যে মোহবশতঃ সতত আমার চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে ('আদত্তে সততং মোহাদ্ যঃ স চিহ্নঞ্চ মামকম্'), যে ভূমণ্ডলে বাসুদেব বলিয়া বিখ্যাত, সেই পরাক্রান্ত পৌণ্ড্রক এক্ষণে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যিনি পৃথিবীর চতুর্থাংশ ভোগ করিতেছেন, যিনি পাণ্ড্য, ক্রথ ও কৈশিক দেশ জয় করিয়াছেন, সেই শত্রুনিসূদন ভীষ্মকও তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। ভীষ্মক আমাদের আত্মীয়, কিন্তু তিনি জরাসন্ধের কীর্ত্তি শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া কি কুলাভিমান, কি বলাভিমান সমুদয় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন।

উত্তর দেশনিবাসী রাজগণ ও অষ্টাদশ ভোজকুল জরাসন্ধের ভয়ে পশ্চিম দিকে পলায়ন করিয়াছেন। শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাল্য, পটচ্চর, সুস্থল, মুকুট্ট, কুলিন্দ, কুন্তি, শালায়ন-বংশীয় নৃপতিগণ, দক্ষিণ পাঞ্চালস্থ ভূপতিগণ এবং পূর্ব্বকোশল নিবাসী রাজগণ সোদর ও অনুচরগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিম দিকে পলায়ন করিয়াছেন। মৎস্য এবং সন্নস্তপাদদেশীয় নরপতিগণও সাতিশয় ভীত হইয়া উত্তর দিক্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছেন। যাবতীয় পাঞ্চালদেশীয় মহীপতিগণ স্ব স্ব রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছেন।

কিয়ৎকাল হইল দুরাত্মা কংস স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত (অর্থাৎ পলাইবার নিমিত্ত) আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে জ্ঞাতিবর্গের হিত সাধনার্থ বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম। তাহাতে কংস-ভয় নিবারিত হইল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শত্রুনাশক মহাস্ত্রদ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রাম জরাসন্ধের সৈন্যবধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। এই হেতু আমরা স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। ঐ পশ্চিম দেশে রৈবতোপশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলী নাম্নী নগরীতে বাস করিতেছি। তথায় এরূপ দুর্গ সংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। ('স্ত্রিয়োঽপি যস্যাঃ যুদ্ধেয়ুঃ কিমু বৃষ্ণিমহারথাঃ')।

আপনি সম্রাট্‌তুল্য গুণশালী, অতএব আপনার সম্রাট্ হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনি কখনই রাজসূয়ানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। সে ক্রমে ক্রমে সমস্ত

ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া আপনার পুরে আনয়ন পূর্ব্বক বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। ঐ দুরাত্মা যড়শীতিজন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দ্দশ জনের অপ্রতুল আছে। ঐ চতুর্দ্দশ জন আনীত হইলেই ঐ নৃপাধম উহাদের সকলকেই এক কালে সংহার করিবে। বলি প্রদানার্থ মনোনীত ভূপতিগণ রুদ্রের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতি-গৃহে বাস করিয়া অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরাসন্ধের এই ক্রূর কর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন তাঁহার যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে এবং যিনি উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।

যদি আপনার রাজসূয়-যজ্ঞ করিবার মানস থাকে, তবে অগ্রে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক বদ্ধ ভূপালগণের মোচন ও দুরাত্মা জরাসন্ধের বধের নিমিত্ত যত্ন করুন; নচেৎ আপনি কোনক্রমেই রাজসূয় সম্পন্ন করিতে পারিবেন না। আমার এই মত, এক্ষণে আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত হয়, বলুন।"

—মভা, সভা, ১৩।১৪ অঃ

প্রাচীন ভারতের মানচিত্র সম্মুখে রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, তৎকালে ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এই সকল রাজ্যের অধিকাংশই জরাসন্ধের করায়ত্ত ছিল এবং তাঁহার সহিত মিত্রতা-পাশে বদ্ধ ছিল। পশ্চিম ভারতের মথুরায় অত্যাচারী কংস ছিল জরাসন্ধের জামাতা, শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিলে জরাসন্ধ অষ্টাদশবার মথুরা আক্রমণ করে, পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে যাদবগণ পশ্চিমসমুদ্রতীরে দ্বারকায় যাইয়া সুদৃঢ় দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করেন। উত্তর ভারতের পাঞ্চাল, কোশলাদি রাজ্যের রাজগণ পলায়ন করিয়া দক্ষিণ দিকে আশ্রয় লন। মধ্য-ভারতে চেদিরাজ্যে প্রবল পরাক্রান্ত শিশুপাল,

ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান

পূর্ব্বাঞ্চলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে (আসাম) ভগদত্ত, বঙ্গ ও পৌণ্ড্রদেশে (উত্তর বঙ্গ) বাসুদেব তাঁহার মিত্র ছিলেন। এই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিয়া আপনাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিতেন। কথিত আছে কুরুক্ষেত্রে ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়রাজগণ মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল ১৮ অক্ষৌহিণী, কিন্তু জরাসন্ধেরই সৈন্যসংখ্যা ছিল ২৩ অক্ষৌহিণী। এই দুর্দ্ধর্ষ আসুর শক্তি কেবল রাজ্যজয় নহে, আরও ভয়াবহ ক্রূর কার্য্যে সঙ্কল্পবদ্ধ ছিল। একশত রাজাকে পশুপতির নিকট বলিদান করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া ৮৬ জনকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, আর ১৪ জন আনীত হইলেই এই পাশবিক কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিত।

এই সকল অত্যাচারী রাজগণের উৎপীড়ন দমন করিবার যোগ্য প্রবল-পরাক্রান্ত কোন রাজশক্তি তৎকালে ছিল না। দেশে হাহাকার উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই পুরাণের আখ্যানে ধরিত্রীর রোদন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল রাজগণ দৈত্যস্বরূপ এবং তাহাদের অত্যাচারী সৈন্যবাহিনী ধরার ভার-স্বরূপ। একথা পুরাণেই স্পষ্ট উল্লিখিত আছে।—

'ধরা-ভার' কি

'ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥
গৌর্ভূত্বাঽশ্রুমুখী খিন্না রুদন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং স্বমবোচত॥' —ভাঃ ১০।১।১৪-১৭

—'দর্পিত রাজরূপধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সেনারূপ ভূরিভারে আক্রান্ত হইয়া অবনী ব্রহ্মার শরণ লইলেন; সেই খিন্না পৃথিবী, গাভীরূপ ধারণ করিয়া অশ্রুমুখী হইয়া, করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন।' ব্রহ্মা ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়া সমাহিত চিত্তে বেদমন্ত্রে জগন্নাথ দেবদেব ধর্ম্মপালক নারায়ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মা এক আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া কহিলেন—'নিবেদন করিবার পূর্ব্বেই ভগবান্ পৃথিবীর বিপদ্ বিদিত আছেন। পরম পুরুষ শীঘ্রই বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর ভার নাশ করিবেন।'

পৃথিবী অশ্রুমুখী

পৃথিবীর প্রায় অনুরূপ করুণ ক্রন্দন আমরা একালেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মহাবল হিট্‌লারের প্রবল প্রতাপে ইউরোপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজগণ কেহ কেহ পদানত ও অনেকে পলায়নপর হইয়া ইংলণ্ডাদি দেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। হিট্‌লার এবং মুসোলোনী, জাপানের সহিত যোগাযোগে সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল। ফলে, বিশ্বব্যাপী মহাসমর। ছয় বৎসর ব্যাপিয়া জলে স্থলে আকাশে অবিরত ভীষণ যুদ্ধাযুদ্ধির পর এই প্রচণ্ড আসুর শক্তি বিনষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত মদদৃপ্ত আসুরী শক্তিসমূহের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তিনি ইহাদিগকে বশীভূত বা নিহত করত রাজা যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্র করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

জরাসন্ধ ছিল তৎকালীন ভারতের হিট্‌লার। তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রস্তাবই হইল ইহাকে নিহত বা পরাজিত করিয়া কারারুদ্ধ রাজগণের উদ্ধার করা। কিন্তু

জরাসন্ধের অগণিত সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে সাফল্যলাভ করার সম্ভাবনা ছিল না, তাহাতে অযথা সৈন্যক্ষয় ও লোকক্ষয় হইত। এজন্য প্রস্তাব হইল শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন ছদ্মবেশে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া শেষে আত্ম-পরিচয় দিয়া তাহাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিবেন। দ্বৈরথ-যুদ্ধে আহূত হইলে কোন ক্ষত্রিয় যুদ্ধে বিমুখ হইতেন না।

জরাসন্ধ বধ ও রাজগণের উদ্ধারের পরামর্শ

কিন্তু তখন রাজা যুধিষ্ঠির আবার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে নারাজ। তিনি বলিলেন—'আমি সাম্রাজ্য লাভ করিবার আশায় কেবল সাহস মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক নিতান্ত স্বার্থপরায়ণের ন্যায় কি করিয়া তোমাদিগকে তথায় প্রেরণ করি? রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ একেবারে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ'।

কিন্তু রাজসূয় অপেক্ষাও আশু অধিক গুরুতর কর্ত্তব্য হইতেছে অবরুদ্ধ রাজগণকে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার করা। অর্জ্জুন বলিলেন—'জরাসন্ধের বিনাশ ও নৃপতিগণকে রক্ষা করা অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট কর্ম্ম হইতে পারে? যাহার ইহাতে অমত হয় তাহার কাষায় বসন পরিধানপূর্ব্বক বনে গমন করাই শ্রেয়ঃ'।

অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের বীরোচিত বাক্য

শ্রীকৃষ্ণেরও ঐ মত। অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"ভরতবংশজাত এবং কুন্তীগর্ভসম্ভূত ব্যক্তির যেরূপ বুদ্ধি হওয়া উচিত মহানুভব অর্জ্জুনে তাহাই সুস্পষ্ট দেখিতেছি। যখন মৃত্যু দিবাভাগে কি রজনীযোগে হইবে তাহার স্থির নাই, এবং কোন ব্যক্তি যুদ্ধ না করাতে অমর হইয়াছে, ইহাও কখন শুনি নাই; অতএব বিধানানুসারে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিয়া পরিতোষ লাভ করাই পুরুষের কার্য্য।"

পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শমতই কার্য্য হইল। শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন ব্রাহ্মণবেশে জরাসন্ধ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। জরাসন্ধ কহিলেন—'আমি যে কখনও তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের কোন অপকার করিয়াছি তাহা তো আমার স্মরণ হয়না, তবে তোমরা আমাকে শত্রু বলিয়া মনে করিতেছ কেন? তোমাদের ভ্রম হইয়া থাকিবে।'

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'নিরপরাধ অন্যান্য নৃপতিগণের প্রতি হিংসাচরণ করা কি রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম? তবে তুমি কি জন্য নৃপতিগণকে মহাদেবের নিকট উপহার প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ? আমাদিগকেও তোমার কৃত এই পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মাচারী ও ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ। আমরা কখনও নরবলি দেখি নাই। তুমি কি বলিয়া নরবলি প্রদানপূর্ব্বক ভগবান্ পশুপতির পূজা করিতে বাসনা করিয়াছ?

অধর্ম্মচারীর প্রতিরোধ না করিলে তাহার পাপের ভাগী হইতে হয়

রে বৃথামতি জরাসন্ধ! তোমা ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি সবর্ণের পশুসংজ্ঞা করিতে পারে? আমরা বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়। আমি বসুদেবনন্দন, আর এই দুইজন বীরপুরুষ পাণ্ডুতনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর। আমাদের তিনজনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, বল।'

জরাসন্ধ নীতিকথা শুনিবার বা নতি স্বীকার করিবার লোক নহেন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে বুঝা যায়, আবদ্ধ রাজগণকে মুক্তি দিলে ইঁহারা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেন না। জরাসন্ধ ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসে আরম্ভ হইয়া অনাহারে অবিশ্রান্ত ত্রয়োদশ দিবস দিবারাত্রি সমভাবে চলিয়াছিল। শেষে জরাসন্ধ ভীমসেনকর্ত্তৃক নিহত হন।

তৎপর পুরুষোত্তম কৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র ভয়ার্ত্ত সহদেবকে অভয় প্রদান করিয়া সানন্দে মগধরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বন্ধন-বিমুক্ত রাজাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্য-চিকীর্ষু ধার্ম্মিকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা। নৃপতিগণ 'তাহাই করিব' বলিয়া স্বীকার করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, জরাসন্ধের এই ক্রূরকর্ম্মে বাধা দিতে পারিলেই আপনার যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে (পৃঃ ১৩০), বাস্তবিক তাহাই হইল। জরাসন্ধের বিনাশ ও রাজগণের উদ্ধারের ফলে পাণ্ডবগণের প্রভাব প্রতিপত্তি সর্ব্বভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। পাণ্ডবগণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। জরাসন্ধ নিপাতিত হওয়াতে তাঁহার স্বপক্ষীয় মিত্ররাজগণ প্রায় সকলেই পাণ্ডবগণের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মহাসমারোহে রাজসূয়যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু একেবারে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নাই। ভীষ্মদেবের পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য প্রদান করাতে শিশুপাল তীব্র বিরোধিতা করেন এবং অন্যান্য রাজগণকে উত্তেজিত করেন। (পৃঃ ৪২)। ফলে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শিশুপাল বধ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উদ্দিষ্ট কার্য্য এখানেই শেষ হয় নাই। ইহা কেবল প্রথম অধ্যায়। যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যশ্রী তাঁহার জ্ঞাতিগণের অসহ্য হইল। দুর্য্যোধনের ঈর্ষানল প্রচণ্ডভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। কপট দ্যূতক্রীড়াচ্ছলে পাণ্ডবগণ নির্ব্বাসিত হইলেন। তাঁহাদের সাম্রাজ্য দুর্য্যোধন গ্রাস করিলেন। ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে যে রাজন্যবৃন্দ যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিলেন। প্রবল মিত্রপক্ষের সহায়তা লাভ করিয়া দুর্য্যোধন দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন, মৈত্রী স্থাপনের সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন,

সন্ধি হইবে না, তথাপি তিনি লৌকিক কর্ত্তব্যানুরোধে সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া স্বয়ং হস্তিনায় যাইয়া সন্ধি-স্থাপনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। হস্তিনাগমন কালে তিনি বলিয়াছিলেন, "পুরুষকার দ্বারা যতদূর সাধ্য আমি করিতে পারি, দৈবের উপর আমার হাত নাই।"

সে দৈব তো তিনিই। তিনি জানিতেন, এই মদদৃপ্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল না হইলে ভারতে ধর্ম্ম ও শান্তি-সংস্থাপন সম্ভবপর হইবে না। ক্ষাত্রতেজ ধর্ম্ম-সংযুক্ত না হইলে ভয়াবহ হইয়া উঠে। জগতে ধর্ম্ম ও শান্তি স্থাপনার্থ উদ্দাম আসুরী শক্তিসমূহ বিধ্বস্ত করা আবশ্যক হয়। তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভে আত্মীয়-স্বজনের নিধনাশঙ্কায় শোক-কাতর অর্জ্জুন অস্ত্রত্যাগে উদ্যত হইলে ক্ষত্রিয়োচিত তিরস্কার করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥
ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।—গীঃ ২।২-৩

—'হে অর্জ্জুন! এই সঙ্কট সময়ে অনার্য্যজনোচিত, স্বর্গহানিকর, অকীর্ত্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল? হে পার্থ, কাতর হইও না। এইরূপ পৌরুষহীনতা তোমাতে শোভা পায় না। হে পরন্তপ! তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে উত্থিত হও।'

অর্জ্জুন উপলক্ষ্যমাত্র, তিনিই সব করেন।

'নিরস্ত্র বসিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে।
সাধেন অম্লান মুখে ক্ষত্রিয়-বিনাশ ॥'

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপনান্তে ব্যাসদেবের প্রস্থানকালে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার পাদগ্রহণ করিয়া কহিলেন—'ভগবন্, দেবর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন, দিব্য, আন্তরীক্ষ ও পার্থিব এই ত্রিবিধ উৎপাত উপস্থিত হইবে, শিশুপালের পতন হওয়াতে কি সেই উৎপাত কাটিয়া গেল?' (সভা, ৪৫)

ব্যাসদেব কহিলেন—'হে রাজন্, সেই ত্রিবিধ উৎপাত ত্রয়োদশ বৎসর ব্যাপিয়া হইবে। দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বলে তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। যাহা হউক; তুমি চিন্তিত হইও না, কারণ, **কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।** তোমার মঙ্গল হউক।

এই কাল আর কে ?—তিনিই। কুরুক্ষেত্রে তিনি লোকক্ষয়কারী মহাকাল। অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ-প্রদর্শনচ্ছলে সেই কাল-রূপ প্রকট করিয়াছিলেন। সে কি ভীষণ দৃশ্য! অর্জ্জুন দেখিতেছেন, ভীষ্ম দ্রোণাদি সেনানায়কগণ যাবতীয় যোদ্ধৃবর্গসহ অগ্নিতে পতঙ্গকুলের ন্যায় দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া সেই বিরাট বিশ্বমূর্ত্তির করালকবলে প্রবেশ করিতেছে। কাহারও কাহারও মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং উহা তাঁহার দন্তসন্ধিতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে দেখা যাইতেছে।—

কুরুক্ষেত্রে তিনি লোকক্ষয়কারী কাল

'যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ।
কেচিৎ বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥'—গীঃ ১১।২৯।২৭

এই ভয়াবহ দৃশ্য দর্শন করিয়া অর্জ্জুন ভীতকম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলেন—"হে দেববর, উগ্রমূর্ত্তি আপনি কে, আমাকে বলুন, আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়াছি; আপনাকে প্রণাম করি, প্রসন্ন হউন। আপনার এই সংহারমূর্ত্তি দেখিয়া আমি বুঝিতেছিনা, আপনি কে, কি কার্য্যে প্রবৃত্ত।" তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন—"আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল, আমি এখন সংহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে কেহই জীবিত থাকিবে না। বস্তুতঃ আমি সকলকেই নিহত করিয়া রাখিয়াছি। তুমি এখন নিমিত্ত মাত্র হও।"—

'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।'
'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।'—গীঃ ১১।৩২।৩৩

কুরুক্ষেত্রে ভারতের ক্ষত্রিয়কুল প্রায় সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। অবশিষ্ট ছিল যাদবগণ, ইহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বজন। কিন্তু ইহারাও নিতান্ত কুক্রিয়াসক্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা এতদূর পানাসক্ত ছিল যে, কৃষ্ণ ও বলরাম আদেশ দিয়াছিলেন যে দ্বারকায় কেহ মদ্য প্রস্তুত করিতে পারিবে না। ইহারা বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক আদি বিভিন্ন বংশ-সম্ভূত ছিল এবং পরস্পর ঘোরতর বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ছিল।

ইহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। পুরাণে কথিত আছে, ইহা ব্রহ্মশাপের ফল। ইহাদিগকে সংযত করা শ্রীকৃষ্ণেরও সাধ্য ছিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ যদুকুল ধ্বংস করিবার বাসনায় ইহাদের সকলকে প্রভাসতীর্থে যাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা প্রভাসে আসিয়া মদ্যপান করিয়া নানারূপ উৎসব করিতে লাগিল, পরে কলহ আরম্ভ করিল, শেষে পরস্পরকে হতাহত করিতে করিতে সকলেই

ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়, তিনি নিবারণ করিলেন না, বরং কিছু আনুকূল্যই করিয়াছিলেন এইরূপ মহাভারতে উক্ত আছে।—

'নিবারিতে নারি, কেন নিবারিব আমি,
নহি যাদবের, আমি জগতের স্বামী।'

'তাঁহার আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেহ নাই। যদু-বংশীয়েরা যখন অধার্ম্মিক হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের দণ্ড এবং প্রয়োজনীয় স্থলে বিনাশসাধনই তাঁহার কর্ত্তব্য। যিনি জরাসন্ধ প্রভৃতিকে অধর্ম্মাত্মা বলিয়াই বিনষ্ট করিলেন, তিনি যাদবগণকে অধর্ম্মাত্মা দেখিয়া তাহাদিগকে যদি বিনষ্ট না করেন, তবে তিনি ধর্ম্মের বন্ধু নহেন, আত্মীয়গণের বন্ধু, আপনার বন্ধু ; ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহেন, আপনার পক্ষপাতী, বংশের পক্ষপাতী। আদর্শ ধর্ম্মাত্মা তাহা হইতে পারে না, কৃষ্ণ তাহা হয়েন নাই।'—বঙ্কিমচন্দ্র।

প্রঃ। কিন্তু এই সব ধ্বংসলীলা না করিয়া কি ধর্ম্মের গ্লানি দূর করা যায় না? 'সত্য বটে, পাপীকে জগতে রাখিলে জগতের মঙ্গল নাই, কিন্তু তাহার বধ-সাধনই কি জগৎ-উদ্ধারের একমাত্র উপায়? পাপীকে পাপ হইতে বিরত করিয়া, ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া, জগতের এবং পাপীর উভয়ের মঙ্গল এককালে সিদ্ধ করা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় নহে কি? যিশু, শাক্যসিংহ ও শ্রীচৈতন্য এইরূপে পাপীর উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।'

উঃ। শ্রীকৃষ্ণেও সে গুণের অভাব নাই। তিনি দয়াময়, প্রেমময়, কারুণ্যের আধার। তাঁহার সে প্রেম-লীলা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তবে ক্ষেত্রভেদে ফলভেদ হয়। তিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন, জরাসন্ধকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—রাজগণকে মুক্তি দিলে যুদ্ধ করিবনা, যাদবগণকে সৎপথে আনিবার জন্য সতত সচেষ্ট ছিলেন, দুর্য্যোধন-কর্ণাদিকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সন্ধির প্রস্তাব লইয়া স্বয়ং হস্তিনাপুরে যাইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকালে ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন—ইহারা কালপক্ব, অর্থাৎ কালের গতিতে পাকিয়া উঠিয়াছে এখন ঝড়িয়া পড়িবে। শ্রীকৃষ্ণও তাহা জানিতেন, তথাপি লৌকিক কর্ত্তব্যানুরোধে এ-সকল ধ্বংসলীলা নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যিশু, বুদ্ধাদি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোপদেষ্টা, আমাদের শাস্ত্রে তাঁহাদিগকেও অবতার বলা হয়। কিন্তু তাঁহারা অংশাবতার, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর ('কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—ভাঃ)। তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের তুলনা চলে না। যিনি ঈশ্বর তিনি কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তাও তিনি। পালনের জন্যই সংহারও করিতে হয়। বস্তুতঃ সৃষ্টি ও বিনাশ, জন্ম ও মৃত্যু, এক বস্তুরই দুই দিক্, এক মুদ্রারই দুই পিঠ। জগতে

প্রতিনিয়ত অসংখ্য জীব জন্মিতেছে। ঐ সকল জীব মরিয়াছে বলিয়াই পুনরায় জন্মিতেছে, নূতন কিছু জন্মে না, কেবল দেহ পরিবর্ত্তন হয়, এই হেতু আমাদের শাস্ত্রে মৃত্যুকে বলে দেহান্তরপ্রাপ্তি। দেহান্তরপ্রাপ্তি বলিতে তো বিনাশ বুঝায় না, অন্যদেহ-গ্রহণ বুঝায়। তথাপি আমরা মৃত্যুচিন্তায় আতঙ্কিত হই; ইহার কারণ, আমরা আমাদের এই পঞ্চভূতময় দেহটাকে 'আমি'র সঙ্গে যোগ করিয়া দেই, এবং দেহের বিনাশেই 'আমি' গেলাম এই চিন্তায় অস্থির হই। কিন্তু 'আমি' বা আত্মার মৃত্যু নাই। উহা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়, যে পর্য্যন্ত না পরমাত্মার বা শ্রীকৃষ্ণের সামীপ্য বা সাযুজ্য লাভ করে। এইজন্য পুরাণকারগণ নানা আখ্যানে বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে স্বহস্তে সংহার করেন, সে ভাগ্যবান্, সে শ্রীকৃষ্ণকেই পায়, তাহার পুনর্জন্ম হয় না।

সে যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, এই ধ্বংসলীলা বা সংহার ব্যাপারটা আমরা যেভাবে দেখি, সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সৃষ্টির রক্ষাকর্ত্তা যিনি, তিনি সেভাবে দেখেন না। এক জীব অন্য জীবকে সংহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। আমরা খাদ্যের সহিত, পানীয়ের সহিত দৃশ্য-অদৃশ্য কত শত জীব উদরস্থ করিতেছি, নিঃশ্বাসের সহিত কত অদৃশ্য জীব নাসাপথে প্রেরণ করিতেছি। যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না তাঁহারা বলেন, উহাই প্রকৃতির নিয়ম, প্রকৃতি নির্ম্মম।

সৃষ্টি-রক্ষার জন্য সংহারও আবশ্যক

যাঁহারা ঈশ্বর মানেন, তাঁহারা বলিবেন, উহা ঈশ্বরেরই নিয়ম—'ধ্বংসনীতি বিধাতার'—সৃষ্টিরক্ষার জন্য, লোকরক্ষার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে ঈশ্বরও লোক-সংহার করিবেন, লোকক্ষয়কারী কালরূপ প্রকট করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতাগ্রন্থে বলিয়াছেন—জগতে দৈব ও আসুর, এই দুই প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হয় ('দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ'—গীঃ ১৬৷৬)। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি দৈবী প্রকৃতির লক্ষণ (গীঃ ১৬৷১-৩); দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, ক্রূরতা, অসত্য, অজ্ঞান ইত্যাদি আসুরী প্রকৃতির লক্ষণ (গীঃ ১৬৷৪—১৮)। এই সকল অহিতকারী, ক্রূরকর্ম্মা ব্যক্তি জগতের বিনাশের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ('প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ'—গী ১৬৷৯)।

দৈবী ও আসুরী প্রকৃতি

এই বিকৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অনেক সময় এত উগ্র হইয়া উঠে যে কোনরূপ হিতোপদেশ গ্রাহ্য করে না এবং উপদেষ্টারই অনিষ্ট করিতে উদ্যত হয়। দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকেই বন্ধন করিতে ষড়যন্ত্র করে। তখন ইহাদের বিনাশ ব্যতীত লোকরক্ষা হয় না।

যিশুখ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন—বামগণ্ডে চপেটাঘাত করিলে দক্ষিণগণ্ড ফিরাইয়া দিও। ইহাই খ্রীষ্টীয় আদর্শ (Christian Ideal)। সর্ব্বাবস্থায়ই, এমন কি প্রাণনাশে উদ্যত শত্রুর প্রতিও অহিংসা, দয়া, ক্ষমা প্রদর্শন কর্ত্তব্য, ইহাই খ্রীষ্টীয় আদর্শের মূল কথা। ইহা অতি উচ্চ আদর্শ সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই কি মনুষ্যত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ? এ-সম্বন্ধে মহামনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র যে সারগর্ভ সমালোচনা করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর, ধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন জন্যই তাঁহার অবতার, মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ একমাত্র ঈশ্বরই হইতে পারেন, আর সকল আদর্শই অপূর্ণ। সেই পূর্ণ আদর্শ যাহাতে মনুষ্যে অনুসরণ করিতে পারে, এই হেতু তিনি মানুষী শক্তিদ্বারাই কর্ম্ম করিয়াছেন, ঐশী শক্তির আশ্রয় লন নাই। সুতরাং আদর্শ-মনুষ্যরূপেই বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ-চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুখ্রীষ্ট

'খ্রীষ্ট পতিতোদ্ধারী, কোন দুরাত্মাকে তিনি প্রাণে নষ্ট করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও রাখিতেন না। শাক্যসিংহে বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দেখিতে পাই। এজন্য ইহাদিগকে আমরা আদর্শ-পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু কৃষ্ণ পতিতপাবন নাম ধরিয়াও, প্রধানতঃ পতিত-নিপাতী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত। সুতরাং তাঁহাকে আদর্শ-পুরুষ বলিয়া আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের একটা কথা বিচার করিয়া দেখা উচিত। এই Christian Ideal কি যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ? সকল জাতির জাতীয় আদর্শ কি সম্পূর্ণ সেইরূপ হইবে?

হিন্দুর জাতীয় আদর্শ শ্রীকৃষ্ণে

"এ প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে—হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে নাকি! Hindu Ideal আছে নাকি? যদি থাকে তবে কে? কেহ হয় তো বলিয়া বসিবেন, "ও ছাই-ভস্ম নাই।" নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন? কিন্তু একদিন ছিল। তখন হিন্দুই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। সে আদর্শ হিন্দু কে? রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শ-প্রতিমার নিকটবর্ত্তী, কিন্তু যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ—খ্রীষ্ট প্রভৃতিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

কেন, তাহা বলিতেছি। মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। যাঁহাতে সে সকলের চরম স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুষ্য। খ্রীষ্টে তাহা নাই, শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে। যিশুকে যদি রোমক সম্রাট্ য়িহুদার শাসন-

কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না—কেননা, রাজকার্য্যের জন্য যে সকল বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয় তাহা তাঁহার অনুশীলিত হয় নাই; অথচ এরূপ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ, তাহা প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভূরি ভূরি বর্ণিত হইয়াছেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়াও প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন—জরাসন্ধের বন্দিগণের মুক্তি তাহার এক উদাহরণ। পুনশ্চ মনে কর, যদি য়িহুদিরা রোমকের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জন্য উত্থিত হইয়া, যিশুকে সেনাপতিত্বে বরণ করিত, যিশু কি করিতেন? যুদ্ধে তাঁহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। "কাইসরের পাওনা কাইসরকে দাও" বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন। কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশূন্য—কিন্তু ধর্ম্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি অজেয় ছিলেন। যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য—Christian Ideal অপেক্ষা Hindu Ideal শ্রেষ্ঠ।

লোক চরিত্রভেদে, অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অধিকারী; আদর্শ মনুষ্য, সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই হেতু শ্রীকৃষ্ণের, শাক্যসিংহাদির ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করা অসম্ভব। কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী ও ধর্ম্ম-প্রচারক। সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, ধর্ম্মবেত্তাদিগের, তপস্বীদিগের এবং একাধারে সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ। যিনি এইরূপ একাধারে পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্য্যে ও শিক্ষায়, কর্ম্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্ম্মে, দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্যরূপেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ-পুরুষ। জরাসন্ধাদির বধ আদর্শ রাজপুরুষ ও দণ্ডপ্রণেতার অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ইহাই Hindu Ideal, অসম্পূর্ণ যে ধর্ম্ম তাহার আদর্শ-পুরুষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া, সম্পূর্ণ যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহার আদর্শ-পুরুষকে আমরা বুঝিতে পারিব না।

কিন্তু বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে। লোকের চিত্ত হইতে সেই প্রাচীন আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে আদর্শ-পুরুষ সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ, এখনকার হিন্দু সর্ব্বকর্ম্মে অকর্ম্মা। যে দিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল, যে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি।

এখন আবার সেই আদর্শ-পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগ্রত করিতে হইবে। ভরসা করি, এই কৃষ্ণ চরিত্রের ব্যাখ্যায় সে কার্য্যে কিছু সাহায্য হইতে পারিবে।"

অহিংসনীতি ও ধর্ম্ম্য যুদ্ধ

প্রঃ। বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে খ্রীষ্টীয় আদর্শ বলিলেন, যিশুখ্রীষ্টের উপদিষ্ট ক্ষমা ও অহিংসনীতি, যাহা মহাত্মা গান্ধী ইদানীং একনিষ্ঠভাবে প্রচার করিয়াছেন, তাহাকে তো হিন্দু আদর্শও বলা যায়। অহিংসা, অক্রোধ, অদ্রোহ, ক্ষমাধর্ম্মের উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই দেখা যায়। সর্ব্বশাস্ত্রসার মহাভারতে এ রকম ভূরি ভূরি উপদেশ আছে—

'ন চাপি বৈরং বৈরেণ কেশব ব্যুপশাম্যতি'—মভা, উদ্যো ৭২।৬৩ ;
'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ'—বিদুর বাক্য ;
'ন পাপে প্রতিপাপং স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ'—মভা, বন ;
'ধর্ম্মেণ নিধনং শ্রেয়ঃ ন জয়ঃ পাপকর্ম্মণা'—মভা, শাং ৯৫।১৬।

এ সকল কথার মর্ম্ম এই যে, শত্রুকে প্রীতি দ্বারা, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা, হিংসুককে অহিংসা দ্বারা, জয় করিবে। শত্রুর সহিত শত্রুতাচরণ করিবে, এ উপদেশ কোথায় ?

উঃ। তাহাও আছে, বহু স্থলে। শান্তি পর্ব্বে ভীষ্মদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মতত্ত্ব এইরূপ বলিতেছেন—'যস্মিন্ যথা বর্ত্ততে যো মনুষ্যস্তস্মিংস্তথা বর্ত্তিতব্যং স ধর্ম্মঃ'—তোমার সহিত যে যেরূপ ব্যবহার করে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই ধর্ম্মনীতি,—যেমন দুর্য্যোধনাদি, তাহাদের প্রতি হিংসানীতিই অবলম্বনীয়, উহাই সে-স্থলে ধর্ম্ম, নচেৎ লোকরক্ষা হয় না। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ পৌত্র বলিকে উপদেশ দিতেছেন—'ন শ্রেয়ঃ সততং তেজঃ ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা, তস্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত পণ্ডিতৈরপবর্জ্জিতা' (মভা, বন, ২৮।৬।৮)—সর্ব্বদাই তেজ বা ক্ষমা করাটা শ্রেয়স্কর নহে, অবস্থানুসারে ব্যবস্থা, সর্ব্বাবস্থায়ই ক্ষমা করাটা পণ্ডিতেরা মন্দ বলিয়া থাকেন। বীরনারী বিদুলা, শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত অথচ প্রতিকারে পরাঙ্মুখ নিরুদ্যম পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন—

অহিংসা সম্বন্ধে দ্বিবিধ মত

'উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ মা স্বাপ্সীঃ শত্রুনির্জ্জিতঃ', 'ক্ষমাবন্নিরমর্ষশ্চ নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্'—হে কাপুরুষ, শত্রুনির্জ্জিত হইয়া আর শয়নে থাকিও না, উঠ ; যে নিয়ত ক্ষমাশীল, নির্জ্জিত হইয়াও যে ক্রুদ্ধ হয় না, প্রতিকার করে না, সে স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়, (অর্থাৎ ক্লীব)—মভা, উদ্যোঃ, ১৩৪।১২।৩৩। অন্যত্র মহাভারত দ্রৌপদীর মুখে বলিতেছেন,—

'যথাবধ্যে বধ্যমানে ভবেদ্দোষো জনার্দ্দন।
স বধ্যস্যাবধে দৃষ্ট ইতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥' মভা, উদ্যোঃ, ৮২।১৮

—ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল কথা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে বুঝা যাইবে শ্রীকৃষ্ণেরও এই মত। অথচ মহাভারতেই শ্রীকৃষ্ণেরই স্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে—

'প্রাণিনামবধস্তাত সর্ব্বজ্যায়ান্মতো মম'—মভা, কর্ণ, ৬৯।২৩

—'প্রাণিবধ না করাই আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম অর্থাৎ অহিংসা পরম ধর্ম্ম।'

'নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব'—গীঃ ১১।৫৫

—'যিনি সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর অর্থাৎ যাহার কাহারও প্রতি বৈরভাব নাই, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।'

অথচ তিনি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রেরণা দিয়াছেন, নিজেও যুদ্ধ করিয়াছেন, শিশুপালাদিকে বধ করিয়াছেন। এ সমস্যার মীমাংসা কি?

শ্রীকৃষ্ণ-কথিত ধর্ম্মতত্ত্ব

মীমাংসাও শ্রীকৃষ্ণবাক্যেই আছে। মহাভারতের একটি আখ্যানে শ্রীকৃষ্ণমুখে সূক্ষ্ম ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহা বলিতেছি—

রাজা যুধিষ্ঠির মহাবীর কর্ণের শর-নিকরে ক্ষত-বিক্ষত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া পড়িলে নকুল ও সহদেব তাঁহাকে শিবিরে লইয়া গেলেন। সেই সময় অর্জ্জুন অশ্বত্থামার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া কর্ণের দিকে ধাবিত হইতেছেন, এমন সময় ভীমসেন বলিলেন,—"ধর্ম্মরাজ কর্ণের শর-নিকরে নিপীড়িত হইয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, এখন তিনি জীবিত আছেন কিনা সন্দেহ।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণসহ রাজাকে দেখিবার জন্য শিবিরে গেলেন। যুধিষ্ঠির শয়ান ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র, হর্ষগদ্গদবচনে হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন—"তোমাদের মঙ্গল ত? আজ আমি তোমাদের দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলাম। তোমরা অক্ষত শরীরে নিরুপদ্রবে কর্ণকে নিহত করিয়াছ। এই ত্রয়োদশ বৎসর কর্ণভয়ে দিবারাত্রি আমার কখনও সুনিদ্রা হয় নাই। কিরূপে কর্ণকে বিনাশ করিব এই চিন্তায় আমি সতত উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমি বিনিদ্র অবস্থায়ও কর্ণকেই স্বপ্ন দেখিতাম। আমি এতাবৎ কাল তোমাদের আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতেছিলাম। কিরূপে তাহাকে সংহার করিলে, বল, বল।"

রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বাপরই কর্ণভয়ে আতঙ্কিত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র ভরসা অর্জ্জুন। অর্জ্জুনও কর্ণবধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণশরে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া শয্যায় শায়িত হইয়াও অর্দ্ধ-নিদ্রিতাবস্থায় অর্জ্জুন-কর্তৃক কর্ণবধই চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দেখিয়াই মনে মনে স্থির করিলেন, অর্জ্জুন কর্ণকে বধ করিয়াই সংবাদ দিতে আসিয়াছে। এই হেতুই হাস্যমুখে তাঁহার এই স্বপ্নদৃষ্টবৎ প্রশ্ন।

ইহাতে অর্জ্জুন কিছু বিব্রত হইয়া উত্তর করিলেন—"ভীষণ শঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কর্ণ ও অশ্বত্থামা অবিরত আমাদের সেনানায়ক ও সৈন্যগণকে হতাহত করিতেছে। আমি ঘোরতর যুদ্ধে অশ্বত্থামাকে পরাভূত করিয়া কর্ণকে আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম আপনি গুরুতররূপে আহত হইয়া শিবিরে আসিয়াছেন। তাই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি। এক্ষণই আমি কর্ণের দিকে ধাবিত হইতেছি। আমি সমুদয় সৈন্যসহ সূতপুত্রকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই। আজ যদি আমি বন্ধুবান্ধব সহিত কর্ণকে বিনাশ না করি তবে প্রতিজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ ব্যক্তির যে গতি আমারও যেন সেই গতি লাভ হয়।"

রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণবধ হইয়াছে ভাবিয়া হর্ষান্বিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কর্ণ জীবিত আছে এই কথা অর্জ্জুনমুখে শ্রবণ করিয়া হতাশ হইয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনকে নিতান্ত অসঙ্গতরূপে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন—'তুমি কর্ণকে সংহার না করিয়া ভীত মনে ভীমকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট আসিয়াছ। এখন বুঝিলাম, আর্য্যা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করা তোমার নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। তুমি আমার নিকট সত্য করিয়াছিলে—"আমি একাকীই কর্ণকে বিনাশ করিব"—এখন তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? এক্ষণে তুমি বাসুদেবকে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর। তোমার গাণ্ডীবে ধিক্, বাহুবীর্য্যে ধিক্।"

যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণমাত্র অর্জ্জুন রোষাবিষ্ট হইয়া সত্বর অসি গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—'এ কি! তুমি অসি গ্রহণ করিলে কেন? কাহাকে বধ করিবে? এখানে ত তোমার বধার্হ কেহ নাই।'

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে জনার্দ্দন, 'তুমি অন্যকে গাণ্ডীব শরাসন সমর্পণ কর' এই কথা যিনি আমাকে কহিলেন, আমি তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিব, ইহাই আমার উপাংশুব্রত (গুপ্ত প্রতিজ্ঞা)। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমাকে সেই কথা কহিয়াছেন। অতএব আমি এই ধর্ম্মভীরু নরপতিকে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন ও সত্যের আনৃণ্য লাভ করিয়া নিশ্চিত হইব। আমার খড়্গ গ্রহণের ইহাই কারণ। তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য?"

এই বিবরণ সত্য হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, ক্ষত্রিয়গণ যতই সদ্‌গুণশালী হউক না কেন, ক্ষাত্র-স্বভাবজ একটি দোষ তাঁহারা কিছুতেই পরিহার করিতে পারেন না। তাঁহারা হঠকারী ও হঠাৎক্রোধী, যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। যাহা হউক, অর্জ্জুনের প্রশ্ন এই, সত্যরক্ষার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা কর্ত্তব্য কিনা। সকলেই বলিবেন যে অর্জ্জুনের প্রশ্নটা নিতান্ত মূঢ় ও মূর্খের মতো হইল, অর্জ্জুনের মতো নহে। শ্রীকৃষ্ণও তাহাই বলিলেন। এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে সত্য ও অহিংসা সম্বন্ধে তিনি যে অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ দিলেন তাহাই সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি—

'মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনের বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে বারংবার ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন—"হে ধনঞ্জয়, তোমাকে রোষপরবশ দেখিয়া নিশ্চয় জানিলাম, তুমি যথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই। তুমি ধর্ম্মভীরু, কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক্ অবগত নহ। আজি তোমাকে এরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া মূর্খ বলিয়া বোধ হইতেছে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্ণয় করা অনায়াসসাধ্য নহে। তুমি যখন মোহবশতঃ ধর্ম্মরক্ষা মানসে প্রাণিবধরূপ মহাপাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই।

আমার মতে, অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। বরং মিথ্যাকথাও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্ত্তব্য নহে।—

প্রাণিনামবধস্তাত সর্ব্বজ্যায়ান্মতো মম।
অনৃতাং বা বদেদ্বাচং ন তু হিংস্যাৎ কথঞ্চন॥—মভা, কর্ণ, ৬৯। ২৩

তুমি কিরূপে প্রকৃত পুরুষের ন্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ-সংহারে উদ্যত হইলে? পূর্ব্বে তুমি বালকত্ব-প্রযুক্ত এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছ এবং এক্ষণে মূর্খতাবশতঃ অধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ। তুমি অতি দুর্জ্জেয় সূক্ষ্মতর ধর্ম্মরহস্য অবগত নহ, তাহা শ্রবণ কর।—

"সাধু ব্যক্তিই সত্যকথা কহিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই ('ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্')। সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সত্য-তত্ত্ব অতি দুর্জ্জেয়; যে স্থলে মিথ্যা সত্যস্বরূপ ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। যে সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম্ম অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে সমুদ্যত হয় সে নিতান্ত বালক, আর যিনি সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম্ম জানেন, তিনি যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ।"

সত্য-অসত্যের বিশেষ মর্ম্ম কি অর্থাৎ সত্য কখন মিথ্যাস্বরূপ হয় এবং মিথ্যা কখন সত্যস্বরূপ হয় তাহা বুঝাইবার জন্য বলাক ও কৌশিকের বৃত্তান্ত শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শুনাইলেন।

বাসুদেব কহিলেন,—হে অর্জ্জুন, পূর্ব্বকালে বলাক নামে এক সত্যবাদী অসূয়াশূন্য ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতামাতা ও আশ্রিতদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত মৃগ বিনাশ করিত। একদা ঐ ব্যাধ মৃগয়ায় গমন করিয়া কুত্রাপি মৃগ প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে এক অপূর্ব্ব নেত্রবিহীন শ্বাপদ তাহার নয়নগোচর হইল। ব্যাধ উহাকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিল। তখন সেই অন্ধ শ্বাপদ নিহত হইবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল। এই হিংস্র জন্তুটি তপঃপ্রভাবে বর লাভ করিয়া বহু প্রাণীর বিনাশহেতু হওয়াতে বিধাতা উহাকে অন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে ঘ্রাণদ্বারা দূরস্থ বস্তুও অবগত হইতে পারিত। বলাক সেই ভূতনাশক প্রাণীটি বিনাশ করিয়া অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিল। অতএব ধর্ম্মের মর্ম্ম অতি দুর্জ্ঞেয়।

বলাক ব্যাধের দৃষ্টান্ত

আর দেখ, কৌশিক নামে এক বেদপারগ তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বন করিয়া তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। কৌশিক ব্রাহ্মণ তাহা দেখিলেন। দস্যুগণ তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণের নিকট আগমন করিয়া কহিল—ভগবন্, কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিল যদি আপনি অবগত থাকেন তবে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক এরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য-পালনার্থ তাহাদিগকে কহিলেন—কতকগুলি লোক ঐ ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তখন দস্যুগণ তাহাদের আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।

কৌশিক ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে দুইটি সাধারণ সূত্র বলিলেন—

১। অহিংসা পরম ধর্ম্ম।

২। সত্যই পরম ধর্ম্ম।

তৎপর বলাক-ব্যাধ ও কৌশিক ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইলেন যে স্থলবিশেষে **হিংসাও ধর্ম্ম হয়, এবং সত্যও অধর্ম্ম হয়।** পূর্ব্বে এইজন্যই বলিয়াছেন, সত্য ও অসত্য, হিংসা ও অহিংসা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা সহজ নহে।

এক্ষণে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ের মূলসূত্র কি তাহাই বলিতেছেন; —"হে ধনঞ্জয়, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব-নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হয়। অনেকে শ্রুতিকে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদয় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এই জন্য অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়।"

সত্য ও অহিংসা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মোপদেশ

'ইহা অপেক্ষা উদার ইউরোপেও কিছু নাই। এই কথাটা লইয়া আজিও সভ্যজগতে বড় গোলমাল। যাঁহারা বলেন যে যাহা দৈবোক্তি—বেদই হউক, বাইবেলই হউক, কি অন্য ধর্ম্মগ্রন্থই হউক, তাহাতে যাহা আছে তাহাই ধর্ম্ম—তাহার বাহিরে ধর্ম্ম কিছু নাই, তাঁহারা আজিও বড় বলবান্। তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম দৈবোক্তি-নির্দ্দিষ্ট (Revelation), অনুমানের বিষয় নহে। এ-কথা মনুষ্য জাতির উন্নতির পথে বড় দুরুত্তীর্য্য কণ্টক। আমাদের দেশের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপেও আজিও এই মত উন্নতির পথ রোধ করিতেছে। আমাদের দেশের অবনতির ইহা একটি প্রধান কারণ। আজিও ভারতবর্ষের ধর্ম্মজ্ঞান, বেদ ও মনু-যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতিদ্বারা নিরুদ্ধ, অনুমানের পথ নিষিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ লোকোন্নতির এই বিষম ব্যাঘাত সেই অতি প্রাচীন কালেও দেখিয়াছিলেন, এখন হিন্দু সমাজের ধর্ম্মজ্ঞান দেখিয়া বিষণ্ণ মনে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইতে ইচ্ছা করে।'—বঙ্কিমচন্দ্র।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য

কিন্তু অনুমানেরও একটা ভিত্তি চাই। এমন একটা লক্ষণ থাকা চাই যাহা দেখিলেই বুঝিতে পারি এই কর্ম্মটি ধর্ম্ম বটে। শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে সেই লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন—'ধর্ম্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম।'

'ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুঃ ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥'—সভা কর্ণ, ৬৯

পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণ-কথিত ধর্ম্ম-নীতির স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, সত্য, অহিংসা, দান, তপ ইত্যাদি অনেক কর্ম্মই ধর্ম্ম বলা যায়। তন্মধ্যে সত্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এরূপও বলা হয়। কিন্তু এ সকলই স্থলবিশেষে অধর্ম্মও হইতে পারে, অনুপযুক্ত প্রয়োগে ধর্ম্মও অধর্ম্ম হয়। তাহা নির্ণয় করিবার কষ্টি-পাথর হইতেছে, যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম্ম।

পরে শ্রীকৃষ্ণ ইহাই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন—"যদি কেহ কাহাকেও বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত

ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করা উচিত। যদি বাধ্য হইয়া একান্তই কথা কহিতে হয় তবে সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ হয়।

যেস্থলে মিথ্যা শপথদ্বারাও চোর-দস্যুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ হয়, সেস্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ, সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয়।"

স্থূল কথা—যাহা লোকহিতকর, তাহাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মার্থে মিথ্যা কথা বলিলেও, কিংবা হিংসা করিলেও পাপভাগী হইতে হয় না। 'যাহা দ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম, আমরা যদি ভক্তি-সহকারে এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দুধর্ম্মের মূল-স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহা হইলে যে উপধর্ম্মের ভস্মরাশির মধ্যে পবিত্র ও জগতে অতুল্য হিন্দু ধর্ম্ম প্রোথিত হইয়া আছে, তাহা অনল্পকালে কোথায় উড়িয়া যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্রিয়া, অনর্থক সামর্থ্যব্যয় ও নিষ্ফল কালাতিপাত দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সৎকর্ম্ম ও সদনুষ্ঠানে হিন্দুসমাজ প্রভাবান্বিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি মারামারি, পরস্পরের বিদ্বেষ ও অনিষ্ট চেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহতী কৃষ্ণ-কথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া শূলপাণি ও রঘুনন্দনের পদানত—লোকহিত পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ত্ব ও মলমাসের কচকচিতে মন্ত্রমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে তো কোন্ জাতি অধঃপাতে যাইবে? যদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একত্র হইয়া **"নমো ভগবতে বাসুদেবায়" বলিয়া কৃষ্ণ পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া তদুপদিষ্ট এই লোক-হিতাত্মক ধর্ম্ম গ্রহণ করিব ॥** তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে পারিব।'

মহতী কৃষ্ণ-কথিতা নীতি

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ও লৌকিক হিন্দুধর্ম্মের অবস্থা ও অধোগতি লক্ষ্য করিলে সকলেই মহামনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রের এই সারগর্ভ উক্তির গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও লোকরক্ষার উদ্দেশ্যে যে সকল বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই শাস্ত্র। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে শাস্ত্রের অনুসরণই কর্ত্তব্য, ইহাও শ্রীকৃষ্ণেরই উক্তি (গীঃ ১৬।২৪)। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, বেদে ও বেদমূল স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে সকল বিধি নাই, থাকিতেও পারে না। অবস্থাবিশেষে বিশেষ ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হয়। আবার, কালের গতিতে সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, সুতরাং শাস্ত্র-ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। সেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হইতেছে লোকহিত। যাহা প্রাণিগণের হিতকর, সমাজের হিতকর, তাহাই কর্ত্তব্য। অন্ধের ন্যায় শাস্ত্রানুসরণে সমাজের ক্ষতি ও বিনাশ।

অন্ধভাবে শাস্ত্রানুসরণে সমাজের ক্ষতি

প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণে বিভক্ত ছিল এবং বর্ণভেদ ব্যক্তিগত ও গুণগত ছিল। এই বর্ণ-বিভাগ সেকালে সমাজরক্ষার অনুকূল ছিল। কিন্তু অধুনা জাতিভেদ বংশগত হইয়াছে এবং সমাজ অসংখ্য জাতি উপজাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রীয় বর্ণভেদ ও আধুনিক জাতিভেদ এক কথা নহে। ইহা অশাস্ত্রীয়। এই বিভাগের কোন উপযোগিতা বা উপকারিতা নাই। বরং ইহাতে সমাজের অধোগতি হইয়াছে। এইরূপে শতধা বিভক্ত হওয়াতে সমাজের সংহতিশক্তি, সমপ্রাণতা, একত্ব ও একধর্ম্মত্ব বিনষ্ট হইয়াছে, পরস্পর বিরোধ-বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, সমাজ-বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না, ক্রমে ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই অশাস্ত্রীয় জাতিভেদ হইতে উদ্ভূত অদ্ভুত অস্পৃশ্যতা-দোষ ক্ষেত্রবিশেষে এমন উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে যে মানুষকে পশুর পদবীতে অবনীত করিয়াছে। শাস্ত্রের নামে এই সকল অনাচার ও অবিচার চলিতেছে।

ব্যক্তিগত ধর্ম্মানুষ্ঠানেও শাস্ত্রশাসিত অন্ধসমাজ তথাকথিত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুসরণ ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতেছে, এমন কি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া লোকের প্রাণহানি করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—

ময়মনসিংহ জিলার কোন গ্রামে একটি হিন্দুবিধবা নিদারুণ কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগে প্রবল জলপিপাসা হয়। রোগিণী জলপান করিবার জন্য অস্থির। কিন্তু হায়! সেদিন একাদশী। হিন্দুবিধবার এই একাদশী পালন স্থান-বিশেষে নির্জ্জলা, সজলা বা সফলাও হইয়া থাকে। এস্থলে লোকাচার নির্জ্জলার ব্যবস্থাই করিয়াছে। কাজেই, কেহ মুমূর্ষু রোগিণীকে একটু জল দিল না। সমাজের 'জ্ঞানবৃদ্ধ' পণ্ডিতগণ নাকি বলিলেন—ও তো গেছে, অনর্থক উহার পরকালটা নষ্ট কর কেন? অভাগিনী 'একটু জল, একটু জল,' বলিতে বলিতে শুষ্ককণ্ঠে চক্ষু মুদিলেন।

ইহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। মুসলমান আমলের একটি ঘটনা বলিতেছি—সুবুদ্ধি রায় বাংলার রাজা ছিলেন। ভাগ্যদোষে রাজ্য গেল, মুসলমান মুলুকপতি মুখে জল ঢালিয়া দিয়া তাঁহার জাতি নষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি প্রথমে এদেশে, পরে কাশীতে যাইয়া—

'প্রায়শ্চিত্ত পুঁছিলেন পণ্ডিতের স্থানে।
তারা কহে তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে।'

রাজা বিনা অপরাধে জাতি নাশ করিলেন, তবু প্রাণটা রাখিয়াছিলেন। পণ্ডিতসমাজ প্রাণনাশের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বেচারা আকুল হইয়া মহাপ্রভুর শরণ লইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। প্রভু কি ব্যবস্থা করিলেন ?

'প্রভু কহে ইহাঁ হইতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
অন্য নাম হৈতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে ॥'

তাহাই হইল, সুবুদ্ধি রায় নবজীবন পাইলেন।

যে সকল শাস্ত্রবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া লোকের প্রাণনাশের নৃশংস ব্যবস্থা দিতেও অন্ধতাবশতঃ কুণ্ঠাবোধ হয় না, সেই শাস্ত্র সকলের ভিত্তি কি ? বলা হয় বেদ, কারণ মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বেদে। কিন্তু বেদের সঙ্গে সকল ব্যবস্থার কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই, তাহা বেদজ্ঞমাত্রেই জানেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, বেদ এবং তন্মূলক স্মৃতিশাস্ত্রাদি অবলম্বন করিয়া সকল অবস্থায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা যায় না। অনেক সময় যুক্তি অনুমান দ্বারাও উহা নির্ণয় করিতে হয়। যাহা লোকহিতকর, লোকের প্রাণরক্ষাকর, তাহাই ধর্ম্ম, এই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়াই ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হয়। যদি দেখা যায়, কোন শাস্ত্রবিধি অবস্থাবিশেষে লোকের প্রাণনাশকর, সমাজের অহিতকর এবং সমাজ-রক্ষার প্রতিকূল, তাহা হইলে উহা অবশ্যই বর্জ্জনীয়। অন্ধের ন্যায় যুক্তিহীন ধর্ম্মপালনে ধর্ম্মহানিই হয়, ইহাও শাস্ত্রের কথা।—

'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥'

প্রঃ। সত্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যে উপদেশ—অবস্থাবিশেষে সত্যও মিথ্যাস্বরূপ হয়, বরং মিথ্যাকথা বলিবে তবু প্রাণিহিংসা করিবে না—এই মত কি সর্ব্ববাদিসম্মত ?

উঃ। না, তাহা নহে ; মতভেদ আছে। অনেক পাশ্চাত্য নীতিজ্ঞ বলেন—

সত্য-কথনে বিবিধ মত

সত্য নিত্য, সকল অবস্থায়ই সত্য, উহার ব্যতিক্রম নাই, ব্যভিচার নাই ; সত্য কখনও মিথ্যা হয় না, কোন অবস্থায়ই মিথ্যাপ্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে।

তাঁহাদের মতে কৌশিক ব্রাহ্মণের কি করা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা বিচার্য্য।

প্রথম – মৌনাবলম্বন করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ ইহা বলিয়াছেন।

দ্বিতীয়—যদি কথা বলিতেই হয় তবে নির্দ্দোষ লোকের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যাকথাই বলা কর্ত্তব্য, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মত।

সত্য কথাই বলা উচিত, কোন কারণেই মিথ্যা বলা উচিত নয়—ইহাই পাশ্চাত্য মত।

'ইহার ফল, সত্য বলিয়া জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা করা। যিনি এইরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝেন, তাঁহার ধর্ম্মবাদ যথার্থই হউক, অযথার্থই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে'।

—বঙ্কিমচন্দ্র।

তৃতীয় পথ—উৎপীড়ন, এমন কি মৃত্যুও স্বীকার করিয়া মৌনরক্ষা করা অর্থাৎ সত্য রক্ষার জন্য মৃত্যু বরণ করা। ইহা অতি উচ্চ আদর্শ সন্দেহ নাই।

'কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, ঈদৃশ ধর্ম্ম পৃথিবীতে সাধারণতঃ চলিবার সম্ভাবনা আছে কিনা? ইহাতে সাংখ্যপ্রবচনকারের একটি সূত্র আমাদের মনে পড়িল—'নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ—সাং-সূঃ ১৯—'যে উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে লোকে অশক্ত তাহা উপদেশই নয়।' এরূপ ধর্ম্মপ্রচার চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়। যদি সফল হয়, মানবজাতির পরম সৌভাগ্য।'—বঙ্কিমচন্দ্র

অহিংসা সম্বন্ধেও এইরূপ মতভেদ আছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের মতে প্রাণিরক্ষার জন্য প্রাণিবধ অকর্ত্তব্য নহে, যুদ্ধাদিও কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম্য যুদ্ধও আছে, অধর্ম্ম্য যুদ্ধও আছে। অপর মত হইতেছে, যুদ্ধাদি হিংস্র কর্ম্ম কোন অবস্থায়ই কর্ত্তব্য নহে, অহিংসাদ্বারাই হিংসা জয় করিতে হইবে, যুদ্ধাদি সকল অবস্থায়ই অধর্ম্ম। মহাত্মা গান্ধীর সত্য ও অহিংসনীতি (Truth & Non-violence) অধুনা সুপরিচিত।

অহিংসা সম্বন্ধে দ্বিবিধ মত

কিন্তু 'অসুর-নিধন' ব্যতীত প্রাণিবধাদি আসুরিক কার্য্য সকলস্থলে নিবারণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। জরাসন্ধ রাজগণকে বধ করিতে উদ্যত। কৃষ্ণার্জ্জুন ভীমসেনসহ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'হয় রাজগণকে মুক্তি দাও, নয় আমাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে যাও।' অবশ্য যুদ্ধ করিলেই যে জরাসন্ধ যমালয়ে যাইবে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই। তাহার বিপুল সৈন্যসামন্তও ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিতে পারে। রাজা যুধিষ্ঠিরও এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই বলিয়াছিলেন—কেবল সাহসের উপর নির্ভর করিয়া তোমাদিগকে আমি তথায় যাইতে দিতে পারি না। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—রাজগণের উদ্ধারার্থ যদি আমাদের প্রাণান্তও হয় তাহাও শ্রেয়ঃকল্প।

ইহা অপেক্ষা বীরত্ব, মহত্ত্ব ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছিলেন, শক্তি থাকিতে অত্যাচারীর অত্যাচার দমনে যে যত্নপর না হয়, সে তাহার পাপের ভাগী হয়—ইহা অপেক্ষা লোকহিতকর উচ্চাদর্শ আর কি আছে?

জরাসন্ধের জীবন এমন কি মূল্যবান্ হইল যে অন্যের প্রাণরক্ষার্থও তাহাকে বিনাশ করা যাইবে না ? এরূপ স্থলে অহিংসনীতি অবলম্বন করিয়া কিরূপে রাজগণের উদ্ধার করা যায় ?

মহাত্মাজি বলিবেন—বীরের ন্যায় স্ফীতবক্ষে জরাসন্ধের উন্মুক্ত অসির সম্মুখীন হইয়া বল,—আমি তোমাকে রাজগণকে বধ করিতে দিব না, ইচ্ছা হয় আমাকে বধ কর।'

অবিশ্বাসী বলিলেন—ইহাতে কি ফল হইবে ? মূল্যবান্ প্রাণটি যাইবে মাত্র। গান্ধীজি বলেন—তুমি যদি কায়মনোবাক্যে সত্য সত্যই অহিংস হও, তবে ইহাতে ফল হইবে। তোমার সত্যনিষ্ঠা ও অহিংসার প্রভাবে শত্রুর মন পরিবর্ত্তিত হইবে, সে হিংসাকার্য্য হইতে বিরত হইবে। সত্যস্বরূপ ভগবান্ই তাহার দুর্ম্মতি দূর করিয়া দিবেন। ইহাই গান্ধীজির সুদৃঢ় বিশ্বাস।

সত্য ও অহিংসার অভাবনীয় প্রভাব সম্বন্ধে এইরূপ কথা ঋষি-শাস্ত্রেও যে না আছে তাহা নয়। যোগশাস্ত্রে আছে, 'অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ'—যিনি অহিংসা সাধনে চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে সকল প্রাণীই বৈরভাব ত্যাগ করে, যেমন তপোবনে ব্যাঘ্র হরিণ একত্র ক্রীড়া করে, মুনিগণের ক্রোড়ে সর্প শয়ান থাকে ইত্যাদি কথা আছে। অহিংসার প্রভাবে হিংস্র বন্য পশুও যখন হিংসাত্যাগ করে, তখন অত্যাচারী নরপশু হইলেও অহিংসা ও ত্যাগের প্রভাবে তাঁহার ভাবান্তর (change of heart) হওয়া অসম্ভব কি ? আবার যোগশাস্ত্রে আছে, 'সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বং'—যখন সত্যব্রত সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কর্ম্ম না করিয়াও ফল লাভ হয়, যেমন সত্যব্রত যোগী পুরুষ যদি কাহাকেও বলেন, তুমি রোগমুক্ত হও, অমনি সে রোগমুক্ত হইবে, ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না। মহাত্মা এই সকল কথা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন, তাই তিনি বলেন, সত্য ও অহিংসা দ্বারা সকল অর্থই সিদ্ধ হইতে পারে।

সত্য ও অহিংসার প্রভাব সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রের মত

কিন্তু কথা হইতেছে, এ সকল উচ্চতম সাধনতত্ত্বের কথা, যোগশক্তির কথা, এইরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা তো সহজ কথা নহে। সত্যে ও অহিংসায় সুপ্রতিষ্ঠ যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ জগতে কয়টি মিলে ? তাই বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বলিতে হয়—'এরূপ ধর্ম্মপ্রচার নিষ্ফল হওয়ার সম্ভাবনা। যদি সফল হয়, মানব জাতির সৌভাগ্য।'

এই নীতি সাধারণভাবে সকল স্থলেই ফলপ্রদ না হইতে পারে, কিন্তু যে সকল মহাপুরুষ স্বীয় জীবনে ও উপদেশে ঈদৃশ উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক মানব সমাজকে পবিত্র করিতে প্রচেষ্টা করেন, তাঁহারা মানবজাতির নমস্য। তবে প্রাণিরক্ষার্থে প্রাণিবধ যখন একান্তই অপরিহার্য্য হয় তখনও অহিংসনীতিই অবলম্বনীয়,

একথা সমর্থন করা যায় না। কেননা সর্ব্বস্থলে এই নীতি অবলম্বন করিলে মানবজাতির বর্ত্তমান নৈতিক পরিস্থিতিতে লোকরক্ষা, প্রাণরক্ষা, দেশরক্ষা, রাজ্যপালনাদি সম্ভবপর হয় না। সকল সভ্য জাতির দণ্ডনীতিই তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণের মতে এইরূপ ধর্ম্ম-সঙ্কট স্থলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের কষ্টিপাথর—লোকহিত, লোকরক্ষা, কেননা যাহাতে লোকরক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম। (১৪৫ পৃঃ)।

নৈতিক দৃষ্টিতে ধর্ম্ম্য যুদ্ধের সমর্থন

এস্থলে ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবহারিক নীতিমূলে (from the view point of practical ethics) শ্রীকৃষ্ণ লোকরক্ষার্থ যুদ্ধাদি হিংসাত্মক কর্ম্মের সমর্থন করিয়াছেন। আবার শ্রীগীতায় নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উচ্চতম আধ্যাত্মিক উপদেশের (as the highest spiritual teaching) ভিত্তিমূলে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, নিষ্কাম কর্ম্মীর ঘোরতর হিংসাত্মক কর্ম্মেও পাপ স্পর্শে না।

'যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥'—গীঃ ১৮।১

—'আমি কর্ত্তা, এই ভাব যাঁহার নাই, যাঁহার বুদ্ধি কর্ম্মের ফলাফলে আসক্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোক হনন করিলেও কিছুই হনন করেন না, এবং তাহার ফলেও আবদ্ধ হন না।'

যে মনে করে আত্মা বা 'আমিই' কর্ত্তা, সে অজ্ঞান, সে প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। (গীঃ ১৮।১৬)। এই অজ্ঞানতা-প্রসূত কর্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃই তাহার কর্ম্মবন্ধন হয়। যাঁহার অহং অভিমান নাই, বুদ্ধি যাঁহার নির্লিপ্ত, তাঁহার কর্ম্মবন্ধন হয় না, সে কর্ম্ম লোকরক্ষাই হউক বা লোকহত্যাই হউক তাহাতে কিছু আইসে যায় না।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ধর্ম্ম্য যুদ্ধের সমর্থন

এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান ও কামনাবর্জ্জিত আত্মজ্ঞানী পুরুষই স্থিতপ্রজ্ঞ, ত্রিগুণাতীত, জীবন্মুক্ত ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। ঈদৃশ শুদ্ধবুদ্ধি, মুক্তস্বভাব ব্যক্তিগণের ব্যবহার সম্বন্ধে পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মাদির বিচার চলে না, কেননা তাঁহারা পাপপুণ্যাদি দ্বন্দ্বের অতীত—'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কোবিধি কো নিষেধঃ' (শঙ্করাচার্য্য)। গীতোক্ত কর্ম্মযোগীর লক্ষণও ইহাই, শ্রীগীতাতে ইহা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে (গীঃ ৩।২৭, ৫।৭-১৫ ১৩।২৯, ২।২০, ২।৪৭।৪৮।৩৮।৫০ ইত্যাদি)।

শ্রীকৃষ্ণও উপদেশ দিয়াছেন—অহিংসা পরম ধর্ম্ম, সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর হও (১৪১ পৃঃ), আবার অর্জ্জুনকে যুদ্ধের প্রেরণাও দিয়াছেন। নির্ব্বৈর হইয়া যুদ্ধ কর, এ কথাটায়ও স্ববিরোধ আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এস্থলে 'নির্ব্বৈর হও' একথার অর্থ, কাহারো প্রতি বৈরভাব পোষণ করিও না। আসক্তি যাহার ত্যাগ হইয়াছে,

অহংজ্ঞান যাহার নাই, সর্ব্বভূতে যাহার সমত্ববুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহার মনে বৈরভাব আসিবে কিরূপে ? এইরূপে সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন শুদ্ধ অন্তঃকরণে নির্ব্বের হইয়াও যুদ্ধ করা চলে এবং তাহাই শ্রীগীতোক্ত কর্ম্মযোগের উপদেশ।

সুতরাং আমরা দেখিলাম, কি নৈতিক হিতবাদের ভিত্তিতে, কি আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে, যে ভাবেই বিচার করা যাউক না কেন, গীতোক্ত ধর্ম্ম্যযুদ্ধবাদের যুক্তিমত্তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

গীতোক্ত যুদ্ধ সম্বন্ধে মহাত্মার মত

এই গীতোক্ত ধর্ম্ম্যযুদ্ধবাদের সহিত মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-বাদের বিরোধ দৃষ্ট হয়, কেননা তাঁহার মতে যুদ্ধাদি হিংসাত্মক কর্ম্ম কোন অবস্থায়ই কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মাজির মতে শ্রীগীতায় যে যুদ্ধের প্রেরণা আছে উহা ভৌতিক যুদ্ধ নহে, নৈতিক যুদ্ধ, উহা রূপকের ভাষা। শ্রীগীতা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—'ইহা ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে, পরন্তু রূপকের ভিতর দিয়া প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের ভিতর যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ নিরন্তর চলিতেছে ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ভৌতিক যুদ্ধের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।' বলা বাহুল্য, যুদ্ধ প্রেরণাই শ্রীগীতার মুখ্য কথা নহে। নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গেই উহা উল্লিখিত হইয়াছে। অহিংসনীতি শ্রীগীতারও মান্য, তবে শ্রীগীতা বলেন, অহিংস হইয়াও যুদ্ধ করা চলে, কেননা হিংসা অহিংসা বুদ্ধিতে, কর্ম্মে নহে। ফলত্যাগী, কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য, সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মযোগীর কর্ম্মে পাপ স্পর্শে না, উহার ফল যাহাই হউক—(গীঃ ২।৪৯।৫০।৫১, ১৮।১৭ ইত্যাদি দ্রঃ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সচ্চিদানন্দ—সর্ব্ববিৎ প্রজ্ঞানঘন

আমরা দেখিয়াছি, সচ্চিদানন্দের লীলায় ত্রিবিধ শক্তির প্রকাশ—সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী—কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম (৪৯-৫৩ পৃঃ)। তিনি একাধারে সর্ব্বকৃৎ প্রতাপঘন, সর্ব্ববিৎ প্রজ্ঞানঘন, সর্ব্বরসপূর্ণ প্রেমঘন (Almighty, All-knowing, All-loving)। এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ব্রজলীলা-বর্ণনায় রসময় প্রেমঘনরূপে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সর্ব্বকৃৎ প্রতাপঘনরূপে পাঠক তাঁহার পরিচয় পাইয়াছেন। এই পরিচ্ছেদে দেখিব, তিনি সর্ব্ববিৎ প্রজ্ঞানঘন। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহা হইতেই জীবের জ্ঞান-বুদ্ধির প্রেরণা। শ্রীগীতায় তাঁহার উক্তি আছে—আমি ভক্তজনের অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করি ('নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা'—গীঃ ১০।১১)। এই মহাগ্রন্থখানিতে যে অপূর্ব্ব ধর্ম্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গেই আমরা তাঁহার প্রজ্ঞান-স্বরূপের কথঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিতে পারি।

তাঁহার লোক-লীলার প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্ম-সংস্থাপন। কিন্তু ধর্ম্ম-সংস্থাপন বলিতে কেবল অসুর-নিধনাদি বুঝায় না। ধর্ম্মের দুইটি দিক্, একটি হইতেছে, দুষ্কৃতদিগের দমন বা বিনাশ করিয়া সাধুদিগের সংরক্ষণ ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন; অপরটি হইতেছে, ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা মানবাত্মার উন্নতি সাধন, মানবকে দিব্য জীবনের অধিকারী করা। এই সার্ব্বভৌম ধর্ম্মতত্ত্বই শ্রীগীতায় কথিত হইয়াছে। ব্রজলীলায় দেখি তিনি রসময় প্রেমঘন, মথুরা-দ্বারকা-লীলায় তিনি সর্ব্বকৃৎ প্রতাপঘন, কুরুক্ষেত্রে গীতাজ্ঞান-প্রচারে দেখি তিনি সর্ব্ববিদ্ প্রজ্ঞানঘন।

শ্রীগীতার গৌরব ও মহত্ত্ব

শ্রীগীতা প্রাচীন প্রামাণ্য দ্বাদশ উপনিষদের পরবর্ত্তী হইলেও উহাদের সমশ্রেণীস্থ, উহা ত্রয়োদশ উপনিষৎ বলিয়া গণ্য এবং বেদের ন্যায় সকল সম্প্রদায়েরই মান্য। শ্রীগীতার পরিচয়সূচক এইরূপ ভণিতা প্রত্যেক অধ্যায়শেষে দৃষ্ট হয়—'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু'—ইহার অর্থ এই যে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত উপনিষৎ শাস্ত্রে অমুক অধ্যায়। উপনিষৎ শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ, এই হেতু উহার বিশেষণে 'গীতা' এই স্ত্রীলিঙ্গ পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবদ্বাক্যের আরম্ভে সর্ব্বত্রই আছে—'শ্রীভগবান্ উবাচ'—শ্রীভগবান্ কহিলেন—। এই সকল কথার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই শ্রীভগবান্ যে কী বস্তু তাঁহার পরিচয় শ্রীগীতাগ্রন্থেই আমরা যাহা পাই তাহাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য, কারণ, উহাই জ্ঞেয় তত্ত্ব।

শ্রীভগবান্ এইরূপে আত্ম-পরিচয় দিতেছেন—

'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥'—গীঃ ৪।৬

অজ, অব্যয়, আত্মা ঈশ্বর, অবতার

—'আমি জন্মরহিত, অব্যয় আত্মা, সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়ায় আবির্ভূত হই।' ইহাই অবতার লীলা। আবার বলিতেছেন—

—'আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা ('অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ"—গী ১০।২০)।

'আমি অব্যক্ত স্বরূপে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি।' ('ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা'—গীঃ ৯।৪)। যিনি ব্যক্ত, সাকার, অবতার, তিনিই আবার অব্যক্ত, নিরাকার।

আবার বলিতেছেন—

'অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥'—গীঃ ১০।৪২

'—হে অর্জ্জুন, তোমার এত বহু বিভূতি-বিস্তার জানিয়া প্রয়োজন কি? এক কথায় বলিতেছি, আমি এই সমস্ত জগৎ আমার একাংশমাত্রদ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি। ইহাই তাঁহার বিশ্বরূপ। 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ'; 'পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে পরমপুরুষের বর্ণনা আছে তিনি তাহাই।

এ স্থলে শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি **একাংশে** চরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া আছি, আমি বিশ্বরূপ। তবে অপরাংশ কিরূপ, কোথায়? তাহা অনন্ত, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অজ্ঞেয়।

বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ

তিনি মায়া স্বীকার করিয়া সোপাধিক হইলেও সসীম হন না। তিনি বিশ্বানুগ (Immanent) হইয়াও বিশ্বাতিগ (Transcendent), প্রপঞ্চাভিমানী হইয়াও প্রপঞ্চাতীত। তাঁহার এই প্রপঞ্চাতীত, নির্গুণ স্বরূপ ধারণার অতীত ('অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্—কেন ২।৩)।

বিশ্বাতীত স্বরূপ দূরে থাকুক, মানব-বুদ্ধি বিশ্বরূপ ধারণা করিতেই বিহ্বল হইয়া যায়। বিশ্বরূপ বলিতে আমরা কি বুঝি? সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া

যে গ্রহরাজি ঘুরিতেছে, সেই সমস্ত লইয়া সৌরজগৎ (Solar System)। ইহাকেই আমরা সাধারণতঃ বিশ্ব বলি। হিন্দুশাস্ত্রে ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। আমাদের পৃথিবী উহার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রহ। কিন্তু এইরূপ বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ড একটি নয়, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে; ধূলিকণারও সংখ্যা করা যায়, কিন্তু বিশ্বের সংখ্যা করা যায় না ('সংখ্যা চেৎ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন')। জ্যোতির্বিজ্ঞানও বলে, আকাশে যে অসংখ্য নক্ষত্র দৃষ্ট হয় উহার প্রত্যেকটিই একটি সূর্য্য এবং প্রত্যেক সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। এই অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার রূপ তিনিই বিশ্বরূপ।

বিশ্বরূপ বলিতে কি বুঝায়

'একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং।

... ...

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥'—ব্রহ্ম-সংহিতা ৩৯।

—'এক হইলেও যিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন, যাঁহার দেহে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।'

সমগ্র সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে—শ্রুতিতে, দর্শনে, পুরাণে—পরতত্ত্ব স্বরূপের যে সকল বিভিন্নরূপ বর্ণনা আছে, তৎসমস্তই আমরা এই শ্রীগীতাগ্রন্থে শ্রীভগবদ্‌মুখে জানিতে পারি এবং ইহাও জানিতে পারি যে এ সকলই তিনি। নির্গুণব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম, বিশ্বরূপ, পরমাত্মা বা আত্মা, নিরাকার, সাকার, অবতার—সকলই এক বস্তুরই বিভিন্ন ভাব বা বিভাব।

কিন্তু এই পরতত্ত্বের বর্ণনায় বেদান্তাদি শাস্ত্র হইতে শ্রীগীতার একটি বিশেষত্ব আছে। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।'—গী ১৫।১৬।১৮

—'ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ ইহলোকে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বভূত ক্ষর পুরুষ এবং কূটস্থ অক্ষর পুরুষ বলিয়া কথিত হন। যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, সেই হেতু আমি লোক-ব্যবহারে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত।'

এস্থলে তিনটি পুরুষের কথা বলা হইল—ক্ষরপুরুষ (সর্ব্বভূত), অক্ষর পুরুষ (কূটস্থ), এবং উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। এই তিন পুরুষ একমূল তত্ত্বেরই তিন বিভাব। পরিণামী চেতনাচেতনাত্মক জগৎ (সর্ব্বভূতানি) তাঁহা হইতেই জলবুদ্বুদের ন্যায় উত্থিত হইয়া আবার তাহাতেই বিলীন হয়। ইহাই ক্ষরভাব, এবং তাঁহার অপরিণামী নির্ব্বিশেষ কূটস্থ নির্গুণ স্বরূপই অক্ষর পুরুষ বা অক্ষরভাব ; আর পুরুষোত্তম ভাবে তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বভূতের 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' (৯।১৮)।

পুরুষোত্তম তত্ত্ব

মোট কথা, ব্রহ্মই সমস্ত ('সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'), এই বৈদান্তিক মূল তত্ত্বই শ্রীগীতারও প্রতিপাদ্য। উপনিষদে ও ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মই অদ্বয় পরতত্ত্ব। ব্রহ্মস্বরূপ কোথায়ও নির্গুণ, কোথায়ও সগুণ, কোথায়ও সগুণ-নির্গুণ উভয়রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীগীতায় এই 'নির্গুণো-গুণী' পুরুষোত্তমরূপে শ্রীভগবান্ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—'আমিই সকল বেদের একমাত্র জ্ঞাতব্য ('বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ'—১৫।১৫)। আরও বলিয়াছেন—

'যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।'—গী ১৫।১৯।২০

—'যিনি মোহমুক্ত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম ভাবে জানিতে পারেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন এবং সর্ব্বতোভাবে আমাকে ভজনা করেন। আমি এই অতি গুহ্য তত্ত্ব তোমাকে বলিলাম।'

'তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন' অর্থাৎ আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিলে আর জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না, সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার ইত্যাদি বিষয়ে সংশয় আর তাহার উপস্থিত হয় না। তিনি জানেন, আমিই নির্গুণ-ব্রহ্ম, আমিই সগুণ বিশ্বরূপ, আমিই সর্ব্বলোক-মহেশ্বর, আমিই হৃদয়ে পরমাত্মা, আমিই লীলায় অবতার। সুতরাং সকলভাবেই আমাকে ভজনা করেন।

গীতোক্ত ধর্ম্মতত্ত্বটি সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে হইলে এই পুরুষোত্তম তত্ত্বের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক, নচেৎ শ্রীগীতার অনেক কথাই রহস্যময় ও পরস্পর বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, আত্মসংস্থ যোগ বা ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ এই সকল সাধন-প্রণালী সুপ্রচলিত। শ্রীগীতায়ও কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—এ সকলেরই উল্লেখ আছে এবং সকলই সমভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই হেতুই গীতোক্ত যোগধর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

জ্ঞানের প্রশংসা

জ্ঞান সম্বন্ধে শ্রীগীতা বলিতেছেন—ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছু নাই ('নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে'—৪।৩৮) ; জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মসাৎ করে ('জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা' (৪।৩৭) ; জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম্ম নিঃশেষে পরিসমাপ্ত হয় ('সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে—৪।৩৩) ।

ভক্তির প্রশংসা

আবার সাধনমার্গে **ভক্তির প্রয়োজনীয়তা** বলিতে বলিতে প্রিয় ভক্তকে শ্রীভগবান্ কত মধুর আশ্বাসবাণী দিতেছেন—

'তুমি একমাত্র আমাতেই চিত্ত রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকেই পাইবে'—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে'-১৮।৬৫

'যাহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, একমাত্র আমাতেই চিত্ত একাগ্র করিয়া অনন্যভক্তিযোগে আমার উপাসনা করে, আমাতে সমর্পিতচিত্ত সেই ভক্তগণকে আমি অচিরাৎ সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। আমাতেই মন স্থাপন কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই স্থিতি করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।'—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ।
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ১২।৬-৮

'অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিবে, যেহেতু তাহার অধ্যবসায় অতি উত্তম। ঈদৃশ দুরাচার ব্যক্তিও শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তিলাভ করে। এ কথা যদি কুতার্কিক লোকে বিশ্বাস না করে তবে তুমি নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।'—

'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥' ৯।৩০-৩১

পাপী তাপীর প্রতি এমন আশা-উৎসাহের কথা, এমন মধুর আশ্বাসবাণী আর কোথায় আছে? পরিশেষে শ্রীভগবান্ প্রিয় ভক্তকে সর্ব্বগুহ্যতম এই সার কথাটি বলিয়া দিলেন ('সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ')।—

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥' ১৮।৬৬

—'নানা মার্গের, নানা ধর্ম্মের বিধি-নিষেধ ত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।'

শ্রীগীতার এই সকল মধুর অভয়বাণী শুনিয়া বোধ হয় শ্রীভগবান্ যেন শ্রীহস্ত প্রসারণ করিয়া ভক্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন। এই তো গেল ভক্তির কথা। আবার **কর্ম্মের প্রশংসা ও প্রয়োজনীয়তাও** শ্রীগীতায় অতি দৃঢ়তার সহিত আদ্যোপান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে।

কর্ম্মের প্রশংসা

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে সর্ব্বত্রই কর্ম্ম-প্রেরণা ও কর্ম্ম-মাহাত্ম্যের বর্ণনা পাওয়া যায় (পৃঃ ১২০ দ্রঃ)। শ্রীগীতায় কর্ম্মকে নিষ্কাম করিয়া উহাকে কর্ম্মযোগে পরিণত করা হইয়াছে। শ্রীগীতার কর্ম্মোপদেশের মূল সূত্র এই—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥—২।৪৭

—(১) কর্ম্মেই তোমার অধিকার। (২) কর্ম্মফলে কখনও তোমার অধিকার নাই। (৩) কর্ম্মফল যেন তোমার কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ না হয়। (৪) কর্ম্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

এ শ্লোকের চারিটি চরণ কর্ম্মযোগের চতুঃসূত্রী। শ্রীগীতাগ্রন্থে অন্যান্য নানা তত্ত্বকথার মধ্যেও এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের উপদেশ অতি সুস্পষ্ট। জ্ঞানবাদিগণের মতে কর্ম্মমাত্রই বন্ধনের কারণ, কিন্তু শ্রীগীতা বলেন কাম্য কর্ম্ম বন্ধনের কারণ, নিষ্কাম কর্ম্ম বন্ধনের হেতু নহে; কাম্য কর্ম্মে ভোগ, নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ, মোক্ষসেতু। তাই শ্রীগীতার উপদেশ—যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর। যোগ কি?

ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্ম কর, এই সমত্ববুদ্ধিই যোগ—

—'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥' ২।৪৮

তাই শ্রীগীতার সুস্পষ্ট উপদেশ—তুমি আসক্তিশূন্য হইয়া সতত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম কর—অনাসক্ত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ চরম পদ প্রাপ্ত হয় ('অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ' ৩।১৯)। জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ('কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়')। লোকরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও কর্ম্ম করা উচিত ('লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি')। যাহা হইতে এই জীবসৃষ্টি, জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি, স্বীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-দ্বারা (কেবল পুষ্পপত্রদ্বারা নহে) তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করে। ('স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'—১৮।৪৬)।

এইরূপে শ্রীগীতায় কর্ম্মকেও সিদ্ধিপ্রদ মোক্ষপ্রদ যোগসাধন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

আবার শ্রীগীতায় পাতঞ্জল রাজযোগ বা আত্মসংস্থ যোগসাধনেরও উল্লেখ আছে এবং উহারও উচ্চ প্রশংসা আছে।

রাজযোগের প্রশংসা

আমরা দেখিলাম শ্রীগীতায় জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম্ম, ভক্তি—এ সকলই সমভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সকল অবলম্বনে জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ নামে চারিটি সাধনমার্গের উদ্ভব হইয়াছে এবং বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই গীতোক্ত যোগ ইহাদের কোন্‌টি? না শ্রীগীতা 'ষড়্‌দর্শন সংগ্রহের' ন্যায় এই সকল বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর সংগ্রহগ্রন্থ? শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যেরও পূর্ব্বকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ভারতের প্রাচীন আধুনিক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধর্ম্মাচার্য্যগণ অনেকেই শ্রীগীতার টীকাভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই সকল ভাষ্যকারগণ অনেকেই মহামনস্বী, ভক্ত ও সাধক, অনেকে আবার সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক। ইহারা নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মতের অনুবর্ত্তনে গীতাগ্রন্থ হইতে বিভিন্নরূপ তাৎপর্য্য নিষ্কাশন করেন।

গীতোক্ত যোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত

কেহ জ্ঞানেরই প্রাধান্য দেন, কর্ম্ম ও ভক্তিকে গৌণ মনে করেন; কেহ ভক্তিরই প্রাধান্য দেন, জ্ঞান ও কর্ম্ম গৌণ মনে করেন, কেহ আবার বলেন ষষ্ঠ অধ্যায়োক্ত ধ্যানযোগই শ্রীগীতার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। বস্তুতঃ বৃক্ষের উপর পরবৃক্ষ জন্মিলে যেমন মূল বৃক্ষটি অদৃশ্যপ্রায় হইয়া যায়,

বহু টীকাভাষ্যের আবরণে শ্রীগীতার অবস্থাও তদ্রূপ। সুতরাং সাম্প্রদায়িক টীকা-ভাষ্যের সাহায্যে গীতাতত্ত্ব বুঝিবার প্রয়াস নিষ্ফল। শ্রীগীতার অনুধ্যানই গীতাতত্ত্ব অধিগত করার শ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্রীগীতাতেই দেখি, শ্রীভগবান্ গীতোক্ত যোগধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বয়ংই বলিতেছেন—'এই অব্যয় যোগ আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত ছিলেন। ইহলোকে এই যোগ দীর্ঘকালবশে নষ্ট হইয়াছে। সেই পুরাতন যোগ অদ্য তোমাকে বলিলাম। ইহা অতি উত্তম গুহ্য তত্ত্ব। 'স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।' গীঃ ৪।১-৩।

গীতোক্ত বিশিষ্ট যোগধর্ম্ম কি

মহাভারতেও এই উক্তির সমর্থন আছে। শান্তিপর্ব্বে নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ে এই ধর্ম্মের বিস্তারিত বিবরণ আছে। তথায় ইহাকে 'নারায়ণীয় ধর্ম্ম' ও 'ঐকান্তিক ধর্ম্ম' বলা হইয়াছে। এই ধর্ম্ম কোন্ সময় কাঁহা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে জন্মেজয় একথা জিজ্ঞাসা করিলে বৈশম্পায়ন কহিলেন—

'সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্ম্মৃধে।
অর্জ্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ং ॥'—মভা শাং ৩৪৮।৮

—সংগ্রামস্থলে কুরুপাণ্ডব সৈন্য উপস্থিত হইলে যখন অর্জ্জুন বিমনস্ক হইলেন তখন ভগবান স্বয়ং তাঁহাকে এই ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছিলেন।

সে স্থলে এই ধর্ম্মতত্ত্বের বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং তথায় উক্ত হইয়াছে যে, সাংখ্য যোগ, ঔপনিষদিক জ্ঞান এবং পাঞ্চরাত্র বা ভক্তিমার্গ—পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভূত অর্থাৎ সমুচ্চিত, বিকল্পিত নয় ('এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেবচ। পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পাঞ্চরাত্রং চ কথ্যতে—'সমুচ্চিতমেব নতু বিকল্পিতং—নীলকণ্ঠ')। শ্রীগীতাতেও আমরা তাহাই দেখি। বিবিধ সারগর্ভ তত্ত্বালোচনার মধ্যে মধ্যে অর্জ্জুনকে বলা হইতেছে, কর্ম্ম কর, যুদ্ধ কর, অথচ সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তিরও মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়া বলা হইতেছে—জ্ঞানী হও, যোগী হও, ভক্ত হও। সুতরাং অর্জ্জুনকে কর্ম্মী, জ্ঞানী, ধ্যানী, ভক্ত সবই হইতে হইবে। ইহাতে বুঝিতে হয় কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি পরস্পর সাপেক্ষ ও সমন্বয়-সাধ্য, নিরপেক্ষ ও বিরোধী নহে। কিন্তু কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি নামে যে সকল সাধন-মার্গ প্রচলিত আছে—তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়। এই সকল সাধন-প্রণালী গীতা রচনাকালেও প্রচলিত ছিল, ইহা শ্রীগীতাতেও উল্লিখিত আছে (গীঃ ১৩।২৪-২৫, ৩।৩)। কিন্তু শ্রীগীতাতে শ্রীভগবান অর্জুনকে এবং তদুপলক্ষে জগৎকে যে যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন তাহা ঠিক ঠিক

ইহার কোন একটি নয়, ইহাও শ্রীভগবদুক্তিতেই বুঝা যায় (গীঃ ৪।১-৩)। ইহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এ সকলেরই সমন্বয় ও সমুচ্চয় আছে। কিরূপে এই আপাত-বিরোধী মার্গসমূহের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, তাহা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে হইলে কোন্ সময়ে কিরূপে এই সকল বিভিন্ন মতের উদ্ভব হইয়াছে, উহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ও প্রয়োজন কি, উহাদের অন্তর্নিহিত দার্শনিক ভিত্তি কি, এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে হয়। গীতাপ্রচার কালে বৈদিক কর্ম্মবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতি-পরিণামবাদ, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, যোগানুশাসন, কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ, প্রতীকোপাসনা ও অবতারবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল। এ সকলই গীতাশাস্ত্রে প্রতিফলিত আছে, গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী। কিন্তু এ সকল বিভিন্ন মতবাদের প্রকৃত তত্ত্ব কি, গীতা কি ভাবে ইহাদের উপপত্তি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে হইলে সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা ও সনাতন ধর্ম্মের ক্রম-বিকাশের পর্য্যালোচনা করিতে হয়। বিষয়টি অতি ব্যাপক, এ গ্রন্থে উহার সম্যক্ আলোচনা সম্ভবপর নহে। তবে সংক্ষেপে কয়েকটি স্থূল কথা গীতাতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ স্থলে বলা প্রয়োজন।

গীতোক্ত সমন্বয় যোগ

সনাতন ধর্ম্মের ক্রম-বিকাশের ঐতিহাসিক আলোচনা স্থূলভাবে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়—১। কর্ম্মপ্রধান বৈদিক যুগ, ২। জ্ঞানপ্রধান ঔপনিষদিক ও দার্শনিক যুগ। ৩। ভক্তিপ্রধান পৌরাণিক যুগ।

১। কর্ম্মপ্রধান বৈদিক যুগ

সনাতন ধর্ম্মের আদি গ্রন্থ বেদ। বেদের চারি ভাগ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ লইয়া কর্ম্মকাণ্ড, এবং আরণ্যক ও উপনিষৎ ভাগ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষৎ বেদের অন্তভাগ বা সার ভাগ বলিয়া উহার নাম বেদান্ত।

বেদের সংহিতাভাগ আর্য্যধর্ম্মের ও আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনতম প্রতিচ্ছবি। উহার মন্ত্রগুলি প্রায় সমস্তই ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবগণের স্তবস্তুতিতে পূর্ণ। এই সকল মন্ত্রদ্বারা প্রাচীন আর্য্যগণ দেবগণের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করিয়া অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেন। বেদমন্ত্রসমূহ গূঢ়ার্থমূলক, সেই সকল মন্ত্ররহস্য সম্যগ্‌রূপে উদ্‌ঘাটন করা এখন প্রায় অসম্ভব। স্থূলভাবে সাধারণ জ্ঞানে বুঝা যায়, বেদমন্ত্রসমূহের বিষয়বস্তু, আর্য্যগণের অভীষ্ট বস্তু মোটামুটি দুই রকম—শ্রী ও

ধী। কতকগুলি মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় শ্রী অর্থাৎ ধনধান্য, বল বিক্রম, যশ জয়, পুত্রভৃত্য, অশ্ব, ধেনু ইত্যাদি পার্থিব কাম্য বস্তু। অন্য কতকগুলি মন্ত্রের বিষয়-বস্তু বুদ্ধি, জ্ঞানজ্যোতিঃ অমৃতত্ব। কোন কোন মন্ত্রে ঐহিক সুখ ও স্বর্গসুখ উভয়েরই প্রার্থনা আছে।

প্রাচীন আর্য্যগণের জীবনের ধারা ছিল কর্ম্ম ও জ্ঞানের মিলিত ধারা। 'বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ' জীবন; সংযত বিষয়ভোগ, বিশ্বস্রষ্টার প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরতা, এবং তাঁহার অনুগ্রহে ঋদ্ধি, বুদ্ধি, সুখ-শান্তি, অমৃতত্ব লাভ।

প্রাচীন আর্য্যগণের জীবন-ধারা

ইহ সংসার ও ইহ জীবনের প্রতি বিরাগ-বিতৃষ্ণা পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্মজীবনের একটি লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত, ইহাকেই আমরা পূর্ব্বে দুঃখবাদ বা সন্ন্যাসবাদ বলিয়াছি (২৪।২৫ পৃঃ)। প্রাচীন আর্য্যগণের ধর্ম্মজীবনে এবং প্রার্থনা-বাণীতে এই দুঃখবাদের সংস্পর্শ ছিল না, তাঁহারা ছিলেন সুখবাদী, জীবনবাদী (২৫ পৃঃ)। এ প্রসঙ্গে পূর্ব্বে আমরা বেদের মধুমতী সূক্ত প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়াছি (৩২ পৃঃ)। এ স্থলে আরো কয়েকটি বেদ-বাণী উদ্ধৃত করিতেছি।—

'তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।'

—বাজসনেয় সংহিতা ১৯।৯

—তুমি তেজ-স্বরূপ, আমাতে তেজ আধান কর, আমাকে তেজস্বী কর। তুমি বীর্য্যস্বরূপ, আমায় বীর্য্যবান্ কর। তুমি বলস্বরূপ, আমায় বলবান্ কর। তুমি ওজস্বরূপ, আমায় ওজস্বী কর। তুমি মন্যুস্বরূপ (অন্যায়দ্রোহী), আমায় অন্যায়-দ্রোহী কর। তুমি সহস্বরূপ (সহ্যশক্তি), আমায় সহনশীল কর।

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—গীঃ ২।৩, শ্রীগীতার এই প্রথম উক্তিতেই আমরা এই বৈদিক বলাধান মন্ত্রের ভাবটি পাই।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে বলবীর্য্যের প্রার্থনা। নিম্নোক্ত মন্ত্রটিতে সুস্থ সবল দীর্ঘ-জীবনের প্রার্থনা।—

'পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং
শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতং
অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ ॥'

—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩৬।২৪

—শত শরৎ সুখময় দেখি যেন নয়নে,
শত শরৎ সুখময় বেঁচে রব ভুবনে,
শত শরৎ শুনবো কাণে জরা না আসিবে,
শত শরৎ মুখের কথা আড়ষ্ট না হবে,
শত শরৎ সুস্থ সবল অদীন অম্লান,
শত শরৎ পরেও যেন থাকি শক্তিমান্।

[শত শরৎ = সুখময় শত বৎসর, ইংরাজী ভাষায় বলে 'hundred summers']

এই বল-বীর্য্য-দীর্ঘজীবন লাভের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোথাও আত্মপ্রতিষ্ঠার কোন চিহ্ন নাই, সর্ব্বত্রই ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা—

'জ্যোক্তে সন্দৃশি জীব্যাসং জ্যোক্তে সন্দৃশি জীব্যাসম্॥' [পুনরুক্তি আদরার্থে]।

—'আমি যেন তোমার দৃষ্টিভাজন হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকি, তোমার দৃষ্টির অধীনে যেন আমি দীর্ঘজীবন যাপন করি।'—ঐ

আবার এই ব্যক্তিগত সফল দীর্ঘজীবনের সহিত যুক্ত আছে আরো উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা—জাগতিক প্রীতি ও শান্তি, যাহাতে ইহাকে প্রকৃতই মহনীয় করিয়াছে।—

'দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে॥'—ঐ

—'হে পরমেশ্বর, আমাকে দৃঢ় কর, যেন সকল প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করে, আমিও যেন সকল প্রাণীকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করি, আমরা যেন পরস্পরকে মিত্রভাবে দর্শন করি।'

আবার, সর্ব্বজীবে প্রীতির সহিত যুক্ত আছে সর্ব্বজগতে শান্তির দৃষ্টি—

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তি
রাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্ব্বংশান্তিঃ
শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি॥' — ঐ

—দ্যুলোকে শান্তি, অন্তরিক্ষে শান্তি, পৃথিবীতে শান্তি, জলে শান্তি, ওষধিতে শান্তি, বনস্পতিতে শান্তি, সকল দেবতাতে শান্তি, পরব্রহ্মে শান্তি, সর্ব্বজগতে শান্তি, স্বভাবতঃই যাহা শান্তি, (ভগবৎ কৃপায়) সেই শান্তি আমার হউক।'

এই তো সুপ্রাচীন আর্য্যগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা। জীবনে ঋদ্ধি, জীবে প্রীতি, জগতে শান্তি। ইহাতে দুঃখবাদের নামগন্ধও নাই। ঐহিক জীবনটার

মূল্য অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা হয় নাই। বরং জীবনটিকে সংযতভাবে উপভোগ করিবার জন্য, জগতের অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার জন্য, অনিবার্য্য দুঃখ-বিপত্তি সহ্য করিবার জন্য বলবীর্য্য, শক্তি-সামর্থ্য, সহনশীলতা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণাবলীর প্রার্থনা। সকল শক্তিই ঈশ্বরের, মনুষ্যের নহে, এই দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁহার নিকটই শক্তি প্রার্থনা। ইহা অকৃত্রিম ঈশ্বরবাদ। যজ্ঞই ছিল প্রাচীন আর্য্যগণের প্রধান অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। এই যজ্ঞাদি শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইত এবং অর্চ্চনা, বন্দনা, নমস্কার ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গযুক্ত ছিল। ('শ্রদ্ধাং দেবা যজমানা বায়ু গোপা উপাসতে,' 'বিষ্ণবে চার্য্যত' ইত্যাদি ঋক্)।

প্রাচীন আর্য্যগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা

কালে সনাতন ধর্ম্মে যাগযজ্ঞাদির প্রাধান্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং বৈদিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণ কর্ম্মপ্রধান হইয়া উঠে। বেদের ব্রাহ্মণভাগ এই সকল যাগযজ্ঞের বিধি-নিয়মে পরিপূর্ণ। কালক্রমে এইরূপ একটি মত প্রবল হইয়া উঠে যে যাগযজ্ঞেই জীবের একমাত্র নিঃশ্রেয়স, উহাতেই স্বর্গ ও অমৃতত্ব লাভ হয়। যজ্ঞকর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম, কারণ উহা বেদের আজ্ঞা। বেদমন্ত্র অপৌরুষেয়, নিত্য, কর্ম্ম উহার বাহ্য অভিব্যক্তি, কর্ম্মই উহার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, সুতরাং বেদ-বিহিত কর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম। ঈশ্বর, দেবতা অর্থবাদ, জ্ঞান-ভক্তি নিরর্থক, কর্ম্মই কর্ত্তব্য, আর কিছু নাই। ইহারই নাম বেদবাদ। শ্রীগীতায় 'বেদবাদরতাঃ,' 'নান্যদস্তীতিবাদিনঃ' ইত্যাদি কথায় এই—মতাবলম্বীদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং এই মতের তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে (গীঃ ২।৪২-৪৪)। ইহা মীমাংসক মত।

বেদবাদ

যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্ম জীবের সংসার-আসক্তিরই প্রতিপাদক, মোক্ষের প্রতিপাদক নহে। এই হেতু কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদকে ত্রৈগুণ্যবিষয়ক বলিয়া অর্জ্জুনকে উহা পরিহার করিয়া 'নিস্ত্রৈগুণ্য' হইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। (গীঃ ২।৪৫)।

কিন্তু যজ্ঞাদি কর্ম্ম আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া করা কর্ত্তব্য, কেননা উহা চিত্তশুদ্ধিকর, ইহাই শ্রীগীতার মত (গীঃ ১৮।৫-৬)। বস্তুতঃ শ্রীগীতা 'যজ্ঞ' শব্দেরই অর্থের সম্প্রসারণ করিয়াছেন। শ্রীগীতার মতে লোকহিতার্থ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কৃত কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞস্বরূপ, এইরূপ কর্ম্ম অকর্ম্মস্বরূপ, উহাতে বন্ধন হয় না (গীঃ ৪।২৩)।

জ্ঞানপ্রধান ঔপনিষদিক ও দার্শনিক যুগ

বৈদিক দেবতা অনেক থাকিলেও তাঁহারা এক ঐশী শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ এবং ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়—এ তত্ত্ব তখনও অবিদিত ছিল না। অনেক মন্ত্রে একথা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে ('একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ইত্যাদি ঋক্ ১।১৬৪।৪৬)। এই এক-তত্ত্বের চিন্তনে নিমগ্ন হইয়া আর্য্য ঋষিগণ স্থির করিলেন

যে, এই নামরূপাত্মক দৃশ্য প্রপঞ্চের অতীত যে নিত্য বস্তু, জ্ঞানযোগে তাঁহাকেই জানিতে হইবে, তাঁহাই পরতত্ত্ব, তাঁহাই ব্রহ্ম ('তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম')। এই ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষৎ বা বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। উপনিষৎ সংখ্যায় অনেক, তন্মধ্যে কৌষিতকী, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি দ্বাদশখানিই প্রধান ও প্রামাণ্য। উহাদের মধ্যেও পরস্পর মতভেদ আছে। মহর্ষি বাদরায়ণ ব্যাস ব্রহ্মসূত্রে এই সকল বিভিন্ন মতের বিচার করিয়া সমন্বয়-বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। উহারই নাম বেদান্ত-দর্শন। বেদান্ত বা উপনিষৎ এবং বেদান্ত-দর্শন এক কথা নহে, শাস্ত্রালোচনায় ইহা মনে রাখা প্রয়োজন।

ব্রহ্মের স্বরূপ এবং ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ কি, এ বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে মর্ম্মান্তিক মতভেদ আছে এবং এই হেতুই বিভিন্ন উপাসনা-প্রণালী ও উপাসক-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রধান বিরোধ মায়াবাদ ও পরিণাম-বাদে (৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

মায়াবাদী বলেন, কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে তাহা আমি অর্দ্ধ শ্লোকে বলিয়া দিতেছি—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই আর কিছু নহে।—

'শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥'

এই যে জীব-ব্রহ্মের অভেদ-বাদ ইহারই নাম অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদী বলেন, জীব-ব্রহ্মের অভেদ সত্ত্বেও যে ভেদ বোধ হয়, জগৎ মিথ্যা সত্ত্বেও সে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, ইহার কারণ মায়া। জীব-জগৎ সকলই মায়ার বিজৃম্ভণ, অজ্ঞান-প্রসূত। মায়ারই নামান্তর অজ্ঞান। অজ্ঞান দূর হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিভাত হয়, তখন জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভেদ থাকে না, এইজন্য বলা হয়, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মই হন ('ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি')। যে মার্গ অবলম্বন করিলে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় তাহার নাম জ্ঞানমার্গ।

মায়াবাদ

এই মতে মায়া বা অজ্ঞানই কর্ম্ম বা সংসারপ্রপঞ্চের মূল, কেননা সৃষ্টিই যখন মিথ্যা, মায়ামাত্র, এবং সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্ম, সুতরাং কর্ম্মও মায়াই। কাজেই কর্ম্মত্যাগ না করিলে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না, সন্ন্যাসই একমাত্র মোক্ষের পথ। মায়ার যখন শেষ হয়, তখন জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়, কর্ম্ম লোপ পায়। এই মতে জ্ঞান বা মোক্ষ অর্থ কর্ম্মের শেষ, বিশ্বলীলার লোপ। এই শ্রেণীর জ্ঞানবাদীরা সকলেই সন্ন্যাসবাদী। ইঁহারা বলেন, স্থিতি ও গতি, আলোক ও অন্ধকার যেরূপ একত্র থাকিতে পারে না, কর্ম্ম ও জ্ঞানও সেইরূপ যুগপৎ সম্ভবেনা।

এইরূপে সনাতন ধর্ম্মের দুই শাখা বাহির হইল। একটি কর্ম্মমার্গ বা প্রবৃত্তিমার্গ, যাহা বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে উপদিষ্ট হইয়াছে, অপরটি জ্ঞানমার্গ বা নিবৃত্তিমার্গ যাহা উপনিষৎ ভাগে উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রে অনেক স্থলে এ দুইটি 'সাংখ্য' ও 'যোগ' মার্গ বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে (গীঃ ৫।৪ দ্রঃ)। এই দুই মার্গে বিরোধ অতি প্রাচীনকালেই আরম্ভ হইয়াছিল। মহাভারতে অনেক স্থলেই এই বিরোধের উল্লেখ আছে। শুকানুপ্রশ্নে শুকদেব পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কর্ম্ম ও জ্ঞানে বিরোধ

'যদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্যজেতি চ।
কাং দিশং বিদ্যয়া যান্তি কাংচ গচ্ছতি কর্ম্মণা ॥'

—'কর্ম্ম কর, কর্ম্ম ত্যাগ কর, এই দুই-ই বেদের আজ্ঞা। তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা কোন্ গতি লাভ হয়, আর কর্ম্মের দ্বারাই বা কোন্ গতি লাভ হয় ?'—মভা শাং ২৪০।১

মহাভারতে বিভিন্ন স্থলে ইহার দুই রকম উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এক উত্তর এই—

'কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥'—শাং ২৫০।৭

—'কর্ম্মদ্বারা জীব বদ্ধ হয়, জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয়, সেই হেতু পারদর্শী যতিগণ কর্ম্ম করেন না।'

ইহাই বৈদান্তিক সন্ন্যাসমার্গ বা নিবৃত্তিমার্গ। কর্ম্মদ্বারা বন্ধন হয় একথা সর্ব্বসম্মত, কিন্তু সেজন্য কর্ম্মত্যাগ না করিলেও চলে, ফলাসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন করিয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন হয় না, কেননা বন্ধনের কারণ আসক্তি, কর্ম্ম নয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নেরই উত্তর অন্যত্র এইরূপ দেওয়া হইয়াছে।—

'তদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্যজেতি চ।
তস্মাদ্ধর্ম্মানিমান্ সর্ব্বান্নাভিমানাৎ সমাচরেৎ ॥'
'তস্মাৎ কর্ম্মসু নিঃস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ।'

কর্ম্ম কর, কর্ম্ম ত্যাগ কর, উভয়ই বেদাজ্ঞা। সেই হেতু—কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম করিবে (বন, ২।৭৪)। সেই হেতু যাঁহারা পারদর্শী তাঁহারা আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন (অশ্ব, ৫১।৩২)।

শ্রীগীতায়ও এই কথাই পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে—'তস্মাৎ অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর' (৩।১৯, ৪।১৮-২৩ ইত্যাদি)। ইহাই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, শ্রীগীতার প্রথম কয়েক অধ্যায়ে ইহা নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই মত গীতার পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন ঈশোপনিষদে ইহা

শ্রীগীতার মত

স্পষ্ট ভাষায় উপদিষ্ট হইয়াছে ('কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ'—ঈশ ২।১১)।

বস্তুতঃ বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যেও পূর্ব্বাবধিই দুই পক্ষ ছিল। এক পক্ষ বলিতেন, জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী, কর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না। অপর পক্ষ বলিতেন, নিষ্কাম কর্ম্মে বন্ধন হয় না, সুতরাং মোক্ষার্থ কর্ম্মত্যাগের প্রয়োজন নাই, ফলত্যাগ করিলেই হয়। ইহাই বৈদান্তিক কর্ম্মযোগ বা যোগমার্গ। জ্ঞানমূলক সন্ন্যাসমার্গ বুঝাইতে 'সাংখ্য' শব্দ এবং জ্ঞানমূলক নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বুঝাইতে 'যোগ' শব্দ মহাভারতে ও শ্রীগীতায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে (গীঃ ৫।৪।৫)।

বৈদিক কর্ম্মযোগ
বৈদান্তিক কর্ম্মযোগ

বেদসংহিতায়, স্মৃতিশাস্ত্রে এবং মীমাংসাদি শাস্ত্রে কর্ম্ম বলিতে যাগযজ্ঞাদিই বুঝায়। উহা বৈদিক কর্ম্মযোগ। কিন্তু শ্রীগীতায় কর্ম্ম শব্দ সাধারণতঃ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। জীবনের সমস্ত কর্ম্ম ('সর্ব্বকর্ম্মাণি') নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে লোকসংগ্রহার্থ করিতে পারিলেই উহা যজ্ঞ হয়। এই জীবনযজ্ঞকে কামনাশূন্য করিয়া ঈশ্বরমুখী করাই শ্রীগীতার উদ্দেশ্য ও উপদেশ ; কারণ উহাতেই জীবের মোক্ষ ও জগতের অভ্যুদয় যুগপৎ সাধিত হয়। এই স্থলেই গীতোক্ত নিষ্কাম বৈদান্তিক কর্ম্মযোগ ও কাম্য কর্ম্মাত্মক বৈদিক কর্ম্মযোগের পার্থক্য। এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ প্রবৃত্তিমার্গ হইলেও উহা প্রকৃত পক্ষে নিবৃত্তিমূলক, কেননা কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনাত্যাগই উহার মূল কথা এবং উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ত্যাগ আর কি আছে? তাই শ্রীভগবান্ শ্রীগীতাতে বলিয়াছেন—যিনি সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে একরূপ দেখেন তিনিই যথার্থদর্শী। যিনি ফলত্যাগী তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসে আর বেশি কি আছে? ('একং সাংখ্যং চ যোগংচ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি' ইত্যাদি—গীঃ ৫।৪-৬)।

বস্তুতঃ এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ-সাধনাও সহজসাধ্য নহে, এবং ব্যাপকভাবে উহা প্রচলিতও হয় নাই। বৈদিক কাম্যকর্ম্ম এবং কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস, এই দুই মতই পূর্ব্বাপর প্রচলিত ছিল এবং উহাদের মধ্যে বিরোধও চলিতেছিল।

স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্র

স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ এই দুই মতের সংযোগ করিয়া এই ব্যবস্থা করিলেন যে, মোক্ষলাভের জন্য কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ই প্রয়োজনীয়।

'দ্বাভ্যামেব হি পক্ষাভ্যাং যথা বৈ পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥'—হারীত ৭।৯।১১

কর্ম্ম ও জ্ঞানের সংযোগ সাধনার্থ স্মৃতিশাস্ত্র বয়োভেদানুসারে চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা করিলেন। প্রথম ২৫ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিদ্যাভ্যাস ও সংযমশিক্ষার

ব্যবস্থা, তৎপর ২৫ বৎসর গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্ম্মসংযুক্ত অর্থকাম সেবা, পরে বানপ্রস্থাশ্রমে মুনিবৃত্তি অবলম্বন এবং সন্ন্যাসাশ্রমে কর্ম্মত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচিন্তা করার ব্যবস্থা। এইরূপে প্রথম দুই আশ্রমে কর্ম্মমার্গ এবং শেষের দুই আশ্রমে জ্ঞানমার্গ বিহিত হইল এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ মানব-জীবনের ঈপ্সিত এই চতুর্ব্বর্গলাভের ব্যবস্থা হইল।

চতুরাশ্রম ব্যবস্থায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের সংযোগ

চতুর্ব্বর্গের অন্তর্গত ধর্ম্ম শব্দের অর্থ ধর্ম্মশাস্ত্র-বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং যজ্ঞদানাদি যাবতীয় পুণ্যকর্ম্ম। কাম শব্দের অর্থ বিষয়োপভোগ। এইরূপে গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্ম্ম সংযুক্ত অর্থ-কাম বা বিষয়োপভোগ দ্বারা ভোগবাসনা ক্ষয় করিয়া পরে মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মানুধ্যান করিতে করিতে তনুত্যাগ করিবে, এই সকল শাস্ত্রের উপদেশ। ব্রহ্মলাভই লক্ষ্য, সংসারটা উপলক্ষ্য মাত্র। সংসারে মানবের যে সকল অবশ্য-কর্ত্তব্য আছে তাহাকে আমাদের শাস্ত্রে 'ঋণ' বলে। অধ্যয়নাদি দ্বারা ঋষিঋণ, বিবাহ ও বংশরক্ষা দ্বারা পিতৃঋণ, যজ্ঞাদি দ্বারা দেব-ঋণ এবং আতিথ্য-সৎকার এবং অন্নদানাদি দ্বারা নর-ঋণ ও ভূতঋণ শোধ করিতে হয়। ইহাই হিন্দুর সংসার-ধর্ম্ম। গার্হস্থ্যাশ্রমে এই সকল সাংসারিক কর্ত্তব্য শেষ করিয়া শেষে বনবাসী হইয়া মোক্ষপথের পথিক হইতে হয়, উহাই চরম লক্ষ্য। জীবনের কোন্ সময়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে সে সম্বন্ধে মহাভারতে বিদুর-নীতিতে এইরূপ উপদেশ আছে—

চতুর্ব্বর্গের অর্থ কি

হিন্দুর সংসারধর্ম্ম অর্থ—ঋণশোধ

'উৎপাদ্য পুত্রাননৃণাংশ্চ কৃত্বা বৃত্তিং চ তেভ্যোঽনুবিধায় কাঞ্চিৎ।
স্থানে কুমারীঃ প্রতিপাদ্য সর্ব্বা অরণ্যোসংস্থোঽয়ং মুনির্বুভূষেৎ॥'

—'বিবাহান্তর পুত্র উৎপাদন করিয়া, তাহাদিগকে অঋণী করিয়া, তাহাদিগের জীবিকার্জ্জনের কিছু বিধি-ব্যবস্থা করিয়া দিয়া এবং কন্যাসকলকে সৎপাত্রে অর্পণ করিয়া পরে বনবাসী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা করিবে।' সাধারণতঃ পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম হইলেই বনগমনের ব্যবস্থা ('পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ')।

পূর্ব্বোক্ত বিদুর-নীতির প্রথমাংশ সমর্থ পক্ষে সংসারী লোকে সকলেই অনুসরণ করেন, কিন্তু শেষের দুই আশ্রম অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ এখন লুপ্তপ্রায়। এখন বনবাসী কেহ বড় হন না, বরং বড় চাকুরিয়ারা কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ (retire) করিয়া অনেকে সহরবাসী হন। কিন্তু প্রাচীনকালে উহাই প্রশংসনীয় রীতি ছিল। কবি কালিদাস রঘুবংশীয় রাজগণের আদর্শ-জীবনের প্রশংসাচ্ছলে উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহারা এই চতুরাশ্রম ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিতেন—

'শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুতজ্যাম্॥'—রঘুবংশ

—'তাঁহারা বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন, যৌবনে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া বিষয়ভোগ করিতেন, বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া মুনিবৃত্তি গ্রহণ করিতেন এবং অন্তিমে সন্ন্যাসাশ্রমে সমাধিযোগে আত্মাকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া তনুত্যাগ করিতেন।'

কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর

পূর্ব্বালোচনায় আমরা দেখিলাম এই সকল শাস্ত্রের মুখ্য কথা হইতেছে ব্রহ্ম-লাভ বা মোক্ষলাভ, উহাই মানব জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু ব্রহ্মলাভ বা ব্রাহ্মীস্থিতিকে মোক্ষলাভ বলা হয় কেন? মোক্ষ অর্থ মুক্তি, মোচন; মোচন অর্থ বন্ধন-মোচন, বন্ধন হইতে মুক্তি। এস্থলে কিসের বন্ধন?—কর্ম্ম-বন্ধন, সংসার-বন্ধন। কর্ম্মকে ও সংসারকে বন্ধনের কারণ বলা হয় কেন? সৃষ্টিকর্ত্তা জীবসৃষ্টি করিয়াছেন, জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি দিয়াছেন, কর্ম্মশক্তি দিয়াছেন, জীবকে সংসারে পাঠাইয়াছেন কি বন্ধনের জন্য? তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর পক্ষে এ সকল প্রশ্ন স্বাভাবিক।

মোক্ষ বলিতে কি বুঝায়

এই মোক্ষবাদের মূলে আছে একটি দার্শনিক মত—জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদ। **আত্মার অবিনাশিতা ও পুনর্জ্জন্ম, হিন্দুধর্ম্মের দুইটি প্রধান মৌলিক তত্ত্ব।** পূর্ব্বে আমরা সৃষ্টির ক্রম-বিকাশ ও জীবাত্মার ক্রমোন্নতি বিষয়ক আলোচনা করিয়াছি (১৮-২০ পৃঃ)। সে সকল কথার স্থূল মর্ম্ম হইল এই যে, যে পরব্রহ্ম হইতে জীবের উদ্ভব সেই পরব্রহ্মে লীন হওয়া বা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়াই জীবের পরম লক্ষ্য বা চরম গতি। যে পর্য্যন্ত জীব তাহার উপযোগী না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়—'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ, ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'—যে জন্মে তার মরণ নিশ্চিত, যে মরে তার জন্ম নিশ্চিত—(গীঃ ২।২৭)। এই মতের সহিত যুক্ত আছে কর্ম্মবাদ। কর্ম্মবাদের মর্ম্ম এই যে, জীবের জাতি, আয়ু এবং সুখদুঃখাদি ভোগ, এ সমস্তই তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত হয়।—কেহ অল্পায়ু, কেহ দীর্ঘায়ু, কেহ চিরসুখী, কেহ চিরদুঃখী, এ সকল বৈষম্যের কারণ কি?—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।

জন্মান্তরবাদ

কর্ম্মবাদ

'সতি মূলে তদ্‌বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ'—যোঃ সূঃ ২।১৩

—'এ জন্মের কৃত কর্ম্মের বিপাকে পরজন্মের জাতি, আয়ুঃ ও সুখদুঃখাদি ভোগ নির্দ্দিষ্ট হয়।'

'যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি'—বৃহ, ৪।৪।৫

—'যে যেরূপ কর্ম্ম করে তদ্রূপই তাহার গতি হয়।'

ঈশ্বর দেব-মানব-পশ্বাদি সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও দেবতা করিয়াছেন, কাহাকেও মানুষ করিয়াছেন, কাহাকেও পশ্বাদি যোনিতে প্রেরণ করিয়াছেন। কাহাকেও ধনীর গৃহে, কাহাকেও দরিদ্রের গৃহে পাঠাইয়াছেন। কাহাকেও দীর্ঘায়ু, কাহাকেও অল্পায়ু করিয়াছেন। এই কারণে ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্করুণত্ব দোষ আইসে। এই আপত্তির উত্তরে ব্রহ্মসূত্র বলেন—

'বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি'—ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে নেশ্বরস্য প্রসজ্যেতে। কস্মাৎ? সাপেক্ষত্বাৎ। সাপেক্ষাহীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে। কিমপেক্ষত ইতি চেৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অপেক্ষত ইতি বদামঃ। অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণিধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিরিতি নায়মীশ্বরস্যাপরাধঃ।
—শাঙ্কর-ভাষ্য।

এ-কথার অর্থ এই—এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরের বৈষম্য (পক্ষপাত) ও নৈর্ঘৃণ্যের (নিষ্করুণতা) কথা উঠিতে পারে না, কারণ তিনি কোন-কিছুর জন্য অপেক্ষা না করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তাহা যদি করিতেন তবে তাহাতে বৈষম্যদোষ আসিত। তিনি সাপেক্ষ হইয়াই বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কি অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? জীবের পূর্ব্ব জন্মকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম অপেক্ষা করিয়া? যাহার যেমন কর্ম্ম তাহার তেমন জন্ম। সুতরাং ঈশ্বরে বৈষম্যদোষ স্পর্শে না।

জগতের বৈষম্যের কারণ কি

জগতের বৈষম্যের কারণ কি তাহা বুঝাইবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা সমীচীন মত অপর কিছু অনুসন্ধানে মিলে না। অন্যথায় সৃষ্টিকর্ত্তাকে পক্ষপাতী, নিষ্করুণ, খামখেয়ালী বলিতে হয়, অর্থাৎ তাঁহার ঈশ্বরত্বই অস্বীকার করিতে হয়।

প্রঃ। কিন্তু এই যুক্তির মধ্যে একটা অসঙ্গতি থাকিয়া যায়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে ইহজন্মের সুখদুঃখ ভোগ হয়, আবার পূর্ব্বজন্মের সুখদুঃখাদি তৎপূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে ঘটিয়াছে, এইরূপই চলিতেছে। ইহাতে বর্ত্তমানে জগতে যে বৈষম্য দেখা যায় ইহার মীমাংসা করিতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন প্রথম জীবের জন্ম হইল তাহা কোন্ কর্ম্মের ফলে? বৈষম্য লইয়া তো সৃষ্টি। জন্ম আগে না কর্ম্ম আগে?

উঃ। কুশাগ্রধী দার্শনিকগণ যে এ অসঙ্গতি দর্শন করেন নাই তাহা নহে। তাঁহারা ইহারও মীমাংসা করিয়াছেন, আর সে মীমাংসা হিন্দুর পক্ষে কঠিন নহে। কেননা, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টি অনাদি। সৃষ্টির যখন আদি নাই তখন আদি সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছিল সে প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না। তাই এ আপত্তির উত্তরে ব্রহ্মসূত্র বলেন—

'অবিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ'—ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৫

নৈষ দোষঃ, অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। ভবেদেষ দোষো যদি আদিমান্ সংসারঃ স্যাৎ। অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবৎ হেতুহেতুমদ্ভাবেন কর্ম্মণঃ সর্গবৈষম্যস্য প্রবৃত্তির্ন বিরুদ্ধ্যতে। —শাঙ্কর-ভাষ্য।

একথার অর্থ এই যে—সংসার যখন অনাদি তখন আদি সৃষ্টির অনুসন্ধান করিতে যাওয়া নিরর্থক। যে সৃষ্টি লইয়াই বিচার কর না কেন, ইহার পূর্ব্বে অন্য সৃষ্টি ছিল, এবং সেই পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টিতে জীবের কৃত কর্ম্মই পরবর্ত্তী সৃষ্টির ফলপ্রসূ হইয়া ভোগ-বৈষম্য সৃষ্টি করে। বৃক্ষ হইতে বীজ, আবার বীজ হইতে বৃক্ষ, অনাদিকাল হইতে এইভাবেই চলিতেছে। ইহার কোন্‌টি আগে তাহার মীমাংসা হয় না, জন্ম ও কর্ম্মের সম্বন্ধও ঐরূপ, ইহার আদি নির্ণয় করা যায় না। ইহাকে বীজাঙ্কুর ন্যায় বলে। হিন্দুশাস্ত্রমতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি (গীঃ ১৩।১৯)। প্রলয়ে প্রকৃতি (কর্ম্মবীজ) পরব্রহ্মে লুপ্ত থাকে, পরবর্ত্তী সৃষ্টিতে আবার ফলপ্রসূ হয়।

সুতরাং দেখা গেল, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগের জন্যই জীবের জন্ম এবং ইহজন্মের কর্ম্মফল ভোগের জন্য পুনর্জ্জন্ম। ভোগ ব্যতীত কর্ম্ম কখনই ক্ষয় হয় না।

'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥'

—'শতকোটি কল্পেও ভোগ ভিন্ন কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।' এই কর্ম্মফল ভোগের জন্য জীবকে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিসঙ্কুল সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। ইহারই নাম কর্ম্ম-বন্ধন ; ইহা হইতে মুক্তির নামই মোক্ষ। সংসার দুঃখময়, জীব ত্রিতাপে তাপিত, কর্ম্মই ইহার কারণ। তাই মোক্ষলাভের জন্য কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাসের ব্যবস্থা। ইহাই দুঃখবাদ ও মোক্ষবাদ।

কর্ম্ম-বন্ধন কাহাকে বলে

কাপিল সাংখ্যদর্শন

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহের প্রায় সকলেরই উদ্ভব দুঃখবাদে। দুঃখবাদেই কাপিল সাংখ্যদর্শনের আরম্ভ। সংসার দুঃখময়, জীব ত্রিবিধ তাপে তাপিত, এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ, উহাই মোক্ষ। ('অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ'—সাঃ সূঃ ১।১)। সেই অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তির উপায় কি ?—জ্ঞান। ('জ্ঞানান্মুক্তিঃ'—সাঃ সূঃ ২।৩)। কিসের জ্ঞান ?—পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান, প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য-জ্ঞান। ইহারই নাম কৈবল্য-সিদ্ধি বা 'কেবল' হওয়া। বেদান্তে যাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষায় তাহাই প্রকৃতি ও পুরুষ এবং

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি-বিবেক। এই জ্ঞানলাভ হইলেই সংসার-ক্ষয় হয়। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র মূল তত্ত্ব।

সাংখ্যমত গীতা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন

বেদান্ত ও গীতামতে পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাই মূল তত্ত্ব এবং দেহস্থিত এই পুরুষই পরমাত্মা। যিনি এই পুরুষকে পরমাত্মা বলিয়া জানেন তিনি মুক্ত। এই ভাবে গীতা সাংখ্যশাস্ত্রের উপপত্তি সর্ব্বথা ত্যাগ না করিয়া বেদান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া দিয়াছেন (গীঃ ৭।৪-৫, ১৩।১।২।৫।৬।১৯।৩৪, ১৪।১-৪ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

পাতঞ্জল যোগানুশাসন

সাংখ্যতত্ত্বই পাতঞ্জল দর্শনের ভিত্তি। সাংখ্যের কৈবল্যসিদ্ধি কিরূপে লাভ হইতে পারে তাহাই এই শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। উহারও উদ্দেশ্য 'আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি' বা মোক্ষ। এই শাস্ত্র বলেন, বিবেকী পুরুষেরা সমস্তই দুঃখময় বলিয়া বিবেচনা করেন। ভবিষ্যতে আর দুঃখ না হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ('দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।'—যোঃ সূঃ)। এই শাস্ত্র একাধারে দর্শন ও যোগ। ইহাতে যে যোগ-সাধন বিবৃত হইয়াছে তাহাকে সমাধিযোগ বা নিরোধযোগ বলে ('যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ')। ইহাকে রাজযোগ বা অষ্টাঙ্গ যোগও বলা হয়। উহার অষ্ট অঙ্গ এই—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। ধারণার পরিপক্ক অবস্থা ধ্যান, ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থা সমাধি। এই তিনটিই অন্তরঙ্গ সাধন, অপরগুলি বহিরঙ্গ সাধন।

শ্রীগীতায়ও ধ্যানযোগের উপদেশ ও উচ্চপ্রশংসা আছে। বস্তুতঃ ধ্যানযোগ সকল সাধন-প্রণালীরই অন্তর্ভুক্ত, কেননা ইষ্ট বস্তুর ধ্যান-ধারণা ব্যতীত সাধন হয় না। কিন্তু ইষ্ট সকলের এক নহে। পাতঞ্জল যোগের উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া, ইহাকেই মোক্ষ বলা হয়। নির্বীজ সমাধি দ্বারা এই অবস্থা লাভ হয়, তখন চিত্তের বৃত্তিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, শরীরটা যতদিন থাকে, দগ্ধ সূত্রের ন্যায় আভাসমাত্রে অবস্থান করে। কিন্তু গীতোক্ত ধ্যানযোগের উদ্দেশ্য ও ফল ঠিক ইহা নহে। শ্রীগীতামতে, যিনি ভগবানে যুক্তচিত্ত তিনিই শ্রেষ্ঠ ধ্যানযোগী (গীতা ৬।২৯।৩০।৪৭)।

ধ্যানযোগ গীতা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন

ভক্তিপ্রধান পৌরাণিক যুগ

পূর্ব্বে সনাতন ধর্ম্মের যে সকল বিভিন্ন অঙ্গের উল্লেখ করা হইল—বৈদিক কর্ম্মযোগ, বৈদান্তিক জ্ঞানযোগ ও পাতঞ্জল রাজযোগ বা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ—এ সকলের

কোনটিতেই ভক্তির প্রসঙ্গ নাই। ষড়্‌দর্শনের মধ্যে বেদান্ত ব্যতীত প্রায় সকলগুলিই নিরীশ্বর। বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মবাদেও ভক্তির স্থান নাই। যাঁহা নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, অচিন্ত্যস্বরূপ তাঁহার সহিত ভাব-ভক্তির কোন সম্বন্ধ স্থাপন করা চলে না, উহা আত্মবোধরূপ। সগুণব্রহ্ম ভিন্ন ভক্তিমূলক উপাসনা সম্ভবপর হয় না। বস্তুতঃ উপনিষদে ব্রহ্মস্বরূপের সগুণ-নির্গুণ উভয়বিধ বর্ণনাই আছে এবং পরব্রহ্মের বর্ণনায় অনেক স্থলে দেব, ঈশ্বর, মহেশ্বর, ভগবান্ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং 'যস্য দেবে পরাভক্তিঃ' এরূপ কথাও আছে। (অমৃতবিন্দু, শ্বেতাশ্বেতর ইত্যাদি)। বস্তুতঃ ভক্তিমার্গ বেদোপনিষৎ হইতেই বহির্গত হইয়াছে।

সনাতন ধর্ম্মে ভক্তি-মার্গের উদ্ভব পরবর্ত্তী কালীন

যখন এই ভক্তিমার্গ প্রাধান্য লাভ করিল তখন সনাতন ধর্ম্মের সম্পূর্ণ রূপান্তর সংঘটিত হইল। ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদে দেবগণের কোন স্থান ছিল না, তাঁহারা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ভক্তিমার্গের প্রবর্ত্তনে সেই প্রাচীন বৈদিক দেবগণই পরব্রহ্মের স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু ইহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি আরম্ভ হইল। দেবতা একাধিক, সুতরাং পরব্রহ্মের স্থান লইয়া তাঁহাদের মধ্যে অর্থাৎ তাঁহাদের ভক্তগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নানারূপ মতভেদ উপস্থিত হইল। এইরূপে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এবং তত্তৎ মতের পরিপোষক বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণাদি প্রণীত ও সঙ্কলিত হয়।

ভক্তিমার্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব

বৈদিক দেবতাগণের মধ্যে প্রথমে ইন্দ্রদেবের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। বেদ-সংহিতায় ইন্দ্রদেবের স্তুতিমূলক যত সূক্ত আছে, এত আর কোন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই। কিন্তু কালে ইন্দ্রের প্রাধান্য খর্ব্ব হইতে থাকে এবং বিষ্ণুর প্রাধান্য বর্দ্ধিত হয়। কোন কোন সূক্তে বিষ্ণুকে ইন্দ্রের সহযোগী সখা বলা হইয়াছে ('ইন্দ্রস্য যুজ্য সখা'—ঋক্ ১।২২।১৯ বিষ্ণুসূক্ত)। শেষে ইন্দ্রের স্থানে বিষ্ণুই সুপ্রতিষ্ঠিত হন এবং পরব্রহ্ম বলিয়া পূজিত হন। পুরাণে ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতামাত্র, বিষ্ণুই পরতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করিয়া দিলেন, ইন্দ্র হতমান হইয়া শেষে পরব্রহ্মরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিলেন ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনী এই পরিবর্ত্তন সূচিত করে। বিষ্ণু অর্থ সর্ব্বব্যাপী দেবতা। এই সর্ব্বব্যাপিত্ব নিবন্ধনই বিষ্ণুর প্রাধান্য, সর্ব্বব্যাপিত্ব ব্রহ্মের লক্ষণ। শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও বিষ্ণু একই। এই হেতু সগুণ ব্রহ্মোপাসনা বা ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তিত হইলে বিষ্ণুই পরব্রহ্মরূপে গৃহীত হন এবং পরে রাম-কৃষ্ণাদি অবতাররূপেও পূজিত হন। এই কারণে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত ভক্তিমার্গ বিশেষ সংশ্লিষ্ট।

ভক্তিমার্গে বৈষ্ণব মত

প্রথমাবস্থায় ভক্তিমার্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল শৈব ধর্ম্ম। বেদে রুদ্র দেবতারও বিশেষ প্রভাব ছিল। যজুর্বেদে রুদ্রসূক্তে রুদ্র পশুপতিই পরমেশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রুদ্র, শিব, পশুপতি ইত্যাদি নামের বিশিষ্ট অর্থ আছে এবং শিবতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া শৈব-দর্শন ও পুরাণাদিও প্রণীত হইয়াছে। শিবই সমস্ত আগম শাস্ত্রের বক্তা বলিয়াও প্রখ্যাত হইয়াছেন। এক্ষণে সম্প্রদায়রূপে এই মতের বিশেষ প্রাধান্য নাই, তবে শিব-তত্ত্ব বৈষ্ণবগণেরও মান্য। বস্তুতঃ, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে হরিহরে কোন ভেদ নাই, শাস্ত্রাদিতে একথা নানা স্থলে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক সংস্কারবশতঃ ভেদবুদ্ধি প্রচলিত রাখিতেই অনেকে ব্যগ্র, কিন্তু দেবতা অনেক থাকিলেও ঈশ্বর এক; যিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার ভেদবুদ্ধি নাই, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র—

ভক্তিমার্গে শৈব মত

'যথা শিবময়ো বিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ঃ শিবঃ।
যথান্তরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তিরায়ুষি॥'—স্কন্দোপনিষৎ

'বিষ্ণু যে প্রকার শিবময়, শিবও সেই প্রকার বিষ্ণুময়, আমার জীবন এমন মঙ্গলময় হউক যেন আমি ভেদ দর্শন না করি।'

ভক্তিমার্গের আলোচনায় আর একটি দেবতার কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি শক্তি, মহামায়া। ব্রহ্মবস্তুকে যখন সগুণ, সক্রিয় বলিয়া ধারণা করা হয়, তখনই তাঁহার শক্তির চিন্তা করিতে হয়, কেননা শক্তিরই প্রকাশ হয় ক্রিয়াতে। শক্তি ও শক্তিমান এক, যেমন অগ্নি ও উহার দাহিকা-শক্তি। দাহিকা-শক্তি ব্যতীত অগ্নির অগ্নিত্ব নাই, শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের কার্য্য-ক্ষমতা নাই। সুতরাং শক্তিই উপাস্যা। ইহাই শাক্ত মত।

ভক্তিমার্গে শাক্ত মত

বেদান্ত বলেন—'তজ্জলানিতি' বা 'জন্মাদ্যস্য যতঃ',—ইহার অর্থ—যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয় তাহাই ব্রহ্ম।

শ্রীচণ্ডী বলেন—'সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি'—তুমি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের শক্তি-স্বরূপিণী।

বেদান্তে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, শ্রীচণ্ডীতে তাহাই ব্রহ্মশক্তিতে আরোপ করিয়া প্রকাশ করা হইল। তত্ত্বতঃ পার্থক্য কিছু নাই।

বিষ্ণুমন্দিরে বৈষ্ণবভক্ত শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া 'সচ্চিদানন্দময়' বলিয়া বন্দনা করেন। কালীমন্দিরে শাক্তভক্ত শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া 'সচ্চিদানন্দময়ী' বলিয়া বন্দনা করেন। আর যিনি একাধারে শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, সবই, তিনি কি করেন? তাহার একটি চিত্র এই—

'ঠাকুর (পরমহংসদেব) যোড়হস্তে জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে মূলমন্ত্র জপ করিলেন। তৎপর মধুস্বরে নাম করিতেছেন। বলিতেছেন—গোবিন্দ, গোবিন্দ, সচ্চিদানন্দ, হরিবোল, হরিবোল। নাম করিতেছেন, আর যেন মধুবর্ষণ হইতেছে। ভক্তেরা অবাক্ হইয়া সেই নামসুধা পান করিতেছেন।'—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

মত পথ—পরমহংসদেবের শিক্ষা

তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—'সব এক, যার যা ভাব ; মত পথ।'

শ্রীগীতার শিক্ষা

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় এই উদার ধর্ম্মমত শিক্ষা দিয়াছেন—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং'—যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। (৪৫ পৃঃ দ্রঃ)।

অষ্টাদশ শতকে এই সকল সাম্প্রদায়িক মতভেদ ও বাদবিসংবাদ অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কার, শাস্ত্রানুগত্য ও কৌলিক প্রথানুবর্ত্তন ইত্যাদি নানা কারণে এইরূপ মতভেদ হয়। সেকালে শাক্ত ও ভক্তের বিবাদ উপলক্ষে যে সকল পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হইত তাহাদের নামগুলিও বড় মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক নহে। এক পক্ষ একখানি পুস্তকের নাম দিলেন—'দুর্জ্জনমুখচপেটিকা'। প্রতিপক্ষ তদুত্তরে দুইখানি পুস্তক লিখিয়া উহাদের নাম দিলেন—'দুর্জ্জনমুখমহাচপেটিকা' ও 'দুর্জ্জনমুখ-পাদুকা'। এ সকল ধর্ম্মের গ্লানি ও সমাজের ব্যাধি।

বাদ-বিসংবাদ সমাজের ব্যাধি

'শাক্ত' ও 'ভক্ত' উভয়েই কিন্তু ভক্ত। অধুনা ভাগবত ধর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মই বুঝায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি ভক্তিমার্গের উপাসক সকল সম্প্রদায়ই ভাগবত ধর্ম্মাবলম্বী। কেননা ইঁহারা সকলেই অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মতত্ত্বের স্থলে ভগবত্তত্ত্ব অর্থাৎ ভক্তের ভগবান্ বলিয়া একটি বস্তু স্বীকার করেন। ইঁহারা সকলেই সগুণ ঈশ্বর, নিত্যা প্রকৃতি, জগতের সত্যতা, এবং ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। বৈদিক কর্ম্মবাদ ও বৈদান্তিক নির্গুণ ব্রহ্মবাদ হইতে পৌরাণিক ভাগবত ধর্ম্মের এই সকল বিষয়েই পার্থক্য। বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি যে একই মূল তত্ত্বের বিভিন্ন বিকাশ বা মূর্ত্তি তাহা সকল শাস্ত্রেই বলেন ('একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ইত্যাদি)। শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণব পুরাণ, দেবী ভাগবত শাক্ত পুরাণ, উভয়কেই 'ভাগবত' বলা হয়, কারণ উভয়ই ভক্তিমার্গ বা ভাগবত ধর্ম্মের গ্রন্থ।

সকলেই ভাগবত ধর্ম্মী

কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কথিত ধর্ম্মতত্ত্বই ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, কারণ শ্রীগীতাতেই প্রথম ভক্তিমার্গ একটি বিশিষ্ট নিষ্ঠা বলিয়া স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বালোচনায় আমরা দেখিয়াছি, মীমাংসকদিগের বৈদিক কর্ম্মবাদ, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও জ্ঞানযোগ, স্মৃতিশাস্ত্রের চতুরাশ্রম ব্যবস্থা এবং কর্ম্ম-জ্ঞানের সমুচ্চয়ে চতুর্ব্বর্গ সাধনা, সাংখ্য ও পাতঞ্জলের কৈবল্য মুক্তি, এ সকলে কর্ম্ম, জ্ঞান, ও যোগ-সাধনার কথা আছে, কিন্তু এই সকল শাস্ত্রে ভক্তির কোন প্রসঙ্গ নাই। পরবর্ত্তী কালে ভক্তির প্রবর্ত্তনে ভারতীয় চিন্তাধারার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মহাভারত এই পরিবর্ত্তন যুগের গ্রন্থ এবং শ্রীগীতাতেই এই পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ রূপ পাইয়াছে। জ্ঞান, ধ্যানাদি সাধনপথ তৎকালে প্রচলিত ছিল, একথা শ্রীগীতাতেও উল্লিখিত আছে (গীঃ ১৩।২৪-২৫)। শ্রীগীতা ঐ সকল বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর যাহা সারতত্ত্ব তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার সহিত ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তি যোগ করিয়া একটি বিশিষ্ট যোগধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। শ্রীভগবানের কথিত এই ধর্ম্মই **ভাগবত ধর্ম্ম** বলিয়া পরিচিত। উহাই এখন আলোচ্য।

শ্রীগীতাতেই ভক্তিমার্গের প্রথম প্রচার

আমরা দেখিয়াছি পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মবাদী ও ব্রহ্মবাদী বা জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে কর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মতত্ত্ব ও জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কর্ম্মবাদিগণের মতে যাগযজ্ঞাদি বেদ-বিহিত কর্ম্মই জীবের একমাত্র নিঃশ্রেয়স, পক্ষান্তরে জ্ঞানবাদিগণের মতে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ এবং কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাসই একমাত্র মোক্ষের পথ। শ্রীগীতা মীমাংসকদিগের কর্ম্ম রাখিলেন, যজ্ঞ রাখিলেন, জ্ঞানবাদীদিগের ন্যায় বন্ধনের কারণ বলিয়া উহা অগ্রাহ্য করিলেন না, কর্ম্ম ও যজ্ঞের অর্থ সম্প্রসারণ করিলেন, কর্ম্মকে নিষ্কাম করিয়া জ্ঞানপূত ও দোষমুক্ত করিলেন এবং ঈশ্বরার্পিত করিয়া ভক্তিপূত করিলেন। জীবন কর্ম্মময়, কর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিলে জীবনই অগ্রাহ্য করা হয়। শ্রীভগবান্ বলিলেন—তুমি যাহা কিছু কর সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে (গী ৯।২৭), জীবনের সমস্ত কর্ম্মই ('সর্ব্বকর্ম্মাণি') অনাসক্ত চিত্তে লোকহিতার্থ যজ্ঞস্বরূপে সম্পন্ন করিবে। নিষ্কামভাবে লোকরক্ষার্থ ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে যে কর্ম্ম করা যায় তাহাই যজ্ঞস্বরূপ, এরূপ কর্ম্ম বন্ধনের কারণ নহে (গীঃ ৪।২৩, ৩।৯)। ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমানই বন্ধনের কারণ। আসক্তি ও অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে বন্ধন হয় না, বরং উহাতে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। উহাই কর্ম্মযোগ। কিন্তু আত্মজ্ঞান ব্যতীত অহংত্যাগ হয় না; সুতরাং কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভার্থ জ্ঞানলাভের প্রয়োজন। তাই শ্রীভগবান্ জ্ঞানবাদীদিগের জ্ঞানযোগের জ্ঞান রাখিলেন, কিন্তু উহাকে সন্ন্যাসবাদের নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া ত্যাগমূলক

বৈদিক কর্ম্মযোগ ও গীতোক্ত কর্ম্মযোগ এক কথা নহে

নিষ্কাম কর্ম্মের সহিত যুক্ত করিয়া বিশ্বকর্ম্মের সহায়ক করিলেন। কিন্তু গীতোক্ত যোগে জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই যে বৈদান্তিক জ্ঞানযোগ বলিয়া যাহা পরিচিত তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে তাহা নহে। বৈদান্তিক জ্ঞানযোগের সহিত সন্ন্যাসবাদ ও কর্ম্মত্যাগ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, শ্রীগীতায় সর্ব্বত্রই তাহার প্রতিবাদ। আবার সে জ্ঞানযোগে ভক্তির স্থান নাই, গীতা আদ্যোপান্ত ভক্তিবাদে সমুজ্জ্বল,—সতত আমাকে স্মরণ কর, আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার ভজনা কর, আমাতেই সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ কর, একমাত্র আমারই শরণ লও,—সর্ব্বত্রই এইরূপ ভগবদ্ভক্তির উপদেশ।

জ্ঞান ও জ্ঞানযোগ এক কথা নহে

সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে সন্ন্যাসমার্গাবলম্বী সাংখ্যজ্ঞানীদের আচরিত যে সাধন-প্রণালী যাহা জ্ঞানযোগ বলিয়া পরিচিত তাহা গীতোক্ত যোগীর অবলম্বনীয় নহে। তবে জ্ঞানলাভের পথ কি? শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয় (৪।৩৮), আরও অভয়বাণী দিতেছেন—'যাহারা সতত আমাতে চিত্তার্পণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন আমার সেই সকল ভক্তগণের অনুগ্রহার্থই তাহাদের অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করি (গীঃ ১০।১০।১১)।' সুতরাং শ্রীগীতামতে কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের এবং জ্ঞানের সহিত ভক্তির কোন বিরোধ নাই, বরং এই তিনের সংযোগে সাধনার সম্পূর্ণতা লাভ হয়।

ভক্তিদ্বারাই জ্ঞানও লাভ হয়

কিন্তু এস্থলে কাপিল সাংখ্যজ্ঞানী ও বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানী উভয়েরই এক গুরুতর আপত্তি আছে। মায়াবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম নির্গুণ নিষ্ক্রিয়; সাংখ্যের পুরুষও তদ্রূপ। কর্ম্ম করে প্রকৃতি। সাংখ্যমতে প্রকৃতি এবং বেদান্তমতে মায়া বা অজ্ঞানই কর্ম্ম বা সংসার-প্রপঞ্চের মূল। সাংখ্যমতে পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে ফিরিয়া আইসে তখনই প্রকৃতির ক্রিয়া বন্ধ হয়। বেদান্তমতেও মায়া বা অজ্ঞানের যখন শেষ হয় তখন জীব ব্রহ্ম হইয়া যায় ('ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'), কর্ম্ম লোপ পায়। সুতরাং এ উভয় মতেই জ্ঞান বা মোক্ষ অর্থ কর্ম্মের শেষ, বিশ্বলীলার লোপ। এই হেতু জ্ঞানবাদীরা বলেন, কর্ম্ম ও জ্ঞান একত্র থাকিতে পারে না।

শ্রীগীতা পুরুষোত্তম-তত্ত্ব দ্বারা এই আপত্তির মীমাংসা করিয়াছেন (৪৬, ১৫৫-৫৬ পৃঃ দ্রঃ)। পরতত্ত্বের বিচারে শ্রীগীতা তিন পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহা দ্বারাই নিরীশ্বর সাংখ্যবাদ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব এবং সগুণ ঈশ্বরবাদ বা ভগবত্তত্ত্বের সমন্বয় করিয়াছেন এবং সেই সমন্বয়মূলক দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি

মিশ্র অপূর্ব্ব যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। এ সকল দার্শনিক পরিভাষা বাদ দিয়া তত্ত্বটি এইরূপ ভাবে সহজ ভাষায় বলা যায়।—

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—প্রকৃতি কর্ম্ম করে তা ঠিক, কিন্তু প্রকৃতি আমারই প্রকৃতি—আমারই শক্তি। ক্ষর ও অক্ষর দুইই আমার বিভাব, আমি পুরুষোত্তম (১৫।১৬-১৮)। আমি কেবল নির্গুণ ব্রহ্ম নহি, আমি প্রকৃতিরও অধীশ্বর, বিশ্ব-প্রকৃতির সকল গতির, সকল কর্ম্মের নিয়ামক; আমা হইতেই জীবের প্রবৃত্তি ('যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী'-১৫।৪, যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্'-১৮।৪৬), আমার কর্ম্ম আমিই করি, তুমি নিমিত্ত মাত্র ('নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্')। যতক্ষণ জীবের এই জ্ঞান থাকে যে ইহা আমার কর্ম্ম, আমি করি, ততক্ষণই সে বদ্ধ, পাপপুণ্যের ফলভাগী। কিন্তু যখন আমার ভক্ত বুঝিতে পারে যে কর্ম্ম তাহার নহে, কর্ম্ম আমার, আমিই সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ন্তা, যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা,—এইরূপে কর্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন করিয়া যখন সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে উৎসর্গ করিতে পারে (৯।২৭।২৮) তখন সে কর্ম্ম করিয়াও উহাতে লিপ্ত হয় না, তার ফলভাগী হয় না ('কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে')। ইহা বদ্ধজীবের কর্ম্ম নয়, জীবন্মুক্ত জ্ঞানী ভক্তের কর্ম্ম, ইহার সহিত জ্ঞানের বিরোধ হইবে কিরূপে? আর এ জ্ঞানের সহিত ভক্তিরও কোন বিরোধ নাই, কেননা এ জ্ঞান কেবল অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান নহে, ইহা 'নির্গুণো-গুণী' সমগ্র পুরুষোত্তমের জ্ঞান, তিনি সর্ব্বলোক-মহেশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃদ, যজ্ঞ-তপস্যাদির ভোক্তা (৫।২৯); সুতরাং তাঁহাতে ভক্তি, সর্ব্বভূতে প্রীতি, এবং যজ্ঞরূপে সমস্ত কর্ম্ম তাহাতে সমর্পণ (৩।৯), ইহাই এই জ্ঞানের লক্ষণ। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, জ্ঞানীই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, আমার আত্মস্বরূপ (৭।১৭।১৮)। এইরূপে শ্রীগীতা কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির সমন্বয়ে সুন্দর সম্পূর্ণ সাধন-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। ইহাই শ্রীগীতার পূর্ণাঙ্গ যোগ।

গীতোক্ত যোগে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির সমন্বয়

বিষয়ক্ষেত্রে, সংসারের কর্ম্মকোলাহলেও এ যোগীর বিক্ষেপ-বিপত্তি নাই, এ সমাধি ভঙ্গের সম্ভাবনা নাই। কেননা এ সমাধি কেবল ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান নহে, উহা সাধন পথের সাময়িক অবস্থা হইতে পারে—এ সমাধির অর্থ ভগবৎ সত্তায় আপন সত্তা মিলাইয়া দেওয়া, তাঁহারই প্রেমানন্দে সর্ব্বকামনা ভুলিয়া তাঁহারই কর্ম্ম বাহিরে দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা সম্পন্ন করা, আর অন্তরে সতত সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাতেই অবস্থান করা ('সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে')। এ যোগী নিত্য-সমাহিত, কর্ম্ম-কোলাহলে তাঁহার চিত্ত-বিক্ষেপের ভয় কি? তাই শ্রীভগবান্ প্রিয় শিষ্যকে সর্ব্বশেষে উপদেশ দিতেছেন—

'চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ১৮।৫৭
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥' ১৮।৫৬

—'মনে মনে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া ফলাফলে সাম্যবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা আমাতে চিত্ত রাখ।

ঈদৃশ ভক্ত আমাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্ম করিতে থাকিলেও আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।'

এখানে তিনটি কথা বলা হইল—

১। 'মচ্চিত্তঃ সততং ভব' অর্থাৎ চিত্তটি ভগবানে নিত্যযুক্ত রাখিতে হইবে।

২। সর্ব্বকর্ম্ম মনে মনে ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে।

৩। সমত্ববুদ্ধি অবলম্বন করিয়া সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে।

কর্ত্তার বাসনাত্মিকা বুদ্ধি যদি নিষ্কাম হইয়া শুদ্ধ হয়, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে যদি তাহার সমত্ববোধ জন্মে, তবে তিনি যে কর্ম্মই করুন না কেন তাহাতে তাহার বন্ধন হয় না। যে নিষ্কাম সাম্যবুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মের বন্ধকত্ব দূর হয় তাহাকেই শ্রীগীতায় বুদ্ধিযোগ বলা হইয়াছে (গীঃ ২।৪৮-৫৬)। ইহা লাভ করিতে হইলে ফলকামনা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা চাই, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করা চাই, এবং চিত্ত ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হওয়া চাই, অর্থাৎ জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তির যাহা সার কথা তৎসমস্তেরই ইহাতে সমাবেশ আছে এবং উহার সহিত ইহ জীবনের স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম যাহাকে আমাদের শাস্ত্রে 'স্বকর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম' বলে তাহা যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কর্ম্মজীবনটাকে অগ্রাহ্য করা হয় নাই, উহাকে ঈশ্বরার্পিত করিয়া ধর্ম্মজীবনে পরিণত করা হইয়াছে। ('The Geeta is an exhortation to dedicated life'—Radhakrishnan)।

প্রঃ। কেবল জ্ঞানমার্গের অনুশীলনেও তো সেই জ্ঞানস্বরূপে স্থিতিলাভ হইতে পারে, যাহাকে বলে ব্রাহ্মীস্থিতি, উহাই তো মোক্ষ। তাই জ্ঞানবাদিগণ বলেন—জ্ঞানেই মুক্তি ('জ্ঞানান্মুক্তিঃ'), কর্ম্ম বন্ধনের কারণ। পক্ষান্তরে ভক্তিবাদিগণ বলেন—একমাত্র ভক্তিদ্বারাই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, এবং চিত্তহরণ হরির এমনই মাধুর্য্য, এমনই গুণ যে আত্মারাম মুনিগণও তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া কৃতার্থ হন। 'আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ' -ভাঃ ১।৭।১০)। ইঁহারাও সাধনপথে কর্ম্মের বিশেষ কোন প্রাধান্য দেন না, বরং জ্ঞানকর্ম্মাদি নিষেধই করেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুই সম্প্রদায়ই কর্ম্মত্যাগী। এই দুই

মার্গ শ্রীগীতারও স্বীকার্য্য (গীঃ ১৩।২৪-২৫)। অথচ শ্রীগীতায় আদ্যোপান্ত জ্ঞান ও ভক্তির সহিত কর্ম্মের প্রেরণা, আর তাহা কেবল পূজার্চ্চনা, যজ্ঞদান-তপস্যাদি নয়, সে কর্ম্ম লৌকিক কর্ম্ম, সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জীবের সাংসারিক কর্ম্মের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক কি ? অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থে স্বধর্ম্মপালন বা সাংসারিক কর্ত্তব্যপালনের এরূপ আবশ্যকতা বা মাহাত্ম্য বর্ণনা দেখা যায় না। রুচি অনুসারে জ্ঞান, ধ্যান, বা ভক্তির পথে সাধন করিলেই পরম বস্তু লাভ হয়। সংসারের কর্ম্ম-কুহকে আবার জড়িত হওয়ার প্রয়োজন কি ? বরং উহা হইতে অবসর গ্রহণ করাই কি শ্রেয়ঃপথ নহে ? অথচ এ সকল সাধনের উল্লেখ করিয়াও শ্রীভগবান্ শেষে বলিলেন— 'সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্ম করিতে থাকিলেও আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ হয়' (গীঃ ১৮।৫১-৫৬)। শ্রীগীতার এ রহস্য বুঝা যায় না।

প্রঃ। অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থে সংসারে থাকিয়া স্বধর্ম্ম পালন বা গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের আবশ্যকতা বা প্রশংসা নাই, এ কথা ঠিক নহে। ঈশাবাস্যাদি উপনিষদে কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের সমুচ্চয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে। মহাভারত ও মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও গার্হস্থ্য আশ্রমের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত আছে—

'যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
এবং গার্হস্থ্যমাশ্রিত্য বর্ত্তন্ত ইতরাশ্রমাঃ॥'—মভা, শাং ২৬৮, ৬, মনু ৩, ৭৭

—'যেমন মাতাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত জন্তু বাঁচিয়া থাকে সেইরূপ গার্হস্থ্যাশ্রমের আশ্রয়ে অন্যান্য আশ্রম রহিয়াছে।'

কেবল অন্যান্য আশ্রম নহে, লোকে সংসারে থাকিয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে বলিয়াই জগতের ধারণ পোষণ চলিতেছে, ইহাকেই শ্রীগীতায় 'লোক-সংগ্রহ' বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীগীতার দৃষ্টি আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক, জীবের নিঃশ্রেয়স ও জগতের অভ্যুদয় উভয়তই, তাই শ্রীগীতা জ্ঞান ও ভক্তির সহিত কর্ম্মও যুক্ত করেন, কেননা কর্ম্ম ব্যতীত জীব-জগৎই থাকে না। আবার কর্ম্মের সহিত জ্ঞান-ভক্তি যুক্ত না হইলে কর্ম্মের বন্ধনত্ব ঘুচে না। শ্রীগীতার কর্ম্ম-যোগের উদ্দেশ্য লোকরক্ষা, সর্ব্বভূত-হিতসাধন, বিশ্বময়ের বিশ্বলীলার, বিশ্বকর্ম্মের সহায় হইয়া অন্তিমে বিশ্বাত্মার সহিত মিলন (গীঃ ১৮।৪৫—৫৬)।

শ্রীগীতার কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য

জীবের নিঃশ্রেয়স ও জগতের অভ্যুদয়

এ সকল কথা আমাদের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা নহে। কর্ম্মোপদেশ উপলক্ষে বিবিধ যুক্তি-কারণ প্রদর্শন করিয়া শ্রীভগবান্ প্রিয় সখা ও শিষ্যকে যাহা বলিয়াছেন সেই সকল কথা অনুধ্যান করিলেই শ্রীগীতার কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়।

কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস, এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি কর্ত্তব্য এ বিষয়ে অর্জ্জুনের মনেও বিশেষ সংশয় ছিল, কেননা জ্ঞানযোগ ও সন্ন্যাসবাদ, কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত জ্ঞান বা মোক্ষ লাভ হয় না এই মতবাদ, সুপ্রচলিত ছিল, এবং শ্রীভগবানও কর্ম্মোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের মাহাত্ম্যও কীর্ত্তন করিতেছিলেন। প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনের এই সংশয় অপনোদন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়মূলক যে ধর্ম্মোপদেশ গিয়াছেন তাহা কর্ম্মতত্ত্বের সার কথা, তাহা কেবল হিন্দুর নহে, সমগ্র মানব-সমাজের অশেষ কল্যাণকর।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"জ্ঞানযোগ বা কর্ম্ম-সন্ন্যাসমার্গ ও কর্ম্মযোগমার্গ উভয়ই সিদ্ধিপ্রদ, কিন্তু বাসনাত্যাগ ব্যতীত কেবল কর্ম্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না, কর্ম্ম বন্ধনের কারণ নহে, কামনাই বন্ধনের কারণ, ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্মে বন্ধন হয় না, উহাই কর্ম্মযোগ। (৩।৩-৪, ৫।২-৩)। বস্তুতঃ সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগ সম্ভবপরই নয়, কেহ ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, প্রকৃতির গুণে অবশ হইয়া সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় (৩।৫)। অতএব তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, কর্ম্মশূন্যতা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ, কর্ম্ম না করিলে তোমার দেহযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না (৩।৮)। লোক-রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কর্ম্ম করা উচিত, কেহ কর্ম্ম না করিলে লোকরক্ষা হয় না, সৃষ্টি রক্ষাই হয় না ("লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি' ৩।২০), জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।"

শ্রীভগবান যে রাজর্ষি জনকের দৃষ্টান্ত দিলেন ইনি পরম জ্ঞানী, নির্লিপ্ত সংসারী ছিলেন। ইঁহার রাজ্য ছিল, কিন্তু রাজ্যাদিতে মমত্ববোধ ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন—'রাজধানী মিথিলা দগ্ধ হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না ('মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন')। তাঁহার নিজের রাজত্ব বা সংসার স্পৃহা না থাকিলেও তিনি রাজ্যপালন করিয়াছেন, সাংসারিক কর্ম্ম করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন তাহা নিজেই বলিয়াছেন—

রাজর্ষি জনকের দৃষ্টান্ত

'দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ ভূতেভ্যোঽতিথিভিঃ সহ।
ইত্যর্থং সর্ব্ব এবৈতে সমারম্ভা ভবন্তি বৈ॥'

—দেবগণ, পিতৃগণ, অতিথিগণ, এবং সমস্ত ভূত অর্থাৎ প্রাণিগণ, ইহাদের জন্য এই সকল কর্ম্ম চলিতেছে, আমার জন্য নহে।'

'আমার' কর্ম্ম, 'আমার' প্রয়োজনে 'আমি' করি, এইরূপ মমত্ববোধ, ফলাসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান তাঁহার ছিল না। কর্ম্মজীবন নিজার্থে নহে, পরার্থে, বিশ্বহিতার্থে, ইহাই হিন্দুর সংসার-ধর্ম্মের লক্ষণ, সেই বিশ্বাত্মাই চরম লক্ষ্য (১৬৮ পৃঃ দ্রঃ)।—

'গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে ;
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে।
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল।
সম্পদেরে পুণ্যকর্ম্মে করেছ মঙ্গল।
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব্ব দুঃখ সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।'

শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগী জনকাদির উল্লেখ করিয়া পরে শ্রীভগবান্ নিজের আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক কর্ম্মের মাহাত্ম্য ও অবশ্য-কর্ত্তব্যতা আরো পরিস্ফুট করিতেছেন—

'দেখ অর্জ্জুন, ত্রিলোকে আমার কিছু করণীয় নাই, আমার অপ্রাপ্ত কিছু নাই, প্রাপ্তব্যও কিছু নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম লইয়াই আছি ('বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি'-৩।২২)। আমি যদি অনলস হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করি তবে মানবসকল সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুবর্ত্তী হইয়া উৎসন্ন যাইবে ('উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্' ৩।২৪)। অতএব লোকরক্ষার্থ, লোকশিক্ষার্থ আমি কর্ম্ম করি, তুমিও তাহাই কর।'

এই তো শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত কথা। বস্তুতঃ লোকশিক্ষার্থই তাঁহার অবতার-লীলা, এইভাবে দেখিলে তিনি আদর্শে ও উপদেশে সর্ব্বোত্তম লোক-শিক্ষক। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য ভক্তভাবে স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন—'আপনি আচরি ধর্ম্ম লোকেরে শিখায়'। বুদ্ধদেব জ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি। শ্রীরামচন্দ্রে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার চরমোৎকর্ষ। আর শ্রীকৃষ্ণ সৎ-চিৎ-আনন্দ—কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রেমের বিস্ফুরিত মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণলীলায় এই তিনটি যুগপৎ পূর্ণ বিকশিত, এই তত্ত্বটিই আমরা এ পর্য্যন্ত আলোচনা করিলাম।

কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম—এই তিনের পূর্ণ বিকাশেই মানবজীবনের সফলতা ও সার্থকতা, সুতরাং তিনি মানবমাত্রেরই শ্রেষ্ঠতম পূর্ণতম আদর্শ। এই আদর্শপুরুষ-তত্ত্বই বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, অনন্ত-প্রকৃতি ঈশ্বর মনুষ্যের আদর্শ হইবেন কিরূপে ? 'ক্ষুদ্র মানুষ কিরূপে অনন্তের অনুসরণ করিতে পারে, অনুকরণ করিতে পারে ? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায় ?' এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখিয়াছেন—

"অনন্ত-প্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায় তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য

যীশুখ্রীষ্ট খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্ম্ম-পরিবর্দ্ধক আদর্শ যেরূপ হিন্দুশাস্ত্রে আছে অমন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি মহর্ষি সকলেই অনুশীলনের চরম আদর্শ। তাহার উপর রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত, ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খ্রীষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন কৌপীনধারী নির্ম্মম ধর্ম্মবেত্তা, কিন্তু ইঁহারা তাহা নয়। ইঁহারা সর্ব্বগুণবিশিষ্ট—ইঁহাদিগেতেই সর্ব্ববৃত্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন, কার্ম্মুকহস্তেও ধর্ম্মবেত্তা, রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর, হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম-লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমময় চরিত্র কখনও মনুষ্যভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই।'

হিন্দুর জাতীয় আদর্শ শ্রীকৃষ্ণে

"এই তত্ত্বটা প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জন্যও আমি শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি, পাশ্চাত্যশিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। তবে এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব।"

গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়া শেষে লিখিয়াছেন—

"উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে সর্ব্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে অপরাঙ্মুখ, ধর্ম্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তিদ্বারা কর্ম্ম-নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমানুষ। এই প্রকার মানুষী শক্তিদ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাঁহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় কিনা তাহা পাঠক আপনার বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে স্থির করিবেন। যিনি মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন, তিনি অন্ততঃ Rhys Davids শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন কৃষ্ণকেও তাহাই বলিবেন—"the wisest and greatest of the Hindus"; আর যিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষ্ণ-চরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুক্তকরে বিনীতভাবে এই গ্রন্থ সমাপন কালে আমার সঙ্গে বলুন—

নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণাকারণান্নচ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্ম্মত্রাণায় তে পরং।

ধর্ম্মতত্ত্ব-গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর মুখে ইংরেজী-শিক্ষিত শিষ্যকে বলিতেছেন—আইস, আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি।

শিষ্য—সে কি? কৃষ্ণ?

গুরু—তোমরা কেবল যাত্রার কৃষ্ণ চেন—তাই শিহরিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝনা। তাহার পশ্চাতে ঈশ্বরের সর্ব্বগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণচরিত্র চিত্রিত আছে, তাহার কিছুই জান না। তাঁহার শারীরিক বৃত্তিসকল সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া অনুভবনীয় সৌন্দর্য্যে ও অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল সেইরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্য ও জ্ঞানে পরিণত এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বহিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন—

'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥' (১২৬ পৃঃ দ্রঃ)

বঙ্কিমচন্দ্রের মহনীয় কৃষ্ণস্তুতি

যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্ব্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্যস্থাপনের কর্ত্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া তারপর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবণ দেশে বেদপ্রবণ সময়ে বলিয়াছিলেন—বেদে ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম লোকহিতে—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি; যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ব্ববলাধার, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, সর্ব্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।—(গীঃ ১১।৩৯)

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের গুণমুগ্ধ ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর, এ বিশ্বাস তাঁহার সুদৃঢ়, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। 'তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন'—এ কথায় তাঁহার নিজের মনে এ বিষয়ে কোনরূপ সংশয় আছে ইহা বুঝায় না। এ কথার মর্ম্ম এই যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে যেরূপ মতই পোষণ করুন না কেন, আমি তাঁহাকে সহস্রবার নমস্কার করি, পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তিনি নমস্য ও উপাস্য, তাই তিনি বলিয়াছেন, আইস, তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি।

সে উপাসনা কিরূপ? উত্তরে বলিতেছেন—

'ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া চলিব, সে সম্ভাবনা নাই। কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবনাই উপাসনা। তবে বেগারটালা রকম ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে—তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতিঃ আমাদের চরিত্রে পড়িবে। তাঁহার নির্ম্মলতার মত নির্ম্মলতা, তাঁহার অনুকারী সর্ব্বত্র মঙ্গলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।'

কৃষ্ণোপাসনার অর্থ কি

তাই বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র বলিয়াছেন—**ধর্ম্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা** (৪৮ পৃঃ দ্রঃ)। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ হইবে।

———

চতুর্থ অধ্যায়

সচ্চিদানন্দের সাধনা ও উপাসনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সচ্চিদানন্দ-সাধনা

সচ্চিদানন্দ-উপলব্ধির যে উপায় তাহাকেই বলে যোগ, যোগ শব্দের অর্থ উপায়, পথ, মার্গ। উপায় বিবিধ, সুতরাং যোগও বিবিধ। আমাদের শাস্ত্রে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, এই সকলের উল্লেখ আছে। আমরা দেখিয়াছি শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ যে যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি এ সকলের সমুচ্চয় ও সমন্বয় আছে।

এই সমুচ্চয়ের কারণ কি, জীব-ব্রহ্ম-স্বরূপ ও সিদ্ধি বা মোক্ষতত্ত্বের বিচারে তাহা বুঝা যায়।

সিদ্ধির অবস্থাটি কি ?—শ্রীগীতায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, সিদ্ধাবস্থার বর্ণনায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন 'মদ্ভাবমাগতাঃ', 'মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ', 'মদ্ভাবায়োপপদ্যতে' ইত্যাদি (গীঃ ৪।১০, ১৪।২, ১৩।১৮)। এ সকল কথার মর্ম্ম এই যে সাধনবলে জীব আমার ভাব প্রাপ্ত হয়, আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়। তাঁহার ভাব কি, সাধর্ম্ম্য কি ? তিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, সৎ-চিৎ-আনন্দ, এই তিনটিই তাহার ভাব। এই তিন ভাবে তাঁহার ত্রিবিধ শক্তি—সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী। এই ত্রিবিধ শক্তির প্রকাশ—কর্ম্মে, জ্ঞানে ও আনন্দে। ফল—অখণ্ড প্রতাপ, অতর্ক্য প্রজ্ঞা, অজস্র প্রেম। তিনি একাধারে প্রতাপঘন, প্রজ্ঞানঘন, প্রেমঘন। এ সকল তত্ত্বই এ পর্য্যন্ত আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, বিশেষভাবে ৪৯—৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সচ্চিদানন্দের ত্রিবিধ শক্তি

এই তো সচ্চিদানন্দের ভাব ও শক্তি। জীব এই ভাব লাভ করিবে কিরূপে জীব-তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। জীব ব্রহ্মেরই অংশ ('মমৈবাংশো জীবভূতঃ'-গী), ব্রহ্মকণা, ব্রহ্ম-অগ্নিরই স্ফুলিঙ্গ। স্ফুলিঙ্গে অগ্নির লক্ষণ থাকিবেই, কাজেই জীবেও ব্রহ্মলক্ষণ আছে। কিন্তু উহা অস্ফুট, বীজাবস্থ। জীব একাধারে কর্ত্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা; সুতরাং তাহার ত্রিবিধ শক্তি—কর্ম্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি। কর্ম্মশক্তির বিকাশ চেষ্টনায় (Conation, Action), জ্ঞানশক্তির বিকাশ ভাবনায় (Cognition, Thought), ইচ্ছাশক্তির বিকাশ কামনায় (Emotion, Desire)। জীবের যে

জীবের ত্রিবিধ শক্তি

এই তিনটি শক্তি উহা ব্রহ্মেরই তিনটি শক্তির অনুরূপ, কিন্তু অস্ফুট, অবিশুদ্ধ। সচ্চিদানন্দের যে সন্ধিনী শক্তি তাহাই নিম্নগ্রামে জীবের কর্ম্ম-শক্তি, সচ্চিদানন্দের যে সংবিৎ শক্তি তাহাই নিম্নগ্রামে জীবের জ্ঞান-শক্তি, সচ্চিদানন্দের যে হ্লাদিনী শক্তি তাহাই নিম্নগ্রামে জীবের ইচ্ছাশক্তি বা প্রেম। সৎ-চিৎ-আনন্দ—কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম, এই তিনটি জীবেও আছে—কিন্তু উহা অস্ফুট, অপূর্ণ, প্রকৃতি-জড়িত, অবিশুদ্ধ।

জীবের অন্তর্নিহিত এই তিনটি শক্তি সাধনবলে বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরমুখী হইয়া পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে জীব ঐশ্বরিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই তিনটির অনুসরণেই তিনটি সাধন-মার্গের নাম হইয়াছে— কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ।

জীবের মধ্যে যে অস্ফুট সৎভাব উহার প্রকাশ তাহার কর্ম্মে, সুতরাং তাহার কর্ম্ম ঈশ্বরমুখী হইলে উহা বিশুদ্ধ হইয়া কর্ম্মযোগ হয়। জীবের মধ্যে যে অস্ফুট চিৎ-ভাব উহার প্রকাশ তাহার জ্ঞানে, ভাবনায়, সুতরাং উহা ঈশ্বরমুখী হইলেই জ্ঞানযোগ হয়। জীবের মধ্যে যে অস্ফুট আনন্দ ভাব উহার প্রকাশ তাহার কামনায়, উহা বিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরমুখী হইলেই প্রেমভক্তি যোগ হয়। এই তিনটির যুগপৎ অনুষ্ঠানেই জীবের পূর্ণ-বিকাশ, উহাই গীতোক্ত পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম, উহাতেই সচ্চিদানন্দের সাধর্ম্ম্যলাভ ('মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ, মদ্ভাবমাগতাঃ')।

সাধর্ম্ম্য-সিদ্ধি

'শ্রীভগবান্ সমন্বয়ের উচ্চ চূড়ায় আরূঢ় হইয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে জীবের সচ্চিদানন্দে পূর্ণ-বিকশিত হইতে হইলে এই মার্গত্রয়কেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হয়। এইজন্য গীতায় দেখি, কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্ভুত যুক্তত্রিবেণীসঙ্গম রচনা করিয়াছেন, যে পুণ্যতর কল্যাণতর ত্রিবেণীতে সরস্বতীর কর্ম্মধারা, যমুনার জ্ঞানধারা এবং গঙ্গার ভক্তিধারা সমান উজ্জ্বল, সমস্রোতে প্রবহমান।' —বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

যিনি এই পুণ্যত্রিবেণী তীর্থে স্নান করিয়াছেন তিনিই পূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অধিগত করিয়াছেন, ভাগবতী তনু লাভ করিয়া ভাগবত জীবনের অধিকারী হইয়াছেন।

'সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সতত সঞ্চরে॥'—চৈঃ চঃ

বলা আবশ্যক যে, মার্গত্রয়ের সমন্বয় অর্থ মোটেই ইহা নহে যে সাধককে প্রচলিত তিনটি মার্গই অবলম্বন করিতে হইবে। মার্গ একটিই, উহাতেই জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির সামঞ্জস্য আছে, বিরোধ নাই। বলা হইয়াছে, কর্ম্মকে ঈশ্বরমুখী করিলেই উহা কর্ম্মযোগ হয়। কর্ম্মকে ঈশ্বরমুখী করার অর্থ ঈশ্বরের প্রীত্যর্থ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে

ঈশ্বরের কর্ম্মবোধে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করা ('স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরি তোষণম্'-ভাঃ)। ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তি না থাকিলে তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? এইরূপ, ঈশ্বরে আত্যন্তিক ভক্তি না থাকিলে জ্ঞান বা ভাবনা কিরূপে ঈশ্বরমুখী হইবে? তাই শ্রীভাগবত বলেন, ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত জ্ঞানযোগ এবং নির্গুণা ভক্তি-লক্ষণ ভক্তিযোগ, এ দুইই এক, দুই-এর ফল একই—ভগবৎপদ-প্রাপ্তি।

—'জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ।
দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ॥'—ভাঃ ৩।৩২।৩২

প্রকৃত পক্ষে, গীতোক্ত যোগে কর্ম্ম ও জ্ঞান, ভক্তির দ্বারাই প্রভাবিত ও অনুশাসিত, সুতরাং উহাকে ভক্তিযোগই বলা যায়। ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি না থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান ঈশ্বরমুখী হইতে পারে না, উহা অন্যমুখী হয়, যেমন ভক্তিহীন বৈদিক কর্ম্মযোগ স্বর্গমুখী, ভক্তিহীন বৈদান্তিক জ্ঞানযোগ নির্ব্বাণমুখী। ইহাতে ভক্তির সহিত যে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমাবেশ আছে, সে কর্ম্ম অর্থ ঈশ্বরের কর্ম্ম ('মৎকর্ম্মকৃৎ'), ঈশ্বর-প্রীত্যর্থ কর্ম্ম; আর সে জ্ঞান অর্থ ভগবত্ত্বা-জ্ঞান, 'নির্গুণ-গুণী' পুরুষোত্তমের জ্ঞান, কেবল নির্গুণ তত্ত্বের জ্ঞান নহে। ('জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ'-ভাঃ)। নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও পুরুষোত্তমবাদের পার্থক্য পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (৪৬, ১৫৬, ১৭৭ পৃঃ)।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীগীতার পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্মমত ও সাধনপথ প্রচলিত ছিল তাহাতে কর্ম্ম বা জ্ঞানের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু ভক্তির প্রসঙ্গ ছিল না, শ্রীগীতাই জ্ঞান ও কর্ম্মের সহিত ভক্তির সংযোগ করিয়া দেন। 'ইহাতে সনাতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল, ইহাই সকল মনুষ্যের অবলম্বনীয়'—বঙ্কিমচন্দ্র (৪৮ পৃঃ দ্রঃ)।

প্রঃ। কিন্তু জ্ঞানযোগ বা ধ্যানযোগেও তো সিদ্ধিলাভ হয়, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। তবে উহাদের অসম্পূর্ণতা কিসে? এই সকল মত তো সুপ্রাচীন।

উঃ। জ্যেষ্ঠ হইলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। ঐ সকল প্রাচীন যোগধর্ম্ম ও গীতোক্ত যোগধর্ম্মে পার্থক্য কি তাহা স্পষ্ট বুঝিলেই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ব্রহ্ম-স্বরূপ সম্বন্ধে যে দার্শনিক মতভেদ আছে তদ্দরুণ এই সকল সাধন-প্রণালীর পার্থক্য হয় (৪ পৃঃ দ্রঃ)। বৈদান্তিক জ্ঞানযোগী একের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ('একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম') এক হইয়া যান। সেই নিত্য, সত্য, সনাতন, শাশ্বত সৎ-বস্তুর চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যপ্রতীতি, জগতের জ্ঞান, দেহ-মন-প্রাণের খেলা স্তিমিত হইয়া আইসে; তিনি তুরীয়ে প্রতিষ্ঠিত হন, তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান, 'কেবল' হইয়া যান, এক হইয়া যান, ইহাই ব্রহ্ম-সিদ্ধি, কৈবল্য-সিদ্ধি,

অদ্বৈতসিদ্ধি। কিন্তু একই যে বহু হইয়াছেন ('একোঽহং বহু স্যাম্'), একই যে বহুর মধ্যে আছেন ('সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানম্' ১০৩-১০৪ পৃঃ), তাহা তিনি বিস্মৃত, তাঁহার নিকট জীব-জগতের অস্তিত্ব নাই, উহা মায়ার বিজৃম্ভণ। তিনি আপন সত্তাতেই ব্রহ্মকে প্রকট দেখেন। ইহা মায়াবাদীর জ্ঞান।

গীতোক্ত জ্ঞান

কিন্তু যদি আমরা অপর সত্তার মধ্যেও—সর্ব্বভূতের মধ্যেও সেই এক বস্তুই অনুভব করিতে পারি, তবে আমরা জীব-জগতের মধ্যেও ব্রহ্মকেই পাইব, দ্বৈতের মধ্যেই অদ্বৈতকে অনুভব করিব, বহুর মধ্যেই এককে পাইব। ইহাই পরিণামবাদীর জ্ঞান, গীতোক্ত যোগীর ঈশ্বর-জ্ঞান। শ্রীভগবান্ প্রিয়শিষ্যকে জ্ঞানের উপদেশ দিয়া পরে বলিতেছেন—তুমি জ্ঞান লাভ করিলে সমস্ত ভূতগ্রাম স্বীয় আত্মাতে এবং অনন্তর আমাতে দেখিতে পাইবে ('যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি'—গীঃ ৪।৩৫)। আবার ধ্যানযোগের উপদেশ প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥—গীঃ ৬।২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥'—গীঃ ৬।৩০

—'যোগযুক্ত সাধক সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন।'

"যিনি আমাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং আমাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত দেখেন, আমি তাহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না।'

প্রঃ। পূর্ব্বোদ্ধৃত ৬।২৯ শ্লোকে বলা হইল, 'যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে দেখেন এবং সর্ব্বভূত আত্মাতে দেখেন'; ৬।৩০ শ্লোকে বলা হইল, 'যিনি আমাকে সর্ব্বভূতে দেখেন এবং আমাতে সর্ব্বভূত দেখেন, আমি তাহার অদৃশ্য হই না' ইত্যাদি। কথা একই, তবে পূর্ব্ব শ্লোকের 'আত্মার' স্থলে পরের শ্লোকে আছে 'আমি', এই মাত্র পার্থক্য। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় এই 'আমি'ই আত্মা। তাহাই যদি হয় তবে দুইটি শ্লোকের প্রয়োজন কি, পুনরুক্তি কেন?

আত্মা ও ভগবান্

উঃ। পূর্ব্বে 'ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্' ও 'পুরুষোত্তম-তত্ত্ব' সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলে এ প্রশ্ন বোধ হয় উত্থাপিত হইত না (৩৯-৪৮, ১৫৬ পৃঃ দ্রঃ)। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ মূলতঃ একই তত্ত্ব, কিন্তু সাধকের চিত্তে তাঁহার প্রকাশ বিভিন্ন বিভাবে হয়। 'আমি' (শ্রীভগবান্) আত্মা বটেন, আত্মরূপে তিনিই সর্ব্বভূতে অবস্থিত,

কিন্তু কেবল আত্মাই 'আমি' নহেন, কেননা আত্মভাবে তিনি সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী অব্যক্ত স্বরূপ, কিন্তু ভগবদ্-বিভাবে তাঁহার কত নাম, কত রূপ। তিনি বিশ্বরূপ, তাঁহার সহস্র নাম। তিনি ভক্তজন-প্রাণধন, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তিনি তো কেবল নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব নন, তিনি সর্ব্বলোক-মহেশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃদ্, ভক্তের ভগবান্। শ্রীগীতা বলিতেছেন জীবের যখন সর্ব্বভূতে সমদর্শন লাভ হয় ('সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ') তখনই তাহার ভগবানের সমগ্র স্বরূপ অধিগত হয় এবং তাঁহাতে পরা ভক্তি জন্মে ('মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'—১৮।৫৪)। তখন ভক্ত ও ভগবানে এক অচ্ছেদ্য নিত্য মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রমতে সর্ব্বত্র সমদর্শন বা আত্মদর্শনই মোক্ষ, উহাই পরম পুরুষার্থ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,—এই চারিটি পুরুষার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, কিন্তু ভাগবতশাস্ত্রমতে মুক্তির উপরেও আর একটি পুরুষার্থ আছে যাহাকে বলে পঞ্চম পুরুষার্থ, তাহা হইতেছে—প্রেমভক্তি।—

'পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥'—চৈঃ চঃ

এই যে মধুর সম্বন্ধ, এই যে আকর্ষণ, ইহা উভয়তঃ; ভগবানের প্রতি ভক্তের যেরূপ আকর্ষণ, ভক্তের প্রতিও ভগবানের সেইরূপ আকর্ষণ। তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমার ভক্ত কখনও আমাকে হারান না, আমিও আমার ভক্তকে কখনও হারাই না (৬।৩০)। আমার ভক্ত সর্ব্বত্র আমাকে দেখেন এবং আমাতেই সমস্ত দেখেন। তিনি জগতের দিকে তাকাইলে জগন্ময় আমার মূর্ত্তিই অনুভব করেন। ভক্তিশাস্ত্রের কথায়, তাঁহার 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ ফুরে'-চৈঃ চঃ।

এক্ষণে বুঝা যাইবে, পূর্ব্বোক্ত প্রায়-একার্থক দুইটি শ্লোকের পার্থক্য কি (১৮৯ পৃঃ)। ৬।২৯ শ্লোকে যোগীর আত্মদর্শনের কথা বলা হইয়াছে, ৬।৩০ শ্লোকে ভক্তের ভগবদ্দর্শনের কথা। দুই-ই মূলতঃ এক হইলেও ফলতঃ পৃথক্। ৬।২৯ শ্লোকে যে আত্মদর্শনরূপ মোক্ষের কথা বলা হইয়াছে, ঠিক এইরূপ কথাই উপনিষদে, যোগশাস্ত্রে, মহাভারতের মোক্ষপর্ব্বাধ্যায়ে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতেও পাওয়া যায়। যাঁহারা এই মত অনুসরণ করেন তাঁহারাই মোক্ষবাদী, জ্ঞানী, যোগী। কিন্তু এই পরম জ্ঞান ও পরা ভক্তি যে একই বস্তু, তাহা কেবল গীতা, ভাগবত আদি ভাগবত-শাস্ত্রেই দেখা যায়। অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যামতে জ্ঞানলাভ হইলে ভক্তিপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়, কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়, ভাগবতশাস্ত্রমতে তখন ভক্তি নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হয়, কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া ভাগবত কর্ম্মে পরিণত হয়। গীতোক্ত যোগী মায়াবাদী, নির্ব্বাণবাদী ও কর্ম্মত্যাগী নন; তিনি লীলাবাদী, কর্ম্মবাদী,

জীবনবাদী ; তিনি আত্মজ্ঞ হইয়াও ভক্তোত্তম, তিনি বিশ্বময় পুরুষোত্তমকে দেখেন, সর্ব্বভূতে বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া বিশ্বপ্রেমে পুলকিত হইয়া বিশ্বকর্ম্মেই জীবনক্ষেপ করেন। গীতোক্ত যোগের উহাই অমৃতময় ফল—এই ফল দ্বিবিধ, যুগপৎ জীবের **নিঃশ্রেয়স এবং জগতের অভ্যুদয়,** সর্ব্বভূতের প্রেমসেবা।

গীতোক্ত যোগসাধনা—জগদ্ধিতায়

এই কথাটিই শ্রীগীতার পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—

'সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে' ॥ ৬।৩১

(১) যঃ একত্বং আস্থিতঃ—যিনি একত্বে স্থিত হইয়া অর্থাৎ সর্ব্বভূতে একমাত্র আমিই আছি, এইরূপ একত্ব বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া।

(২) সর্ব্বভূতস্থিতং মাং ভজতি—সকলের মধ্যে যে আমি আছি সেই আমাকে ভজনা করেন, অর্থাৎ সর্ব্বভূতেই নারায়ণ আছেন এই জানিয়া নারায়ণ জ্ঞানে সর্ব্বভূতে প্রীতি করেন, সর্ব্বভূতের সেবা করেন ('who loves God in all')।

(৩) সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি—তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন অর্থাৎ তিনি নির্জ্জনে গিরিকন্দরে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে সমাধিস্থ হইয়াই থাকুন অথবা সংসারে সংসারী সাজিয়া সংসারকর্ম্মই করুন, এমন কি, লোকদৃষ্টিতে তিনি আমার পূজার্চ্চনা করুন বা নাই করুন ; তথাপি—

(৪) স যোগী ময়ি বর্ত্ততে—তিনি আমাতেই থাকেন অর্থাৎ, তাহার চিত্ত আমাতেই নিত্যযুক্ত থাকে, তাহার ইচ্ছা আমারই ইচ্ছায়, তাহার কর্ম্ম আমারই কর্ম্মে পরিণত হয়। তিনি নিত্যসমাহিত, নিত্যযুক্ত—জ্ঞানে মদ্ভাবপ্রাপ্ত, কর্ম্মে মৎকর্ম্মকৃৎ, ভক্তিতে মদ্গতচিত্ত।

ইহাই বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান, ইহাই যোগীর সমদর্শন, ইহাই কর্ম্মীর নিষ্কাম কর্ম্ম, ইহাই ভক্তের নির্গুণা ভক্তি। এই শ্লোকটিতে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগের অপূর্ব্ব সমন্বয়। ইহাই গীতোক্ত পূর্ণাঙ্গ যোগ। তাই শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন, এই শ্লোকটিকে সমগ্র গীতার চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়—

Whoever loves God in all and whose soul is founded upon the divine oneness, however he lives and acts, lives and acts in God—that may almost be said to sum up the whole final result of Gita's teaching. —Sree Arobindo.

'আমাকে ভজনা করা' বলিলে তাহার অর্থ স্পষ্টই বুঝা যায়, কিন্তু 'সর্ব্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করা'—কথার অর্থটি কি ইহাই এস্থলে প্রণিধানযোগ্য।

এ দুইটি কথায় পার্থক্য কি তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে নির্গুণভক্তিতত্ত্ব-বর্ণনপ্রসঙ্গে অতি স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে—

'অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চা বিড়ম্বনম্॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥
অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা' ॥—ভাঃ ৩য় ২৯ অঃ ২১।২২।২৪।২৭

—আমি সর্ব্বভূতে ভূতাত্মস্বরূপে অবস্থিত আছি। অথচ সেই আমাকে (অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে) অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্য প্রতিমাদিতে পূজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মা ও ঈশ্বর আমাকে উপেক্ষা করিয়া যে কেবল প্রতিমাদিই ভজনা করে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়। যে প্রাণিগণের অবজ্ঞাকারী, সে বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমার পূজা করিলেও আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই না। সুতরাং মনুষ্যের কর্ত্তব্য যে, আমি সর্ব্বভূতে আছি ইহা জানিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, সকলের সহিত মিত্রতা ও দানমানাদি দ্বারা সকলকে অর্চ্চনা করে।'

ভগবানের অর্চ্চনা ও সর্ব্বভূতস্থ ভগবানের অর্চ্চনা

ইহাই হইল 'সর্ব্বভূতস্থ ভগবানের' অর্চ্চনা, ভাগবতধর্ম্ম মতে কৃষ্ণোপাসনার এক শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। এই তত্ত্বটি কবির তুলিকায় কেমন সুন্দর রূপ পাইয়াছে, দেখুন।—

দেব-মন্দিরে ভক্ত পুরোহিতঠাকুরের নিকটে আসিয়া ভিখারী কাতরকণ্ঠে কহিতেছে—

"গৃহ মোর নাই,
একপাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাঁই।"

পুরোহিতঠাকুর বিরক্ত হইয়া মালা জপিতে জপিতে তাহাকে কহিতেছেন—

"আরে আরে অপবিত্র দূর হয়ে যারে"।
সে কহিল—"চলিলাম"। চক্ষের নিমিষে
ভিখারী ধরিল মূর্ত্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে ?"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

প্রঃ। প্রতিমাদির অর্চ্চনা কি অনাবশ্যক ? শ্রীভাগবতের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসমূহে উহা কি নিষিদ্ধ হইল ?

উঃ। না, মূর্ত্তিতে ইষ্টবস্তুর অর্চ্চনা অনাবশ্যকও নয়, নিষিদ্ধও নয়। এই স্থানেই পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে ভক্তির সাধনরূপে মূর্ত্তিদর্শন-পূজা-স্তুতি-বন্দনাদি ক্রিয়াযোগের বিধিই আছে ('মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ'—ভাঃ ৩।২৯।১৬), আবার ঐ সঙ্গেই এ বিধিও আছে—'ভূতেষু মদ্ভাবনয়া'—সকল প্রাণীতে আমার ভাবনা করিতে হইবে। এই কথাই পরে বিস্তার করিয়া বলা হইয়াছে যে, প্রাণিগণকে অবজ্ঞা করিয়া কেবল প্রতিমা পূজা ভস্মে ঘৃতাহুতি। পরেই বলা হইয়াছে, আমি তো সর্ব্বভূতেই অবস্থিত, তবে যে পর্য্যন্ত পুরুষ সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে আপনার হৃদয় মধ্যে জানিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত স্বকর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্রতিমাতে আমার অর্চ্চনা করিবে ('যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতঃ')। সুতরাং সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে প্রতিমায় যাঁহার অর্চ্চনা করিতেছি তিনি বিশ্বাত্মা এবং সে অর্চ্চনার উদ্দেশ্য তাহাতে অহৈতুকী ভক্তি লাভ। ইহা বিস্মৃত হইলে প্রতীকোপাসনা অজ্ঞের জড়োপাসনায় পরিণত হয় ('অজ্ঞা যজন্তি বিশ্বেশং পাষাণাদিষু কেবলম্'—বৃঃ নাঃ পুঃ)। বিচিত্র দেব-মন্দির, দেবতার স্বর্ণ-মুকুট, রৌপ্য-আসন, নিত্য ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা (সাধারণতঃ পুরোহিত দ্বারা), অথচ গরীব-দুঃখী, 'হীনজাতি', 'হীনজন' দেব-মন্দিরের নিকটস্থ হইলেই—'দূর হ, দূর হ'। এ রকম পূজাড়ম্বর বিড়ম্বনা, তাহাই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসমূহে বলা হইয়াছে।

এ যুগে শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ এই নর-নারায়ণ পূজার মহিমা প্রচার করিয়া নবযুগের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজি বলিতেন—দয়া নহে, সেবা, প্রেম। আমরা দয়া করি না, সেবা করি, সকলের মধ্যে আত্মানুভূতি, প্রেমানুভূতি, প্রেম, প্রেম।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

'শুন বলি মরমের কথা জেনেছি জীবনে সত্য সার,
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর এক তরী করে পারাপার,
মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম, প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন।
ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥'

ইহাই ব্যবহারিক বেদান্ত। 'হিন্দুর ঈশ্বর সর্ব্বভূতময়, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। কোন মনুষ্য তাহা ছাড়া নাই। মনুষ্যকে না ভালবাসিলে তাঁহাকে

ভালবাসা হইল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে সর্ব্বলোক ও আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্ম্মের মূলেই আছে। অচ্ছেদ্য, অভিন্ন জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব নাই। মনুষ্যপ্রীতি ভিন্ন ঈশ্বর-ভক্তি নাই। ভক্তি ও প্রীতি হিন্দুধর্ম্মে অভিন্ন'—বঙ্কিমচন্দ্র।

বস্তুতঃ বিশ্বপ্রেম বলিয়া যদি কোন বস্তু থাকে, তবে তাহার মূলে এই আত্মদর্শন-জনিত সমত্ববুদ্ধি ; জগতে আর্য্যঋষিগণই উহার অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন। জগতের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, সমুদয় নীতিশাস্ত্রই শিক্ষা দেয়—আপনাকে যেমন পরকেও সেইরূপ ভালবাসিবে। কিন্তু কেন আমি অপরকে নিজের ন্যায় ভালবাসিব ? এ নীতির ভিত্তি কি ?

'আজকাল অনেকের মতে নীতির ভিত্তি হিতবাদ (Utility) অর্থাৎ যাহাতে অধিকাংশ লোকের অধিক পরিমাণ সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে পারে তাহাই নীতির ভিত্তি। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া নীতিপালন করিব ইহার যুক্তি কি ? অবশ্য নিঃস্বার্থপরতা কবিত্ব হিসাবে সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব তো যুক্তি নহে, আমায় যুক্তি দেখাও, কেন আমি নিঃস্বার্থপর হইব। হিত-বাদিগণ (Utilitarians) ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন না'—স্বামী বিবেকানন্দ।

বস্তুতঃ, ইহার উত্তর হিন্দু ভিন্ন, হিন্দুর বেদান্ত ভিন্ন আর কেহ দিতে পারে না। ইহার প্রকৃত উত্তর দিয়াছেন আর্য্যঋষি—

'ন বা অরে লোকানাম্ কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি' (—বৃহ, ৪।৫।৬। ৫৯-৬১ পৃঃ দ্রঃ)।

—'লোকসমূহের প্রতি অনুরাগবশতঃ লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি (আপনার প্রতি) অনুরাগবশতঃই লোকসমূহ প্রিয় হয়। সর্ব্বভূতের প্রতি অনুরাগ বশতঃই সর্ব্বভূত প্রিয় হয় না ; আত্মার প্রতি অনুরাগ বশতঃই সর্ব্বভূত প্রিয় হয়।'

তুমি অপরকে, তোমার শত্রুকেও ভালবাসিবে কেন ? কারণ, তুমি তোমার আত্মাকে ভালবাস বলিয়া। তুমিই—সেই (তৎ-ত্বম্-অসি)। এই তত্ত্বই হিন্দুধর্ম্ম-নীতির মূল ভিত্তি। ইহা কেবল হিন্দুর ধর্ম্ম নহে, ইহা বিশ্বমানবের ধর্ম্ম, সনাতন বিশ্বধর্ম্ম।

এই বেদান্ত-মূল ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও ঠিক এই কথাই বলেন—

The Highest and purest morality is the immediate consequence of the Vedanta. The gospels fix quite correctly as the

highest law of morality—"Love your neighbour as yourself". But why should I do so, since by the order of nature, I feel pain and pleasure only in myself and not in my neighbour ? The answer is not the Bible, but it is in the Vedas—in the great formula—*That thou art* (তৎ-ত্বম্-অসি) which gives in three words metaphysics and morals together—Dr. Duessen.

আমরা বলিয়াছি, গীতোক্ত এই যোগধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ যোগ; জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগাদি পৃথক্‌ভাবে অপূর্ণাঙ্গ, কারণ জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম মানুষে এই তিনটি স্বাভাবিক বৃত্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, উহাদিগকে পৃথক্ করিলে সাধন পূর্ণাঙ্গ হয় না, উহা সৎ-চিৎ-আনন্দের পূর্ণসাধন হয় না, কেননা সচ্চিদানন্দেও কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, শবলিত। আর সেই সচ্চিদানন্দ সর্ব্বভূতময়, সুতরাং—

গীতোক্ত যোগের অমৃতময় ফল জগতে সচ্চিদানন্দ-প্রতিষ্ঠা

জ্ঞানে যখন সাধক সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইবেন,
প্রেমে যখন সর্ব্বভূতে প্রীতিমান্ হইবেন,
কর্ম্মে যখন সর্ব্বভূতহিতসাধনে রত থাকিবেন,

তখনই তাঁহার সচ্চিদানন্দ-সাধনা পূর্ণ হইবে। জগতের মানবমাত্রেই যখন জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এই উদার ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রহণ করিবে, সর্ব্বত্রই যখন এই ধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইবে, তখনই জগতে **সচ্চিদানন্দ-প্রতিষ্ঠা** (Kingdom of God) হইবে। এই সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে সকল ব্যক্তিই সর্ব্বভূতে সমদর্শী, নিষ্কামকর্ম্মী, সর্ব্বভূতহিতে রত ও ভগবানে ভক্তিমান্ হইবে। তখন হিংসাদ্বেষ, যুদ্ধ-বিবাদ, অশান্তি-উপদ্রব সমস্ত দূরীভূত হইবে—জগতে অখণ্ড অনাবিল শান্তি বিরাজ করিবে।

ইহাই গীতোক্ত ভাগবত ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ—যে আদর্শ বর্ত্তমান বিক্ষুব্ধ জগৎ স্বপ্ন বলিয়াই মনে করে। প্লেটো, এরিষ্টটল, এপিক্যুরস প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক তত্ত্বজ্ঞগণও পূর্ণজ্ঞান, শুদ্ধসত্ত্ব আদর্শ মানব-সমাজের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত এই যে উহা কল্পনা-প্রসূত আদর্শ মাত্র, বাস্তব জগতে এরূপ অবস্থা কখনও হয় নাই, হইবেও না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র বলেন—এ অবস্থা অত্যন্ত দুর্ল্লভ বটে ('একান্তিনো হি পুরুষা দুর্ল্লভা বহবো নৃপ' (মভা, শাং, ৩৪৮।৬২), কিন্তু ইহা কাল্পনিক নহে। সত্যযুগে এই ধর্ম্মই প্রচলিত ছিল ('ততো হি সাত্বতো

ধর্ম্মো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ' ইত্যাদি) (মভা শাং ৩৪৮।৩৪।২৯) এবং পুনরায় বিশ্বময় এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে (মভা, শাং ৩৪৮।৬৩) —

'যদ্যেকান্তিভিরাকীর্ণং জগৎ স্যাৎ কুরুনন্দন।
অহিংসকৈরাত্মবিদ্ভিঃ সর্ব্বভূতহিতে রতৈঃ।
ভবেৎ কৃতযুগপ্রাপ্তিঃ আশীঃকর্ম্মবিবর্জ্জিতা॥'

—অহিংসক, আত্মজ্ঞানী, সর্ব্বভূতহিতে রত একান্তী অর্থাৎ ভাগবত ধর্ম্মাবলম্বী দ্বারা যদি জগৎ পূর্ণ হয় তবে জগতে স্বার্থবুদ্ধিতে কৃত কর্ম্ম লোপ পায় এবং পুনরায় সত্যযুগের আবির্ভাব হয় (মভা, শাং ৩৪৮।৬২-৬৩)।

মানবের জীবন্মুক্তি ও জগতের ভাবী উন্নতির ও অনাবিল সুখ-শান্তির ইহা অপেক্ষা উচ্চ ধারণা আর কিছু আছে কি ? এ ধর্ম্মে ভগবদ্ভক্তি, বিশ্বপ্রীতি ও কর্ম্মনীতির অপূর্ব্ব শুভসংযোগ।

বিশ্বধর্ম্ম, বিশ্বপ্রেম, বিশ্বমানবতা
কে শিখালো জগতেরে ?—ভারতের গীতা।

গীতোক্ত ভাগবত ধর্ম্ম—বিশ্বমানব-ধর্ম্ম

১। যাঁহাকে মানবমাত্রেই ঈশ্বর বলেন ভারতীয় ঋষিপ্রজ্ঞান তাঁহারই নাম দিয়াছেন সচ্চিদানন্দ। পরম পুরুষের এরূপ সার্থক নাম আর একটি দৃষ্ট হয় না। এ নামের অর্থ কি, তাহাই আমরা এ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছি। সত্য-জ্ঞান-আনন্দ ইহার মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক ছাপ নাই, যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি মানবমাত্রেরই উপাস্য। বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপাসনা-প্রণালী আছে, তদ্দরুণ ধর্ম্মে ধর্ম্মে পার্থক্য হয়। বস্তুতঃ ধর্ম্ম একই, তাহা হইতেছে মানবাত্মাকে ঈশ্বরমুখী করা। আত্মা একাধারে কর্ত্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা, তাই তাঁহার ত্রিবিধ শক্তি—কর্ম্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি। মানবের এই ত্রিবিধ শক্তিকে যুগপৎ ঈশ্বরমুখী করাই গীতোক্ত যোগধর্ম্ম, উহাই সচ্চিদানন্দ-সাধনা (১৮৭ পৃঃ দ্রঃ)। সুতরাং ইহা মানবমাত্রেরই ধর্ম্ম, বিশ্বমানব-ধর্ম্ম।

সচ্চিদানন্দ-সাধনাই বিশ্বমানব-ধর্ম্ম

২। এই ধর্ম্মকে নারায়ণীয় ধর্ম্ম বা নারায়ণাত্মক ধর্ম্ম বলা হয়। ('এষ একান্তিনাং ধর্ম্মো নারায়ণপরাত্মকঃ'-মভা, শাং, ৩৪৮)। আমাদের শাস্ত্রে, নারায়ণ শব্দে বুঝায় সেই পরমতত্ত্ব যিনি বিশ্বাত্মা, বিশ্বময়, সর্ব্বভূতময় ('নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্'-মভা, শাং ৩৪৯, ৭৩ ; 'বিশ্বং নারায়ণং দেবং অক্ষরং পরমং প্রভুম্'-তৈত্তি-আরণ্যক)। নরই বিশ্বসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রতীক, এই হেতু নারায়ণ শব্দে সমষ্টিমানব যাহাকে বিশ্বমানব (Humanity) বলা হয়, তাহাও বুঝায়। বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বাধার, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। বাসুদেব শব্দেরও ইহাই অর্থ ('সর্ব্বভূত কৃতাবাসো

বাসুদেবেতি চোচ্যতে'-মভা, শাং ৩৪৭, ৯৪)। এই ধর্ম্ম বিশ্বাত্মা ভগবান্ বাসুদেব বা নারায়ণেরই উপাসনা। বিশ্বের মানবমাত্রেই তাহার স্বাভাবিক ত্রিবিধ শক্তি বা বৃত্তিদ্বারা সেই সর্ব্বভূতাত্মা বিশ্বমানব নারায়ণ বা বাসুদেবেরই উপাসনা করেন, তাই ইহার সার কথা—সর্ব্বভূতে সমদর্শন (জ্ঞান), সর্ব্বভূতে প্রীতি (প্রেম), সর্ব্বভূতের সেবা (কর্ম্ম), এই হেতু ইহা বিশ্বমানব ধর্ম্ম।

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন যে, এক সম্প্রদায় পাশ্চাত্য তত্ত্ববিৎ বিশ্বমানব বা Humanityকেই ঈশ্বরের স্থান দিয়াছেন, কিন্তু তথায় উহা এখনও অপুষ্ট দার্শনিক মত মাত্র। কিন্তু ভারতীয় ঋষিশাস্ত্রে এ তত্ত্ব সুপুষ্ট এবং সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীগীতায় উহা ভাগবতধর্ম্মরূপে রূপপ্রাপ্ত।

৩। সনাতন ধর্ম্মের ক্রম-বিকাশ ও বিভিন্ন অঙ্গগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পরবর্ত্তী কালে ভক্তিমার্গের প্রবর্ত্তনে এই ধর্ম্মের বিশেষ রূপান্তর ঘটিয়াছে এবং শ্রীগীতাগ্রন্থে এই পরিবর্ত্তন বিশিষ্ট রূপ পাইয়াছে (১৭৬ পৃঃ)। বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট এই সুপ্রাচীন ধর্ম্মে এমন সকল দৃঢ়মূল মতবাদ জড়িত আছে যে সকল সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কর্ম্মবাদ ও কর্ম্ম-বন্ধন এই সকল মতবাদের অন্যতম। কর্ম্মবাদের মর্ম্ম এই—কর্ম্মের ফল অখণ্ডনীয়, অবশ্যম্ভাবী, ভোগ ব্যতীত উহার ক্ষয় নাই। কর্ম্মফলভোগের জন্যই জীবের পুনর্জন্ম। এক জন্মেই হউক শতকোটি জন্মেই হউক, কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবেই (১৭১ পৃঃ দ্রঃ), সুতরাং পাপীর কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। স্বয়ং ঈশ্বরও উহার অন্যথা করিতে পারেন না। এই মতের সমর্থনে একটি গল্প আছে—এক কৃপণ নানারূপ পাপকর্ম্ম করিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। উহার ফলে সে পরজন্মে অতি দীন-দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। সে ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে জীবনধারণ করিত। একদিন হর-পার্ব্বতী আকাশ-পথে যাইতেছেন, সেই সময় ঐ ভিক্ষুককে দেখিয়া দেবীর দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি ভিক্ষুকের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য পথিমধ্যে তাহার অনতিদূরে নিজের একখানি রত্নালঙ্কার ফেলিয়া দিলেন। ভিক্ষুক উহা দেখিলেই কুড়াইয়া লইবে, এবং উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাহার দুঃখমোচন হইবে, ইহাই দেবীর অভিপ্রায়। কিন্তু কর্ম্মবিধাতার বিধান অন্যরূপ, তাহার ব্যত্যয় করিবে কে? পথে চলিতে চলিতে ভিক্ষুকটির হঠাৎ ইচ্ছা হইল, অন্ধেরা কিরূপে চলে চক্ষু বুজিয়া একবার চলিয়া দেখি। ফলে, সে চক্ষু বুজিয়া চলিতে লাগিল এবং রত্নালঙ্কার পার হইয়া শেষে চক্ষু খুলিল। কাজেই, সে দরিদ্রই রহিয়া গেল। কর্ম্মই বলবান্, বিধিও তাহার বিধান বিফল করিতে পারেন না, সুতরাং কর্ম্মকেই নমস্কার—

'নমস্তৎকর্ম্মভ্যঃ বিধিরপি যেভ্যো ন প্রভবতি।'

কর্ম্মের এইরূপ অপ্রতিহতপ্রভাব ভাগবতধর্ম্ম স্বীকার করেন না। পাপের ফলভোগ আছেই, তাহা অস্বীকার্য্য নয়, কিন্তু একান্তভাবে শ্রীভগবানের শরণ লইলে তিনি তাহা খণ্ডন করিতে পারেন এবং করেন, ইহাই ভক্তিমার্গের কথা। বস্তুতঃ, দয়াময় প্রেমময় পতিত-পাবন পাপ-নাশন শ্রীভগবান্ আছেন, ইহাই যাহাদের সুদৃঢ় ধর্ম্মমত তাহারা কর্ম্মফলের অখণ্ডনীয়ত্ব কিছুতেই স্বীকার করেন না, এবং কর্ম্মফল খণ্ডনের জন্য ভগবদাশ্রয় ব্যতীত অন্য সাধনাদিরও প্রয়োজন বোধ করেন না। ভাগবত শাস্ত্রে এ সকল কথা সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে।—

ভাগবত ধর্ম্মে কঠোর কর্ম্মবাদ মান্য নহে

'শ্রুতঃ সংকীর্ত্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা।
নৃণাং ধূনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্।—ভাঃ ১২।৩।৪৬

—'যাহারা ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ, নাম-সংকীর্ত্তন ও ধ্যান-পূজাদি করেন, হৃদিস্থিত শ্রীভগবান্ তাহাদের অযুত জন্মের সঞ্চিত পাপরাশি নাশ করেন।'

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করে, তবে সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তিলাভ করে ('অপি চেৎ সুদুরাচারঃ' ইত্যাদি ১৫৭ পৃঃ দ্রঃ)। তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব ('সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি ১৫৮ পৃঃ দ্রঃ)

শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

'যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥'—ভাঃ ১১।১৪।১৯

—'যেমন অগ্নি ঊর্দ্ধশিখ হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইলে কাষ্ঠাদি ভস্মসাৎ করে তেমনি হে উদ্ধব, মদ্বিষয়া ভক্তি উদ্দীপ্ত হইয়া একেবারে সমস্ত পাপ বিনষ্ট করে।'

বস্তুতঃ, ভক্তিবাদ ও ভাগবত ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ফলে সনাতন ধর্ম্মে কর্ম্মবাদের প্রভাব যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, পাপীতাপী প্রেমময় করুণাময় ভগবান্কে পাইয়া স্বস্তিলাভ করিয়াছে।

৪। এই কর্ম্মবাদের সঙ্গে যুক্ত আছে দুঃখবাদ ও মোক্ষবাদ। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে এই দুঃখময় সংসারে জন্ম, আবার ইহজন্মের কর্ম্মফলে পুনর্জ্জন্ম। এই জন্মকর্ম্মের নিবৃত্তির নামই মোক্ষ, উহাতেই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি (১৭১ পৃঃ দ্রঃ)। এই মোক্ষের জন্য জ্ঞান-সাধনা, যোগ-সাধনা, কত রকম কৃচ্ছ্র সাধনা—লক্ষ লক্ষ লোকের সংসার-ত্যাগ, কর্মত্যাগ, সন্ন্যাস-গ্রহণ। শ্রীকৃষ্ণোক্ত ভাগবত-ধর্ম্ম এইরূপ মোক্ষবাদ

ও সন্ন্যাসবাদের সমাদর করেন না। শ্রীগীতা বলেন, কর্ম্মত্যাগ করিলেই, সন্ন্যাসী হইলেই মোক্ষলাভ হয় না, মোক্ষ অর্থ কামনা-ত্যাগ। মানব তাহার স্বাভাবিক ইচ্ছাশক্তিকে, বিষয়-কামনাকে যদি ঈশ-কামনায়, ভগবদ্ভক্তিতে, ভগবৎপ্রেমে পরিণত করিতে পারে তবেই তার মোক্ষ হয় (১৮৭ পৃঃ)। সুতরাং ভাগবতধর্ম্মী ভগবদ্ভক্তিই চান, আনন্দস্বরূপ ভগবানকেই চান, মোক্ষের জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব নহেন; না চাহিলেও তিনি তাহা পান, কেননা মোক্ষ অর্থ যদি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় তবে তাহা তাহার ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবেই হইয়া যায়, ভক্তি যে আনন্দ-স্বরূপিণী। তাই একান্তী একনিষ্ঠ ভক্তগণ মোক্ষবাঞ্ছা করেন না, দিতে চাহিলেও তাহা গ্রহণ করেন না।—

ভাগবত ধর্ম্মে সন্ন্যাসবাদের প্রাধান্য নাই

'ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্‌॥'—ভাঃ ১১।২।৩৪

—যে সকল সাধু ধীর ব্যক্তি আমার একান্ত ভক্ত তাহারা কিছুই বাঞ্ছা করেন না, আমি দিতে চাহিলেও তাহারা কৈবল্যসিদ্ধি, পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তি বা মোক্ষ বাঞ্ছা করেন না।

হউক না শত সহস্র জন্ম, জন্মে জন্মে যেন শ্রীপাদপদ্মে অচলা ভক্তি থাকে, ইহাই একান্তী ভক্তের বাঞ্ছা।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥—ভাঃ ১১।১৪।১৪

—'যিনি আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন আমার এমন ভক্ত কি ব্রহ্মপদ, কি ইন্দ্রপদ, কি সার্ব্বভৌম-পদ, কি পাতালের আধিপত্য, কি যোগসিদ্ধি, কি মোক্ষ— কিছুই চাহেন না, আমা ভিন্ন তাহার আর কোন অভিলাষ নাই।'

সুতরাং মোক্ষের জন্য কর্ম্মত্যাগ, সন্ন্যাসগ্রহণ ইত্যাদি সাধনপথ ভাগবতধর্ম্মের পথ নহে। অবিচারে এই মোক্ষবাদ ও সন্ন্যাসবাদের প্রচারে মধ্যযুগে রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভারতের যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা ঐতিহাসিকগণ বিদিত আছেন। শ্রীগীতার পরমশ্রেয়স্কর লোকহিতকর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ মোক্ষ করিয়া ভারতবর্ষ কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি—

'এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্ত্তমান ছিলেন। বৌদ্ধদের পর হ'তে ধর্ম্মটা একেবারে অনাদৃত হ'ল, খালি মোক্ষধর্ম্মই প্রধান হ'ল। এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছো, ওটা ঐ ধর্ম্মের অভাব। যখন বৌদ্ধরাজ্যে, এক এক মঠে এক

সন্ন্যাসবাদে ভারতের দুর্দ্দশা

এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে। বৌদ্ধেরা বল্লে—'মোক্ষের মত আর কি আছে, দুনিয়া-শুদ্ধ মুক্তি নেবে, চল'—বলি তা কি হয়? তুমি গেরস্থ মানুষ তোমার ও সব কথার বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম্ম কর, একথা বলছেন হিন্দুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই, দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পারনা, একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পারনা, মোক্ষ নিতে দৌড়াচ্ছ।

পূর্ব্বে বলেছি সে ধর্ম্ম হচ্ছে কার্য্যমূলক। ধার্ম্মিকের লক্ষণ হচ্ছে সদা কার্য্যশীলতা। তাই তো শ্রীভগবান্ এত করে বুঝিয়েছেন গীতায়, এই মহাসত্যের উপর হিন্দুর 'স্বধর্ম্ম', 'জাতিধর্ম্ম' ইত্যাদি। প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' শেষে 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব' (গীঃ ১১।৩৩)। এই 'জাতিধর্ম্ম' 'স্বধর্ম্ম' নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে। তবু নিধুরাম সিধুরাম যা 'জাতিধর্ম্ম' "স্বধর্ম্ম" বলে বুঝেছেন, ওটা উলটো উৎপাত ; নিধু 'জাতি-ধর্ম্মের' ঘোড়ার ডিম বুঝেছেন।'—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবেই প্রথম ব্যাপকভাবে এদেশে সন্ন্যাসবাদ প্রসার লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু আবার বৌদ্ধযুগের অবসানে যিনি (শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য) বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিলেন, তিনিও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মায়াবাদ এবং সাধন পথে সন্ন্যাসবাদেরই প্রাধান্য দিলেন (২৪-২৫ পৃঃ)। তাঁহার অনন্যসাধারণ মনীষা এবং অপ্রতিহত প্রভাবে এককালে সন্ন্যাসবাদ প্রায় সার্ব্বজনীন মতবাদ হইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মায়াবাদ খণ্ডন করিলেও সন্ন্যাসবাদের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। এমন কি পরিশেষে বাংলা দেশে উহা প্রেমাবতার নদীয়াচাঁদকেও কৌপীন পরাইল। তিনি গৃহে থাকিতে কেহ তাঁহাকে চিনিল না, নাম-প্রচার শুনিল না, কিন্তু যেমনি তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, অমনি লক্ষ লোক তাহার পশ্চাতে ছুটিল, যাহারা বিদ্রূপ করিত, বিরোধিতা করিত, তাহারা আসিয়া পায়ে লুটাইল। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম্মে সন্ন্যাসের তো কোন প্রয়োজন নাই, উহা মায়া-মোক্ষবাদীদের সাধন-পথ। তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি বলিয়া একটি কথা আছে—

'যখন সন্ন্যাস লৈনু ছন্ন হৈল মন।
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন॥'

ভাগবতধর্ম্মী নিজের মুক্তির জন্য ব্যগ্র নন, তাঁহার সাধনা কেবল নিজের মুক্তির জন্য নহে, বিশ্বমানবকে শুদ্ধ ও মুক্ত করিবার জন্য, তিনি বিশ্বকর্ম্মী, তাঁহার সাধনা সর্ব্বজীবের হিতসাধন। শ্রীভাগবত ভক্তরাজ প্রহ্লাদের মুখে বলিতেছেন—

'প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ সবিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ'—ভাঃ ৭।৯।৪৪

প্রায়ই দেখা যায় মুনিগণ নির্জ্জনে মৌনাবলম্বন করিয়া তপস্যা করেন, তাঁহারা তো লোকের দিকে দৃষ্টি করেন না। তাঁহারা তো পরার্থনিষ্ঠ ন'ন, তাঁহারা নিজের মুক্তির জন্যই ব্যস্ত, সুতরাং স্বার্থপর। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে, তাই বলিয়াছেন, 'প্রায়েণ'।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এই পুণ্যভূমি বঙ্গভূমিতেই ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাহার সাক্ষী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। সেই আত্মারাম কর্ম্মযোগীর কর্ম্মের ফলেই বিবেকানন্দ ও সেবাধর্ম্মী সন্ন্যাসিবৃন্দ। আবার তাঁহাদেরই কর্ম্মের ফলে রামকৃষ্ণ মিশন—নগরে, পল্লীতে, তীর্থক্ষেত্রে সেবাশ্রম—নিয়ত নর-নারায়ণ-সেবা ; আর্ত্ত, পীড়িত, দুঃখদৈন্যগ্রস্ত শত সহস্র জীবের কল্যাণ-সাধন। এই সন্ন্যাসিবৃন্দ ত্যাগী, কিন্তু কর্ম্মত্যাগী নহেন, কর্ম্মযোগী ; তাই তাঁহারাই জনসেবার প্রকৃষ্ট অধিকারী। তাঁহারা নিজের মোক্ষের জন্য ব্যগ্র নহেন, তাঁহাদিগের নিকট জনসেবা ব্যক্তিগত মোক্ষেরও উপরে। শ্রীমৎ স্বামীজি অমোঘকণ্ঠে জনসেবার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন—'আমি ভক্তি চাইনা, মুক্তি চাইনা—আমি হাজার নরকে যাব—'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ'।

রামকৃষ্ণ মিশন—জনসেবার মাহাত্ম্য

ভাগবতধর্ম্মী—বিশ্বাত্মার উপাসক, বিশ্বকর্ম্মী, তিনি বিশ্বমানবের দুঃখদুর্দ্দশা উপেক্ষা করিয়া কেবল নিজ মুক্তি-সাধনায় জীবনক্ষেপ করেন না—

> চাহিনা ছিঁড়িতে এক বিশ্বব্যাপী ডোর,
> লক্ষ কোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।
> বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
> আমি একা বসে র'ব মুক্তি-সমাধিতে ?—রবীন্দ্রনাথ

৫। আর একটি বিষয়ে বৈদিক ধর্ম্ম হইতে ভাগবত ধর্ম্ম বিশিষ্ট। প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মে বা 'সনাতনী' ধর্ম্মে স্ত্রীশূদ্রাদির কোন অধিকার নাই। যে কারণেই হউক, সমাজের অধিকাংশ লোককে উচ্চতর আধ্যাত্মিক চিন্তার বা জ্ঞানলাভের কোন অবকাশই দেওয়া হয় নাই। অধিকার-বাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও এরূপ সাধারণ বিধান দ্বারা সমগ্র স্ত্রীসমাজ এবং অনুন্নত সমাজকে চিরকাল অপাংক্তেয় ও অবনীত করিয়া রাখার কোন যৌক্তিকতা নাই। ভাগবতধর্ম্মে এরূপ অযৌক্তিক অধিকারবাদ নাই, উহা মানব-মাত্রেরই ধর্ম্ম। শাস্ত্রজ্ঞানহীন শূদ্রাদির পক্ষে জ্ঞানযোগে মুক্তিলাভ করা সম্ভবপর নহে, সুতরাং তাহারা তাহাতে অনধিকারী, কিন্তু ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের শরণ লইলে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে পাপী-তাপী সকলেই পরমগতি লাভ করিতে পারে।

ভগবানের আরাধনায় অনধিকারী নাই

ভগবানের আরাধনায় জাতিভেদ-জনিত অধিকারভেদ থাকিতে পারে না। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

'মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্'—গীঃ ৯।৩২

—স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র, অথবা যাহারা পাপযোনিসম্ভূত অন্ত্যজ জাতি তাহারাও আমার শরণ লইলে নিশ্চয়ই চরম গতি প্রাপ্ত হয়।

প্রঃ। শ্রীগীতায় তো বর্ণভেদ স্বীকৃত। উহাতে আদ্যন্ত বর্ণ-ধৰ্ম্ম বা স্বধৰ্ম্ম পালনের উপদেশ। সুতরাং ভাগবত-ধৰ্ম্মে জাতিভেদ-জনিত অধিকার-ভেদ নাই, একথা বলা কিরূপে চলে?

উঃ। ভাগবত ধৰ্ম্ম বলিতে কেবল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির বর্ণধৰ্ম্ম বা স্বধৰ্ম্ম-পালন বুঝায় না এবং কেবল হিন্দু-ভারতের চারি বর্ণের জন্যই শ্রীগীতোক্ত ধৰ্ম্ম প্রচারিত হয় নাই। সমাজরক্ষার জন্য মানবমাত্রেরই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কৰ্ম্ম করা উচিত, কৰ্ম্মত্যাগ করা উচিত নয়, ইহাই শ্রীগীতার কথা। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, শাস্ত্রানুসারে যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কৰ্ম্ম, এই হেতু তাঁহাকে যুদ্ধের প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে, কেননা উহাই তাঁহার স্বধৰ্ম্ম। যে সমাজে বর্ণভেদ নাই সে সমাজেও প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য কৰ্ম্ম আছে এবং কৰ্ম্মানুসারে শ্রেণীবিভাগও আছে। 'যাঁহারা ধৰ্ম্ম ও জ্ঞানচর্চ্চা করেন এবং লোকশিক্ষা দেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দেশরক্ষা করেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাঁহারা কৃষিশিল্প-বাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করেন তাঁহারা বৈশ্য এবং যাঁহারা এই তিন শ্রেণীর সাহায্যার্থ পরিচর্য্যাত্মক কৰ্ম্ম করেন তাঁহারা শূদ্র। এই সকল কৰ্ম্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম, তাঁহার duty, তাহাই তাঁহার স্বধৰ্ম্ম ও স্বকৰ্ম্ম।

স্বধৰ্ম্ম-পালন অর্থ কি

সেই কৰ্ম্মটি নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে ঈশ্বরের কৰ্ম্ম বোধে সম্পন্ন করিতে পারিলে উহাদ্বারাই ঈশ্বরের অর্চ্চনা হয় ('স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য' ইত্যাদি গীঃ ১৮।৪৬)। ইহাই শ্রীগীতোক্ত কৰ্ম্মযোগের স্থূল মৰ্ম্ম। ইহাতে জাতিভেদ-জনিত অধিকার-ভেদের কোন কথাই নাই। এই ধৰ্ম্ম-সাধনে ব্রাহ্মণেরও যেরূপ অধিকার, অব্রাহ্মণেরও সেইরূপ অধিকার, হিন্দুর যেরূপ অধিকার, অ-হিন্দুরও সেইরূপ অধিকার। ইহা সার্ব্বজনীন ধৰ্ম্ম।

প্রঃ। কিন্তু শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিতেছেন যে আমি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি এবং তদনুসারে ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনকে ক্ষাত্র ধৰ্ম্ম পালন করিতে উপদেশ দিতেছেন, সুতরাং এই বর্ণভেদ হিন্দুমাত্রেরই মান্য।

উঃ। হিন্দুমাত্রের কেন, মানব-মাত্রেরই মান্য, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর মানেন, তাঁহারই মান্য। ভগবান্ কি কেবল হিন্দুরই ভগবান? তিনি কি কেবল ভারতের হিন্দু সমাজেরই বর্ণ-বিভাগ করিয়া দিয়াছেন? কখন দিলেন?

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ,' ৪।১৩—বর্ণসমুদয় গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমি সৃষ্টি করিয়াছি। এ কথার মর্ম্ম এই যে বর্ণভেদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছে। গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে ইহা হইয়াছে। গুণ কি? গুণ-কর্ম্ম কি? গুণ হইতেছে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ। প্রকৃতি দ্বারেই ভগবান্ জীব-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টিতে যাহা কিছু আছে সকলই ত্রিগুণময় ('ত্রৈগুণ্যময়ী প্রকৃতি')। এই গুণত্রয়ের বিশিষ্ট লক্ষণ আছে—সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক, উহার প্রধান লক্ষণ—জ্ঞান, রজোগুণের লক্ষণ—কর্ম্মস্পৃহা, লোভ, কামক্রোধাদি, তমোগুণের লক্ষণ—অজ্ঞান, আলস্য, জড়তা, নিরুদ্যমতা ইত্যাদি (গীঃ ১৪।১১-১৩)। এই তিনটি গুণ প্রত্যেক মনুষ্যেই আছে, কিন্তু সমভাবে নাই। কাহারও মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, কাহারও মধ্যে রজোগুণের বা তমোগুণের প্রাধান্য। এইরূপ ন্যূনাধিক্যবশতঃ বিভিন্ন লোকের স্বভাব এবং স্বভাবজ কর্ম্মও বিভিন্ন হয়। এই পার্থক্যানুসারেই ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন কর্ম্মবিভাগ হইয়াছে। ইহাই বর্ণভেদের মূল সূত্র, শ্রীগীতাতেই ইহা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে—

বর্ণ-ভেদের মূলসূত্র

'ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥'—গীঃ ১৮।৪০।৪১

—'পৃথিবীতে স্বর্গে বা দেবগণের মধ্যেও এমন প্রাণী বা বস্তু নাই যাহা প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণ হইতে মুক্ত।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্মসকল স্বভাবজাত গুণানুসারেই পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত হইয়াছে।'

ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ-প্রধান, শমদমাদি তাহার স্বভাবের প্রধান গুণ, এই জন্য জ্ঞানচর্চ্চা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি তাহার কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষত্রিয় রজোগুণ-প্রধান, শৌর্য্য-বীর্য্যাদি তাহার প্রধান গুণ, এই হেতু রাজ্যরক্ষা, রাজ্যপালনাদি তাহার কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৈশ্যচরিত্রে তমঃসংমিশ্রিত রজোগুণের আধিক্য, ধনলিপ্সা তাহার প্রধান গুণ, এই হেতু কৃষিবাণিজ্যাদি তাহার কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শূদ্র তমোগুণপ্রধান,

তাহারা স্বভাবতঃই জড়বুদ্ধি, এই হেতু পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তেজ, বৈশ্যের ধন এবং শূদ্রের সেবা দ্বারা সমাজরক্ষার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা হইয়াছে। সমাজরক্ষার অনুকূল এই সুব্যবস্থা অনুসরণ করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়, ইহারই নাম স্বধর্ম্ম-পালন। কিন্তু কাল-পরিবর্ত্তনে লোক-স্বভাবের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, বংশানুক্রমিক একই স্বভাব আবহমানকাল থাকে না, তাহা থাকিলে লোকচরিত্রের উন্নতি অবনতি বলিয়া কোন কথা থাকিত না। ইহজন্মের শিক্ষা-সংসর্গাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে লোক-স্বভাবের স্বতঃ পরিবর্ত্তন হয় (Law of Spontaneous Variation)। এই কারণে এই সুশৃঙ্খল সুব্যবস্থা বিশৃঙ্খল কুব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে বর্ণভেদ বংশগত হইয়া পড়িয়াছে এবং ক্রমে বৃত্তিভেদ অনুসারে অসংখ্য উপজাতির উৎপত্তি হইয়াছে এবং উহার নাম জাতিভেদ হইয়াছে। এই আধুনিক জাতিভেদ এবং আর্য্যশাস্ত্রের ব্যবস্থিত প্রাচীন বর্ণভেদ এক বস্তু নহে। বর্ণভেদ মূলতঃ **গুণানুগত**, জাতিভেদ সম্পূর্ণ ই **বংশানুগত**।

গুণানুগত বর্ণভেদ ও বংশানুগত জাতিভেদ এক কথা নহে

এই বংশগত জাতিভেদ-প্রথার উৎপত্তিও অতি প্রাচীনকালেই ঘটিয়াছিল এবং অনেক প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে ইহাই সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে গুণানুসারেই ব্রাহ্মণত্বাদি নির্দ্দেশ করিতে হইবে, জাতি-অনুসারে নহে। শ্রীমদ্ভাগবত শমদমাদি ব্রাহ্মণের, শৌর্য্যবীর্য্যাদি ক্ষত্রিয়ের ইত্যাদি ক্রমে গীতোক্তরূপ (গীঃ ১৮।৪১-৪৪) চতুর্ব্বর্ণের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া তৎপর বলিতেছেন—

'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥' —ভাঃ ৭।১১।৩৫

—যে পুরুষের বর্ণ-জ্ঞাপক যে লক্ষণ বলা হইল যদি তদন্য বর্ণেও সেই লক্ষণ দেখিতে পাও তবে সেই ব্যক্তিকেও সেই লক্ষণ নিমিত্ত সেই বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে অর্থাৎ যদি শমদমাদি লক্ষণ ব্রাহ্মণেতর জাতিতেও দেখা যায় তবে সেই লক্ষণদ্বারাই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে, তাহার জাতি অনুসারে বর্ণ-নির্দ্দেশ হইবে না। ('শমদমাদিকং যদি জাত্যন্তরেঽপি দৃশ্যেত তজ্জাত্যন্তরমপি তেনৈব ব্রাহ্মণাদি শব্দেনৈব বিনির্দ্দিশেদিতি'—চক্রবর্ত্তী; 'শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ নতু জাতিমাত্রাদিতি'—শ্রীধরস্বামী।

শাস্ত্রে বর্ণভেদ ও জাতিভেদের পার্থক্য

এ স্থলে স্পষ্টই বলা হইল যে বর্ণভেদ গুণগত, জাতিগত নহে।

মহাভারত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে বলিতেছে—

'শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
নৈব শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ'—

—যে শূদ্রে শমদমাদি লক্ষণ থাকে সে শূদ্র নয়, ব্রাহ্মণই ; যে ব্রাহ্মণে উহা না থাকে, সে ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্রই। মভাঃ বন ১৮০, অপিচ বন ৩১২, ১০৮।

মহাভারতে ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদে, উমা-মহেশ্বর সংবাদে এবং অন্যান্য স্থলেও বর্ণভেদের উৎপত্তি, বর্ণভেদ ও জাতিভেদের পার্থক্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সবিস্তর আলোচনা আছে এবং সর্ব্বত্রই সেকালের শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞগণের মুখে বর্ণভেদ গুণানুগত বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। অত্রিসংহিতা, গৌতমসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বিবিধ পুরাণাদিতেও এই তত্ত্বই পাওয়া যায়। ভক্তিশাস্ত্রের 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ' ইত্যাদি কথার মর্ম্মও উহাই, তবে ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির মর্য্যাদা সর্ব্বোপরি, এই বিশেষ।

প্রকৃতিভেদে মনুষ্যে মনুষ্যে ভেদ, চিরকালই থাকিবে, উহারই নাম বর্ণভেদ। এইরূপ বর্ণভেদ অনুসারে অর্থাৎ প্রকৃতিগত যোগ্যতানুসারে কর্ম্মবিভাগ সামাজিক ও ব্যক্তিগত উন্নতির অনুকূল, পরিপন্থী নহে। প্রকৃতপক্ষে সকল সমাজেই উহা কোন না কোন ভাবে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে কালক্রমে উহা বংশগত হওয়াতেই অবনতির হেতু হইয়াছে, মহাত্মাজির ভাষায়—'হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের অভিশাপ' স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু এই অভিশাপকেও আশীর্ব্বাদ বলিয়া প্রচার করিবার জন্য শাস্ত্র প্রণয়নের ত্রুটি হয় নাই। এক দিকে যেমন শাস্ত্রবাক্য আছে, মানুষ জন্মদ্বারা শূদ্রই, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় ('জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ, ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ'), অপর দিকে আবার—মানুষ জন্মদ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণ জন্মিয়াই দেবতারও পূজ্য হয় ('জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ' ইত্যাদি), এইরূপ শাস্ত্রবচনেরও অভাব নাই।

কথা এই, গুণগত জাতিভেদ যখন জাতিগত হইল তখন সঙ্গে সঙ্গে জাত্যভিমানও উহাতে প্রবেশ করিল! উহার ফলেই পরবর্ত্তী কালে এই সকল আভিজাত্যমূলক শাস্ত্রের প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু সেকালেও সত্যনিষ্ঠ শাস্ত্রকারের অভাব ছিল না। মহর্ষি অত্রি এই সকল জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করিয়া কঠোর অপ্রিয় সত্য বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই—

'ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশু উদাহৃতঃ ॥'—অত্রিসংহিতা

—যে ব্রহ্মতত্ত্বের কিছুই জানেনা অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলেই গর্ব্বপ্রকাশ করে সে ব্রাহ্মণ সেই পাপে পশু-ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয়।

এই অভিমান বস্তুটি ভক্তিপথের বিষম কণ্টক, ভক্তিশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই উহা বর্জ্জনের উপদেশ, উহাকে উন্মূলিত করিতে না পারিলে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না, এমন কি তাঁহাকে ডাকিবারও প্রকৃত অধিকার হয় না, ইহাই ভাগবত শাস্ত্রের কথা—

'জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥' ভাঃ ১।৮।২৬

—'উচ্চকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা প্রভৃতির অভিমানে যাহারা স্ফীত, ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করা দূরে থাকুক তাঁহার নাম গ্রহণের উপযোগিতাও তাহাদের নাই। যাঁহারা অকিঞ্চন তাঁহারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।'

'তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর এই মহাবাক্যটির ন্যায় ভক্তিসাধকের পক্ষে পরম হিতকর উপদেশ আর দ্বিতীয়টি নাই। কিন্তু উহা কার্য্যতঃ যথাযথ প্রতিপালন করা সহজ নহে, বড় কঠিন ; অভিমান-ত্যাগ কেবল বাহ্য আচরণের উপর নির্ভর করে না। অহংভাব হইতে উহার জন্ম, উহাকে মন হইতে দূর করিয়া দিলেও আবার অজ্ঞাতসারে আসিয়া উপস্থিত হয়। কথা আছে,—

অভিমান ভক্তিপথের কণ্টক

বৈষ্ণব হইতে বড় ছিল মনে সাধ,
'তৃণাদপি সুনীচেন' পড়ে গেল বাদ।

কেবল জাত্যভিমান নয়, কুলাভিমান, বিদ্যাভিমান, পদাভিমান, ধনৈশ্বর্য্যের অভিমান—নানারূপে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে উহা আমাদিগকে বিমোহিত করে। শ্রীভাগবত বলেন, এই সকল নানাপ্রকার অভিমান যাহার চিত্তকে কোনরূপে অভিভূত না করে তিনিই ভগবানের প্রিয়।—

'ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥' ভাঃ ১১।২।৫১

—'জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতির অভিমান দ্বারা যাহার হৃদয়ে অহংভাব বা অহঙ্কারের উদ্ভব না হয় তিনিই হরির প্রিয়।'

ভাগবত ধর্ম্মে জাতিভেদ-জনিত সঙ্কীর্ণতা নাই

যে ধর্ম্মসাধনার এইরূপ উচ্চ আদর্শ তাহাতে জাতিগত উচ্চনীচভেদ-বুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই।

কেবল জাতিভেদ কেন, সমাজে ধন-ভেদ-জনিত যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়, ভাগবত-ধর্ম্ম তাহারও বিরোধী। আধুনিক কালে সামাজিক সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ বিশেষ

প্রসারলাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজতান্ত্রিকগণ যে আদর্শ সমাজের কল্পনা করেন তাহা এইরূপ—

(১) সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি লোকরক্ষার্থে সাধ্যানুসারে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।

(২) সেই কর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন ধন বা দ্রব্যজাত সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। উহা সমাজের সকলের মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ বিতরিত হইবে। কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না অর্থাৎ প্রত্যেকেই কর্ম্ম করিবে সমাজের হিতার্থে, লোকহিতার্থে, নিজের জন্য নয়।

(৩) সমাজে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, ধনিক-শ্রমিক ইত্যাদি শ্রেণীবিভেদ থাকিবে না।

(৪) এইরূপে 'আমি ধনী,' 'আমি মানী' ইত্যাদি ব্যক্তিগত অহংভাব সমাজ হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইবে।

(৫) এইরূপ সমাজে ব্যক্তিগত ধন-সংসৃষ্ট হিংসাদ্বেষ, বিবাদ-বিসংবাদ লোপ পাইবে। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের প্রভুত্ব লোপ পাইবে। সমাজে সাম্য, মৈত্রী ও অনাবিল শান্তি বিরাজ করিবে।

ভাগবত-ধর্ম্ম ও আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ

পূর্ব্বে যে ভাগবতধর্ম্মানুগত, সর্ব্বভূতহিতে রত, নিষ্কাম কর্ম্মী অহিংসক মানব-সমাজের বর্ণনা করা হইয়াছে (১৯৫-১৯৬ পৃঃ) সেই সমাজ এবং আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদি-গণের পরিকল্পিত মানব-সমাজ আদর্শতঃ একই। সমাজতন্ত্রবাদের একটি মূল নীতি এই যে, সমাজের সকলকে সমভাবে ভোগ করিতে না দিয়া নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করা চৌর্য্য মাত্র (Property is Theft)। আমরা দেখিতে পাই, ভাগবতশাস্ত্রে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের বর্ণনায় অনুরূপ ভাষায় ঠিক এই নীতিরই উল্লেখ আছে।—

'যাবদ্‌ভ্রিয়তে জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত **স স্তেনো দণ্ডমর্হতি** ॥'—ভাঃ ৭।১৪।৮

—'যে পরিমাণ ধনাদিতে নিজের ভরণপোষণ হয় তাহাতেই দেহীদিগের স্বত্ব; যে তাহার অতিরিক্ত ধনসম্পত্তির অভিলাষ করে **সে চৌর**; সে দণ্ড পাইবার যোগ্য।'

কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের কোন বিশিষ্ট স্থান নাই। বৈদান্তিক সমত্বজ্ঞান ও লোকহিতার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম যে ধর্ম্মের মূল ভিত্তি সেই উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মের সহিত যদি তাহারা পরিচিত থাকিতেন তবে ধর্ম্ম বস্তুটিকে এমন সরাসরি বাদ দিতে পারিতেন না। কেননা, তাহারা যে কর্ম্মনীতি প্রচার করেন,

ইহলৌকিক দৃষ্টিতে গীতোক্ত ধর্ম্মের কর্ম্মনীতিও প্রায় তাহাই, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যাহাই হউক।

বস্তুতঃ লোক-ব্যবহারে বৈদান্তিক সাম্যবাদ ও সমত্বদৃষ্টিমূলক লোকহিতকরা আচরণ শিক্ষা দেওয়াই ভাগবত ধর্ম্মের লক্ষ্য। বিবিধ শাস্ত্রের বিভিন্ন মতবাদের বাদ-বিতণ্ডার ঊর্দ্ধে উঠিয়া সংস্কারমুক্ত চিত্ত লইয়া নিরক্ষেপভাবে শাস্ত্রার্থ পর্য্যালোচনা করিলে এবং বিবিধ শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে সমগ্র সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের লক্ষ্যই হইতেছে বিশ্বাত্মার উপাসনা—সর্ব্বভূতে বিশ্বাত্মার ভাবনা, সর্ব্বজীবে প্রীতি, সর্ব্বজীবের হিতসাধন। সর্ব্বশাস্ত্রময়ী শ্রীগীতা সনাতন ধর্ম্মের এই সারতত্ত্বটি ভাগবত ধর্ম্মরূপে জগতে প্রচার করিয়াছেন। ইহ জগতে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান।

ভারতের সাধনা—জগদ্ধিতায়

সংস্কৃত ভাষার শব্দ-সম্পদ অতুলনীয়, কিন্তু এই ভাষায় ইংরেজী patriotism শব্দের কোন প্রতিশব্দ দৃষ্ট হয় না। অধুনা আমরা এই বস্তুটি বুঝাইতে স্বদেশ-প্রীতি, স্বাদেশিকতা, দেশধর্ম্ম, দেশাত্মবোধ, স্বাজাত্যবোধ ইত্যাদি নানা শব্দ আহরণ করিয়া লই। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরূপ কোন শব্দ পাওয়া যায় না। এই হেতু অনেকে মনে করেন যে, এ দেশে চিরকালই এই বস্তুটির অভাব ছিল।

এ অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' (রামায়ণ)—ইহা প্রাচীন হিন্দুরই কথা। দেশমাতৃকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তি-সূচক সার্থক বাণী ইহা অপেক্ষা আর কি আছে? বস্তুতঃ প্রাচীনগণের দেশপ্রীতি দেশভক্তিরূপে প্রকাশিত হইত। তাঁহারা এই ভারতভূমিকে পুণ্যভূমি, কর্ম্মভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (কর্ম্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্-বিঃ পুঃ ২।৩।২)। দেবগণও এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা করেন ('অতোঽপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভারতভূতলে'—ভাঃ ৫।১৯), যাঁহারা ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা ধন্য, দেবগণও এইরূপ গীতগান করেন ('গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে··· ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ'-বিঃ পুঃ ২।৩।২৪), এ সকল কথা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন হিন্দুগণের দেশভক্তি

বিবিধ পুরাণে সমগ্র ভারতবর্ষের পুণ্যতোয়া নদী সকলের উল্লেখ আছে এবং এই সকল মহানদীর নামোচ্চারণ করিলেই পবিত্র হওয়া যায়, এইরূপে তাহাদের মাহাত্ম্য-বর্ণনা আছে। হিন্দুশাস্ত্র, গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-নর্ম্মদা-সিন্ধু-কাবেরীর পবিত্র সলিল সম্মুখে স্মরণ

পুরাণে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য-বর্ণনা

করিয়া ('জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু') পিতৃকার্য্য ও দেবকার্য্যাদি সম্পন্ন করিবার বিধান দিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই নদনদীসকল কেবল কোন এক রাজ্যে বা কেবল আর্য্যাবর্ত্তেই অবস্থিত নহে, সমগ্র ভারত ব্যাপিয়াই ইহাদের অবস্থান। ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত থাকিলেও প্রাচীন হিন্দুগণ আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষকেই আপনাদের মাতৃভূমি বলিয়া মনে করিতেন, আপনাদিগকে ভারত-সন্তান বলিয়া জ্ঞান করিতেন।—

'উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥'

প্রাচীনেরাও আধুনিকগণের ন্যায় বলিতেন—'সার্থক জনম মোদের জন্মেছি এই দেশে'।—

'অত্র জন্ম সহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥'—বিঃ পুঃ ২।৩।২৩

—জীবগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর পুণ্যবলে কদাচিৎ এই ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম লাভ করে।

বস্তুতঃ প্রাচীন হিন্দুদেরও দেশভক্তি ছিল, দেশাত্মবোধ ছিল। কিন্তু ইহা পাশ্চাত্যের দুরন্ত স্বাজাত্যবোধের ন্যায় উগ্রভাবে স্ফূর্ত্তি পায় নাই। পাশ্চাত্যের দেশাত্মবোধ অহংসর্ব্বস্ব, পরস্বাপহারী। উহার প্রভাবে জগতের কত আদিম জাতি ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, কত জাতি দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষও একদিন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল, কিন্তু সৈন্যসামন্ত লইয়া নহে, ভিক্ষুক প্রচারক, পরিব্রাজক লইয়া; সমগ্র জগৎ গ্রাস করিবার জন্য নহে, জগতে প্রীতি ও শান্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য। উহাই ভারতীয় ধর্ম্মের, ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট লক্ষণ। প্রাচীন হিন্দুর দেশাত্মবোধ বিশ্বাত্মবোধে ডুবিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

পাশ্চাত্যের দিগ্বিজয় ও ভারতের দিগ্বিজয়

হিন্দুর দেশাত্মবোধ বিশ্বাত্মবোধের অন্তর্গত

'মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
ভ্রাতরো মনুজাঃ সর্ব্বে স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥'

সেই সুপ্রাচীন যুগে বৈদিক ঋষির প্রার্থনা-বাণীতে আমরা দেখি—'মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে'—আমি যেন সমস্ত প্রাণীকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করি (১৬৩ পৃঃ দ্রঃ)।

এই দৃষ্টি—সর্ব্বভূতে প্রীতি, সর্ব্বভূতের সেবা, সর্ব্বভূতের তুষ্টি—ইহাই সমগ্র ঋষিশাস্ত্রের মূলকথা। মানবজীবন পরার্থে, এ কথা সকল শাস্ত্রই সমস্বরে উপদেশ দেন।

ঋগ্বেদ বলেন—'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী'—যে ভোজ্যদ্রব্য অন্যকে না দিয়া কেবল নিজেই ভক্ষণ করে সে কেবল পাপরাশিই সঞ্চয় করে। মনু বলেন—'বিঘসাশী ভবেন্নিত্যং'—নিত্য বিঘসাশী হইবে। কুটুম্ব, আশ্রিত, অতিথি আদির ভোজনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে 'বিঘস' বলে। এই ভুক্তাবশিষ্ট দ্বারাই জীবন রক্ষা করিতে হইবে। শ্রীগীতা বলেন—'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ'—(গী ৩।১৩ ; অপিচ মনু ৩।১১৮) যে পাপাত্মারা কেবল আপন উদর পূরণার্থ অন্ন পাক করে তাহারা গ্রাসে গ্রাসে পাপরাশিই ভোজন করে।

সর্ব্বভূতহিত—ঋষি-শাস্ত্রের মূলকথা

মানুষ জীবনরক্ষার্থ অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাণিহিংসা করিতে বাধ্য হয়। শাস্ত্রকারেরা গৃহস্থের পাঁচ প্রকার 'সূনা' অর্থাৎ জীবহিংসাস্থানের উল্লেখ করেন—'কণ্ডনী, পেষণী, চুল্লী, চোদকুম্ভী চ মার্জ্জনী'—উদূখল, জাতা, চুলা, জলকুম্ভ ও ঝাঁটা। এগুলি গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য, অথচ এগুলিতে কীটপতঙ্গাদি প্রাণিবধও অনিবার্য্য। সুতরাং তাহাতে পাপও অবশ্যম্ভাবী। উপায় কি? তাই হিন্দুশাস্ত্র পাপ মোচনার্থ নিত্যকর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন—'পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য পঞ্চযজ্ঞাৎ প্রণশ্যতি'। ব্রহ্মযজ্ঞ (অধ্যাপনা, বিদ্যাদান), পিতৃযজ্ঞ (তর্পণাদি দ্বারা জলদান), দৈবযজ্ঞ (হোমাদি দ্বারা ঘৃতদান), নৃযজ্ঞ (অতিথি সৎকার আদি দ্বারা অন্নদান), ভূতযজ্ঞ (কাকাদি জন্তুকে অন্নদান)—এই সকল নিত্যকৃত্য পঞ্চযজ্ঞ।

শাস্ত্রে নিত্যকর্ত্তব্য তর্পণের ব্যবস্থা আছে। যে কর্ম্মদ্বারা অপরের তৃপ্তি হয় তাহাই তর্পণ। এই তর্পণ-মন্ত্রসকল 'তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে 'আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু' মন্ত্রে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। উদ্দেশ্য উদার, আদর্শ উচ্চ, দৃষ্টি বিশ্বমানবেরও উপরে বিশ্বাত্মার দিকে। কিন্তু বুঝে কে? বুঝিয়া কাজ করে কে? যেটুকু আছে কেবল বাহ্য, কেবল মন্ত্রপাঠ। 'আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু' ('ব্রহ্মা হইতে তৃণশিখা পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মদ্দত্ত সলিলদ্বারা তৃপ্ত হউক') মন্ত্র পড়িয়া জলের ছিটা দিয়া 'তর্পণ' সমাপন করিয়া আহারে বসিলাম। কি বিপদ্, তৃষ্ণার্ত্ত বিড়ালটি আসিয়া হঠাৎ জলপাত্রে মুখ দিয়াছে! অমনি কাষ্ঠ-পাদুকার নিদারুণ প্রহার! বেচারী সেই প্রহারেই গৃহ ছাড়িল। আমার হিন্দুয়ানির কোন ক্ষতি হইল না, কিন্তু হিন্দুত্বের শেষ। বস্তুতঃ ভূতযজ্ঞাদি ব্যবস্থার উদাত্ত ভাব স্মরণ করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাটাই মনে পড়ে—'আমরা কি সেই হিন্দু?'

পঞ্চযজ্ঞাদির উদার উদ্দেশ্য

এই সকল বিধি-ব্যবস্থা বেদ-মূলক। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বিবিধ যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে। এই সকল বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম কি কালক্রমে

লোকে তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। উৎকৃষ্ট ধর্ম্মও কালে কালে অপধর্ম্মে পরিণত হয়। স্বর্গাদি লাভই পরম পুরুষার্থ এবং তদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এই সকল যজ্ঞাদি ক্রিয়া-কর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম, কালক্রমে এইরূপ মত প্রসারলাভ করিয়াছিল। ইহাকে শ্রীগীতায় বেদবাদ বলা হইয়াছে, এবং ইহার তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে (গীঃ ২।৪২-৪৪ ও ১৬৪ পৃঃ দ্রঃ)। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিলেন—যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য, ত্যাজ্য নয়, কিন্তু ঐ সকল কর্ম্ম ফলকামনা ত্যাগ করিয়া ধরিতে হইবে, তবেই উহা চিত্তশুদ্ধিকর হয় (গীঃ ১৮।৫।৬)। ঐ সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য লোকরক্ষা, লোকহিত। এইরূপে শ্রীগীতা কাম্যকর্ম্মমূলক বৈদিক ধর্ম্মকে লোকহিতকর নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অঙ্গরূপে পরিণত করিলেন।

ভাগবত ধর্ম্মে কাম্যকর্ম্মের পরিহার

অপর দিকে আবার সনাতনধর্ম্মে আর একটি মতবাদ বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল—সেটি হইতেছে কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাসবাদ। কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ত্যাগ সম্বন্ধে বিবাদের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে (১৬৫-৬৬ পৃঃ)। সন্ন্যাসবাদী বেদান্তী বলেন, আত্মজ্ঞান ভিন্ন কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি নাই এবং কর্ম্ম থাকিতে জ্ঞানও হয় না। সুতরাং সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ বা সন্ন্যাসগ্রহণই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র উপায় ('কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ প্রমুচ্যতে')। ইহাকেই তাঁহারা বলেন 'নৈকর্ম্ম্য-সিদ্ধি' অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিলেন—কর্ম্মচেষ্টা না করিলেই পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি বা মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। বন্ধনের কারণ হইতেছে অহঙ্কার ও কামনা। অহঙ্কার ও ফলাসক্তি-ত্যাগ করিয়া নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করিলেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয় (গীঃ-৩।৪, ১৮।৪৯)। সুতরাং মোক্ষের জন্য কর্ম্মত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না। তাই শ্রীভাগবত বলেন—

ভাগবত ধর্ম্মে সন্ন্যাসবাদের পরিহার

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥ ভা-১১।৩।৪৭

—বেদোক্ত কর্ম্মাদি আসক্তিশূন্য হইয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে সম্পন্ন করিলেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ কর্ম্মের বন্ধকত্ব দূর হয়। নিম্ন অধিকারীর উহাতে রুচি জন্মাইবার জন্য স্বর্গলাভাদি ফলের কথা বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য লোকহিত।

ঈশ্বর সর্ব্বভূতময়, এই বেদান্ত তত্ত্বই সনাতন ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। সুতরাং সর্ব্বভূতে সমদর্শন, সর্ব্বভূতে প্রীতি ও সর্ব্বভূতহিত সাধনই এই ধর্ম্মমতে শ্রেষ্ঠ সাধনা। কিন্তু একদিকে কাম্যকর্ম্মমূলক স্বর্গমুখী বেদবাদ এবং অপরদিকে কর্ম্মত্যাগমূলক নির্ব্বাণমুখী সন্ন্যাসবাদ এই দুইটি মতবাদের আবির্ভাবে সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপটি প্রায় অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীগীতা এই দুই মতবাদেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং উহাদিগকে পরিহার করিয়া নিবৃত্তিমূলক প্রবৃত্তি মার্গ বা ভক্তিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম

মার্গ উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপে শ্রীভগবান্ প্রাচীন ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সংস্কার সাধন করিয়া লোকহিতকর ভাগবতধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীগীতায় সনাতন ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সংস্কার

জ্ঞানমার্গে অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষর চিন্তাদ্বারাও সেই পরতত্ত্বের অনুভব হইতে পারে ইহা শ্রীগীতায়ও স্বীকৃত, কেননা যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ, তিনি নির্গুণ-গুণী পুরুষোত্তম। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—যাঁহারা সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিয়া অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মোপাসনা করেন তাঁহারাও আমাকেই পান ('তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ'—গীঃ ১২।৩-৪)।

এস্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, জ্ঞানমার্গাবলম্বী নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকেরও সর্ব্বভূত-হিতে রত থাকিতে হইবে, এইরূপ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ। সন্ন্যাস লইয়া সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া গিরি-গহ্বরে বা যোগাশ্রমে মোক্ষকামনায় ব্রহ্ম-ভাবনা বা আত্মচিন্তায় নিরত থাকিবে, এরূপ উপদেশ বিবিধ শাস্ত্রে আছে, কিন্তু এরূপ সাধকেরও যে সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিতে হইবে এরূপ নির্দ্দেশ কেবল শ্রীগীতাতে শ্রীভগবদ্বাক্যেই দৃষ্ট হয়। আবার

জগতের হিতই ভাগবত ধর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণ

শ্রীভগবান্ ভক্তিমার্গে ভগবদুপাসনার শ্রেষ্ঠতার উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রিয় ভক্তের যে সকল লক্ষণ বলিয়াছেন তাহারও প্রথম কথাই—'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'-গী ১২।৩—যিনি সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, সকলের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন ও দয়াবান্ সেইরূপ ভক্তই আমার প্রিয় ('স মে প্রিয়')। বস্তুতঃ সর্ব্বভূতহিত, জগতের হিতই ভাগবতধর্ম্মের একটি মুখ্য অঙ্গ—তাই এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের সার্থক প্রণাম-মন্ত্র—

'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।'

প্রঃ। এই প্রণাম-মন্ত্রটিতে 'গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ' এই কথাটিও আছে। 'জগদ্ধিতায়' বলাতেই তো সমস্তই উহার অন্তর্ভুক্ত হইল। আবার বিশেষ করিয়া গোব্রাহ্মণের উল্লেখ কেন ?

উঃ। 'গোব্রাহ্মণহিত' বলিতে কি বুঝায় ? গাভী অত্যাবশ্যক উপাদেয়-খাদ্য দুগ্ধ প্রদান করে, গাভীর সন্তানগণ হলকর্ষণ করিয়া ধান্যাদি খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে। এই কৃষিপ্রধান দেশে ধান্যই ধনের প্রতীক। সুতরাং গোধন হইতেছে আমাদের দৈহিক ও ঐহিক মঙ্গলের হেতু। আর ব্রাহ্মণত্ব আধ্যাত্মিকতার প্রতীক, ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্রাহ্মণই আমাদের আধ্যাত্মিক ও পারত্রিক মঙ্গলের হেতু। সুতরাং মন্ত্রটির অর্থ এই—যিনি আমাদের দৈহিক ও ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান করেন, এবং জগতের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল বিধান করেন, সেই পরমপুরুষকে নমস্কার, পুনরায় নমস্কার।—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাগবত-জীবন—শ্রীশ্রীকৃষ্ণকথামৃত

মানবজীবনের লক্ষ্য কি? ভাগবত জীবন কাহাকে বলে? এই প্রশ্নটি গ্রন্থারম্ভে উত্থাপিত হইয়াছিল এবং উহার উত্তরেই এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইল। তাহাতে পাঠকের সন্তোষজনক উত্তর মিলিল কিনা বলিতে পারি না। যাহা হউক, ঐ মূল প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে নানা প্রসঙ্গে যে সকল কথা বিক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে সে সকলের সারমর্ম্ম সংক্ষিপ্তভাবে পুনরায় বলিতেছি।

মানব-জীবনের লক্ষ্য কি?

শ্রুতিবাক্যে আমরা দেখিয়াছি যে জীব আনন্দস্বরূপ হইতেই জন্মিয়াছে, আনন্দস্বরূপের দিকেই গমন করিতেছে, আনন্দস্বরূপেই প্রবেশ করিবে (২২ পৃঃ)।

দুর্ল্লভ মানব-জন্মের সার্থকতা কিসে

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, আনন্দস্বরূপের দিকে গমনের পথে জীব বহু বহু যোনি অতিক্রম করিয়া শেষে এই দুর্ল্লভ মানব-জন্ম লাভ করিয়াছে (১৭-১৯ পৃঃ)। মানবের জ্ঞানশক্তি, কর্ম্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি উপযুক্তরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হওয়াতে সে বিবিধ সাধনপথের অধিকারী হইয়াছে। মনুষ্য-জন্মেই জীব স্বীয় সাধনবলে সেই আনন্দস্বরূপের সাধর্ম্ম্য, সারূপ্য বা সাযুজ্য লাভ করিতে পারে, উহাই মানব-জীবনের লক্ষ্য।

ভাগবত জীবন কাহাকে বলে?

জীবের অন্তর্নিহিত কর্ম্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি, এই তিনটি সাধনবলে বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরমুখী হইয়া পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত হইলেই জীব ঐশ্বরিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

ভাগবত-জীবনের দ্বিবিধ অর্থ

উহাতেই সচ্চিদানন্দের সাধর্ম্ম্যলাভ, উহাই ভাগবত জীবন (১৮৭ পৃঃ দ্রঃ)। ইহা সিদ্ধির অবস্থা। এই সিদ্ধ্যবস্থা লাভ করিবার জন্য যাঁহারা শ্রীভগবানের উপদিষ্ট সাধনমার্গের অনুসরণ করেন তাঁহাদিগকেও ভক্ত বা ভাগবত বলা হয়। সুতরাং সাধনাবস্থায় ভাগবত জীবন বলিতে ভক্তের জীবন অর্থাৎ ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য ভক্তগণ কিরূপভাবে জীবন যাপন করেন, কিরূপভাবে সংসারে বিচরণ করেন, কিরূপভাবে সাধনভজন করেন, এ সকলও বুঝায়।

প্রঃ। শাস্ত্রে আছে, জীব ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করে ('স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে'—গীঃ ১৪।২৬)। উহাই তো মোক্ষ,

সংসার-ক্ষয়, উহাতেই তো সর্ব্বার্থসিদ্ধি। মোক্ষলাভের পর, সংসার-ক্ষয়ের পর, আবার জীবন কোথায়? সুতরাং সিদ্ধাবস্থাকে ভাগবত-জীবন বলিবার সার্থকতা কি?

উঃ। শাস্ত্রে ভগবদ্বাক্যে, যেমন এ কথা আছে যে জীব ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি এ কথাও আছে যে জীব আত্যন্তিক ভক্তিযোগদ্বারা ত্রিগুণাতীত হইয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হয় ('যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে' ভাঃ ৩।২৯।১৪, ১১।২৫।৩২)। কথা একই, তিনিই তো ব্রহ্ম। সুতরাং ভগবানের ভাব বা সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত যে জীবন তাহাকে ভাগবত জীবন বলিলে কি অসঙ্গতি হয়? বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায়ের মোক্ষের ধারণা বিভিন্নরূপ, এই হেতু মোক্ষের পরে আবার জীবন কি, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আমরা পূর্ব্বে মায়াবাদী, মোক্ষবাদী, দুঃখবাদী, এবং সুখবাদী, লীলাবাদী, জীবনবাদী সাধকের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছি (২৪-২৫, ৩৭ পৃঃ)। যাঁহারা মায়া-মোক্ষবাদী তাঁহারা জ্ঞানযোগ বা ধ্যানযোগ অবলম্বন করত আত্মাকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া মোক্ষ বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা করেন। তাঁহাদের পক্ষে ভাগবত জীবন বলিয়া কোন কিছু নাই, কেননা তাঁহাদের নিকট জীবনটাই স্বপ্ন, মায়া, মিথ্যা। জীবন অর্থই কর্ম্ম, তাঁহাদের কর্ম্ম নাই, তাঁহাদের মতে কর্ম্ম লোপ না পাইলে মোক্ষ লাভই হয় না। কিন্তু যাঁহারা লীলাবাদী, জীবনবাদী তাঁহাদের মতে জগৎ সত্য, জীবন সত্য, কর্ম্মও সত্য—এ সকল হইতেছে লীলাময়ের লীলা—এ জগৎ-লীলা মিথ্যা নয়,—তাই তাঁহারা তাঁহাদের জীবন, তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়া তাঁহার লীলাপুষ্টির জন্য তাঁহারই কর্ম্মবোধে ('মৎকর্ম্মকৃৎ') কর্ম্ম করেন। ত্রিগুণের মূলে রহিয়াছে কামনা-বাসনা। সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়া ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করিয়াও ভগবানের কর্ম্মবোধে লোকরক্ষার্থে ও লোকহিতার্থে কর্ম্ম করা চলে এবং ভাগবতধর্ম্মে তাহাই বিহিত। এইরূপ জীবনকেই ভাগবত জীবন বলা হয়।

কামনাত্যাগেই ব্রাহ্মী স্থিতি

অন্য ভাষায় বলিলে ইহাই ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত জীবন বা ব্রাহ্মীস্থিতি। কামনাসকল ত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রহ্মভাব লাভ হয় এবং তাহা এই জীবনেই ঘটিতে পারে, ইহা ব্রহ্মবিদ্যা বা উপনিষৎ শাস্ত্রেরই কথা—

'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথো মর্ত্তোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
...এতাবদ্ধ্যনুশাসনম্'॥ —কঠ ২।৩।১৪।১৫

—মানবহৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত আছে সেই সকল যখন দূর হয়, তখন মরণধর্ম্মা মানুষই অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মকে সম্ভোগ করে, ব্রহ্মপ্রাপ্তিজনিত সুখ লাভ করে। এইটুকু মাত্রই সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রের সার উপদেশ।

এইটুকু মাত্রই সমগ্র ভাগবতশাস্ত্রেরও উপদেশ—কামনা ত্যাগ কর, সতত আমাতে চিত্ত রাখ, তোমার সমস্ত কর্ম্ম মনে মনে আমাতে অর্পণ করিয়া আমার কর্ম্মে পরিণত কর, আমার ইচ্ছায় আমার ভৃত্যবোধে আমার লীলারক্ষার্থ লোকহিতার্থে অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম কর। সর্ব্বকর্ম্ম করিতে থাকিলেও মৎপ্রসাদে আমাকেই পাইবে (গীঃ ১৮।৫৬)। ইহাই ভাগবত জীবন, ইহাই ভাগবত ধর্ম্ম।

কামনা ত্যাগেই ভাগবত-জীবন লাভ

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় অর্জ্জুনকে এবং শ্রীভাগবতে উদ্ধবকে এই ধর্ম্মতত্ত্ব এবং এই ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে সবিস্তার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই সকল কথার অনুবাদ করিয়াই আমরা এ বিষয়টি সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিব।

প্রঃ। কিন্তু মূল কথাটাই সম্যক্ বুঝিয়া উঠা কঠিন। সৃষ্টি ত্রিগুণময়, জীব ত্রিগুণের অধীন। ভগবান্ ত্রিগুণাতীত, সুতরাং জীব ঐশ্বরিক প্রকৃতি বা ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ করিবে কিরূপে?

উঃ। এ প্রশ্নের উত্তর বুঝিবার পূর্ব্বে প্রশ্নটির অর্থ কি তাহাই ভালরূপ বুঝা উচিত। জীব বলিতে কি বুঝায়? জীব দেহ বা ইন্দ্রিয়াদি নয়, জীব হইতেছেন দেহী অর্থাৎ দেহে যিনি আবাস লইয়াছেন সেই আত্মা। সুতরাং প্রশ্নটির অর্থ হইল যে, জীবাত্মা ত্রিগুণের অধীন, প্রকৃতি-পরতন্ত্র, তাহার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, সুতরাং তিনি ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বর-সারূপ্য পাইবেন কিরূপে? অল্প কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলে না। শ্রীভাগবতে পরম ভাগবত উদ্ধব এই প্রশ্নও উত্থাপন করিয়াছেন এবং শ্রীভগবান্ তাঁহার সবিস্তার উত্তর দিয়াছেন। তাহাই সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।—

উদ্ধব। বিভো! ত্রিগুণের মধ্যে থাকিয়া জীব কিরূপে ত্রিগুণ অতিক্রম করিবে? গুণকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে দেহী দেহজাত কর্ম্ম ও সুখাদিতে কিরূপে বদ্ধ না হইয়া থাকিবে? আর কোন কোন মতে বলা হয়, গুণগণের সহিত দেহেরই সম্বন্ধ, আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই ('সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃস্বভাববান্')। তাহা হইলে জীব দেহেন্দ্রিয়াদির কর্ম্মে এবং তজ্জনিত সুখদুঃখে বদ্ধ হয় কেন? এই আমার প্রশ্ন। তবে কি একই আত্মা নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত? এই আমার ভ্রম হইতেছে। "নিত্যবদ্ধো নিত্যমুক্ত এক এবেতি মে ভ্রমঃ" (ভাঃ ১১।১০।৩৫-২৭)।

শ্রীভগবান্। প্রকৃতি-দ্বারে আমি সৃষ্টি করি। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, প্রকৃতির এই তিন গুণ। প্রকৃতিকেই মায়া বলা হয়, উহা আমারই সৃজনী শক্তি। আমার সত্ত্বাদি গুণরূপ উপাধিবশতঃ আত্মাকে বদ্ধ বা মুক্ত বলা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তিনি তাহা নহেন, স্বরূপতঃ তাহার বন্ধ-মোক্ষ নাই। আমি কি কেবল জীবকে বদ্ধ করিবার জন্য ত্রিগুণ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আবদ্ধ

জীবের ধর্ম্ম ও মোক্ষের কারণ

করিয়াছি? না, তাহা নহে। বস্তুতঃ সৃষ্টিতে বন্ধ-মোক্ষকরী আমার দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে—অবিদ্যা (অজ্ঞান) ও বিদ্যা (জ্ঞান)। একান্ত ভাবে আমার শরণ লইলে আমিই তাহার অবিদ্যা দূর করিয়া জ্ঞান দান করি। আমার অংশস্বরূপ অনাদি জীবেরই অবিদ্যাদ্বারা বন্ধ হয় এবং বিদ্যাদ্বারা মোক্ষ হয়।—

'বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো ন মে বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বাৎ ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্॥
বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥' ভাঃ ১১।১১।১।৩।৪

উদ্ধব। আপনি বলিলেন, জীব আপনার সনাতন অংশ। আপনি একথাও বলিয়াছেন যে আপনি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। আপনি কি হৃদয়ে জীবাত্মরূপে অবস্থিত না পরমাত্মরূপে অবস্থিত?

শ্রীভগবান। জীবাত্মা ও পরমাত্মা, উভয়রূপেই জীব-হৃদয়ে অবস্থিত আছি। ব্যাপারটি কিরূপ শুন—এক বৃক্ষে (দেহে) দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) নীড় নির্ম্মাণ করিয়া একত্র বাস করে। ইহারা পরস্পর সদৃশ ও সখা। একটি পক্ষী বৃক্ষের সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে (বিষয় ভোগ করে), অপরটি নিরাহার হইলেও নিজ বলে শ্রেষ্ঠতর। যিনি ফল ভক্ষণ করেন না তিনি আপনাকে ও অন্যকে জানেন, তিনি বিদ্বান্। যিনি ফল ভক্ষণ করেন (বিষয় ভোগ করেন) তিনি সেরূপ নহেন, তিনি অবিদ্যার সহিত সংযুক্ত, তাই তিনি নিত্যবদ্ধ। যিনি বিদ্যাময় তিনি নিত্যমুক্তঃ॥

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥
আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বান্ অপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ॥

—ভাঃ ১১।১১।৬-৭

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক

এই শ্লোকটি প্রায় অনুরূপ ভাষায় শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। ('দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, ইত্যাদি মুঃ ৩।১-২, শ্বেত ৪।৬-৭ দ্রঃ)। এই উপমাদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহারা উভয়ে সদৃশ এবং পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন, ইহাদের মধ্যে ভেদেও অভেদ। এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া একটি প্রেমরসাত্মক সুন্দর সঙ্গীত হইয়াছে—

এক শাখী পরে, দু-বিহগবরে
সুখে বসবাস করে রে,
উভে উভয়ের সখা প্রেমে মাখা মাখা
দোঁহে দোঁহায় নিরখে রে।
(একজন) সুরস রসাল লইয়ে যতনে দিতেছে আর সখারে,
(আর জন) লভিয়ে সে ফল, প্রেমেতে বিহ্বল
সুখেতে ভোজন করে।
(সখা দেখেন কেবল নিরশন থেকে, ফলদাতা ফল দিয়ে সুখী)

জীবাত্মা ও পরমাত্মায় এই যে পরস্পর সখ্য ভাবের বর্ণনা এ স্থলে মধুর ভাবের আরোপ করিলেই রাধাকৃষ্ণ-লীলার মর্ম্ম বুঝা যায় (১০১-১০২ পৃঃ দ্রঃ)।

যাহা হউক, জীবের সংসার-বন্ধনের প্রকৃত কারণ হইতেছে অবিদ্যা বা অজ্ঞান। কিন্তু মনুষ্য উচ্চতর স্তরের জীব বলিয়া তাহার জ্ঞানও অনেকটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সে যে প্রকৃতির ত্রিগুণে বা বিষয়-মায়ায় আবদ্ধ সে জ্ঞান অনেকের না আছে তাহা নয়, অথচ তাহারা মায়া অতিক্রম করিতে পারে না। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নই পরে উদ্ধব উত্থাপিত করিলেন।—

উদ্ধব। প্রভো, মনুষ্যেরা অনেকেই বিষয় সকলকে আপদের স্থান বলিয়া মনে করে; তথাপি কেন কুক্কুর, গর্দ্দভ ও ছাগের ন্যায় সেই সকল বিষয় উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়? ('তথাপি ভুঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং শ্বখরাজবৎ'—ভাঃ ১১।১৩।১১)?

শ্রীভগবান্। অবিবেকী ব্যক্তির হৃদয়ে এই দেহটাকে অবলম্বন করিয়া 'আমি' এই মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে মন ঘোরতর রজোগুণে সংবদ্ধ হয় ('অহমিত্যন্যথাবুদ্ধিঃ প্রমত্তস্য যথা হৃদি উৎসর্পতি রজো ঘোরং'); রজোযুক্ত মনে বিবিধ সঙ্কল্প-বিকল্প উৎপন্ন হয় ('রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ'); তাহা হইতেই বিষয়-চিন্তা জনিত নানারূপ দুঃসহ কামনা-বাসনার উদ্ভব হয় ('ততঃ কামো গুণধ্যানাদ্ দুঃসহঃ স্যাদ্ধি দুর্ম্মতেঃ')। এইরূপে রজোগুণে বিমোহিত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভাবী ফল দুঃখজনক বুঝিয়াও বিবিধ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মসকল করিয়া থাকে ('করোতি কামবশগঃ কর্ম্মাণ্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ')। মনকে সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া অল্পে অল্পে সমাধি অভ্যাস করিবে, এ সম্বন্ধে আমার শিষ্য সনকাদি এইরূপ যোগোপদেশ দেন।—ভাঃ ১১।১৩।৮-১৪

বিষয় দুঃখজনক জানিয়াও জীব উহাতে মুগ্ধ হয় কেন?

উদ্ধব। বিভিন্ন মুনিঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেয়ঃসাধন নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আপনি অহৈতুকী ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছেন। লোকে অন্যান্য মতও অনুসরণ করিয়া থাকে। এই সকল মত কি স্ব স্ব-প্রধান, না বৈকল্পিক? এ সকল মতভেদের কারণ কি?

শ্রীভগবান্। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ন্যূনাধিক্যবশতঃ মানবগণের প্রকৃতি বিভিন্ন হয় এবং তাহাদের বুদ্ধিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এইরূপ প্রকৃতি-বৈচিত্র্যহেতু শ্রেয়ঃ-সাধন সম্বন্ধে তাহাদের মতও বিভিন্নরূপ হয় ('এবং প্রকৃতি-বৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্')। কেহ কেহ আবার বুদ্ধিবিচার না করিয়া পরম্পরাগত প্রথারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে ('পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ')। আবার অনেক পাষণ্ডী মতও আছে ('পাষণ্ডমতয়োঽপরে')। (ভাঃ ১১।১৪ শ অঃ)। এ সকলের ফল তুচ্ছ।

প্রকৃতি-বৈষম্য হেতু সাধ্য-সাধন বিভিন্ন হয়

যিনি আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং সকল বিষয়ে নিরপেক্ষ, আত্মস্বরূপ আমাদ্বারা তাহার যে সুখ হয় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের সে সুখ কোথায়? যিনি আমাদ্বারাই সন্তুষ্টচিত্ত তাহার সমস্ত দিক্ সুখময় ('ময়া সন্তুষ্ট-মনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ'—ভাঃ ১১।১৪ অঃ)।

ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা

উদ্ধব। বিষয়ী লোকে বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও কি আপনার সাধন ভজন করিতে পারে?

শ্রীভগবান্। কথা হইতেছে এই যে—বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত বিষয়েই আসক্ত হইয়া পড়ে, আর আমার চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত আমাতেই বিলীন হয় ('বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে' —ভাঃ ১১।১৪।২৭)। সুতরাং বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও যদি চিত্তটি বিষয়ে না রাখিয়া আমাতে যুক্ত রাখিতে পারে তবে আর কোন আশঙ্কা নাই। ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত না থাকাতে যদি আমার ভক্ত বিষয়কর্ত্তৃক আকৃষ্টও হন, তথাপি অন্তরে প্রগাঢ় ভক্তি থাকাতে তিনি প্রায়ই বিষয়ে অভিভূত হন না, একেবারে বিষয়-কীট হইয়া পড়েন না ('বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে'—ভাঃ ১১।১৪।১৮)। প্রশ্ন করিয়াছিলে, জীব ত্রিগুণের অধীন, কামনা বাসনায় অভিভূত, সে আমার সাধর্ম্ম্য বা স্বরূপতা লাভ করিবে কিরূপে? আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারাই তাহা সম্ভবপর হয়, ভক্তির প্রভাবেই মানবাত্মা কামনা-নির্ম্মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হয়।—

ভক্তিদ্বারাই চিত্ত কামনা-নির্ম্মুক্ত হয়

'যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥'—ভাঃ ১১।১৪।২৫

—যেমন স্বর্ণ অগ্নির উত্তাপ-সংযোগে ভিতরের ময়লা পরিত্যাগ করিয়া নিজের বিশুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা মদ্‌ভক্তিযোগদ্বারা বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মৎস্বরূপতা লাভ করে।

'কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ' ॥—ভাঃ ১১।১৪।২৩

—ভক্তি বিনা কিরূপে চিত্ত কামনা-বাসনা হইতে নির্ম্মুক্ত হইবে? শরীরে রোমাঞ্চ, হৃদয়ে আর্দ্রভাব এবং নয়নে আনন্দাশ্রুকণা ভিন্ন ভক্তিই বা কিরূপে জানা যায়?

উদ্ধব। কিন্তু প্রভো, নিষ্কাম-ভক্তিও তো সুদুর্লভ, চিত্তে বিষয়-বাসনা থাকিতে কিরূপে এরূপ বিশুদ্ধা ভক্তির উদয় হইবে? বিষয়-বিমুগ্ধ, কামনা-কলুষ জীবের হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র হইবে কিরূপে? নয়নে আনন্দাশ্রু আসিবে কোথা হইতে?

শ্রীভগবান্। ভক্তিযোগেই ভক্তি আসিবে, আর সব আসিবে। প্রথমে চাই শ্রদ্ধা। যাহার আমার কথায় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে ('জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু'), তিনি যদি বিষয়সকল দুঃখাত্মক জানিয়াও ঐ সকল পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হন ('বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ'), তাহা হইলেও সেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি, এক ভক্তি হইতেই সমুদয় হইবে এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া ('শ্রদ্ধালু-র্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ'), সেই সকল কামনা উপভোগ করিয়াও সঙ্গে সঙ্গে দুঃখজনক বলিয়া উহাদের নিন্দা করিবেন ('যুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্') তৎপর প্রীতির সহিত আমার ভজনায় প্রবৃত্ত হইবেন ('ততো ভজেত মাং প্রীতঃ'—ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)। এইরূপে মৎকথিত ভক্তিযোগে নিরন্তর আমার ভজনা করিতে করিতে হৃদ্‌গত কামনাসকল নষ্ট হইয়া যায়, আমিই তো হৃদয়ে অবস্থিত আছি ('কামা হৃদ্য্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে')। অখিলাত্মা আমার সাক্ষাৎ পাইলে তাহার হৃদয়-গ্রন্থি (অহঙ্কার, কামনা-বাসনা) ছিন্ন হয়, সকল সংশয় দূর হয়, তাহার কর্ম্ম-বন্ধন ঘুচিয়া যায় ('ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি'—ভাঃ ১১।২০।২৯-৩০)।

উদ্ধব। জ্ঞান ব্যতীত কি হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, অহঙ্কার দূর হয়, কর্ম্ম-বন্ধ ঘুচে? অজ্ঞানীর উপায় কি?

শ্রীভগবান্। তাই তো বলিয়াছি, জ্ঞানস্বরূপ আমিই যে হৃদয়ে অবস্থিত আছি। অর্জ্জুনকেও আমি এই কথা বলিয়াছিলাম—হৃদয়স্থ আমি উজ্জ্বল জ্ঞান-রূপ দীপদ্বারা আমার ভক্তগণের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করি ('অহং অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা'—গীঃ ১০।১১)।

আমার পুণ্যকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা যেমন যেমন আত্মা নির্ম্মল হইতে থাকে ('যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ') তেমনি তেমনি সাধক সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করিতে থাকেন ('তথা তথা পশ্যন্তি বস্তু সূক্ষ্মম্'—ভাঃ ১১।১৪।২৬)। ভক্তিযোগে যে সাধকের চিত্ত আমাতে যুক্ত থাকে ('তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ'), তাহার পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য (বিষয়-গ্রহণ না করা) প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না ('ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ'—ভাঃ ১১।২০।৩১)। ক্রিয়াযোগের দ্বারা, তপস্যাদ্বারা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যদ্বারা ('যৎকর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ'), আর যোগের দ্বারা, দান ধর্ম্মের দ্বারা বা অন্যান্য ব্রতনিয়মানুষ্ঠান দ্বারা যাহা লাভ করা যায় ('যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি') তৎ সমস্তই আমার ভক্ত মদীয় ভক্তিযোগদ্বারা অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন ('সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা'), এবং ইচ্ছা করিলে স্বর্গ, মোক্ষ বা আমার লোক (গোলোক, কি বৈকুণ্ঠ) লাভ করিতে পারেন ('স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি'—১১।২০।৩২-৩৩)।

হৃদিস্থ ভগবানই জ্ঞান-দীপদ্বারা মোহান্ধকার নষ্ট করেন

কিন্তু আমার প্রতি একান্ত প্রীতিযুক্ত ভক্তগণ কিছুই অভিলাষ করেন না, কৈবল্য বা পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ দিতে চাহিলেও নিতে ইচ্ছা করেন না, ('ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্')। এই যে আমা ব্যতীত আর কিছুই অভিলাষ না করা, আর কোন-কিছুরই অপেক্ষা না করা, সর্ব্ববিষয়ে নৈরপেক্ষভাব, ইহাই পরম নিঃশ্রেয়স ('নৈরপেক্ষং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্')। ইহাই নির্গুণা ভক্তি। আমার একান্তী ভক্তগণের ত্রিগুণের বন্ধন নাই ('ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ'—ভাঃ ১১।২০।৬৫-৩৬)। এইরূপে নিষ্কাম ভক্তগণ গুণসঙ্গপরিত্যাগ করিয়া ('গুণসঙ্গং বিনির্ধূয়') ভক্তিযোগে একমাত্র আমাতেই একনিষ্ঠ হইয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হন (**'ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে'**—ভাঃ ১১।১৫।৩০-৩৩)।

নির্গুণা অহৈতুকী ভক্তির লক্ষণ

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি গীতা-ভাগবতে সিদ্ধ্যবস্থার বর্ণনায় ভগবদ্‌বাক্যে সর্ব্বত্রই এই কথা আছে—'সাধক আমার ভাবপ্রাপ্ত হন' (পৃঃ ১৮৬ দ্রঃ)। এখানেও সেই কথা। 'আমার' ভাব কি ?—কেহ বলেন—মোক্ষ (শঙ্কর), কেহ বলিয়াছেন, মৎসাযুজ্য (শ্রীধর), কেহ বলিয়াছন মৎস্বরূপতা (চক্রবর্ত্তী), আবার কেহ বলিয়াছেন, 'আমার ভাব' অর্থ আমাতে ভাব, রতি বা প্রেম (শ্রীজীব)। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণের অনেকেই শেষোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভক্তিমার্গের দিক্ হইতে দেখিলে এই ব্যাখ্যা সুসঙ্গত, সন্দেহ নাই। রাগানুগ ভক্তগণ তো সাযুজ্য সারূপ্যাদি মোক্ষ বাঞ্ছা করেন না, তাঁহাদের অভীষ্ট—'পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু, মোক্ষাদি

আনন্দ যার নহে এক বিন্দু'—চৈঃ চঃ—শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্মে ভক্তিসুখসম্পদই তাঁহাদের জীবনের সারবস্তু ('জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্'—ভঃ রঃ সিঃ)। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে 'আমার ভাব প্রাপ্ত হন' কথার 'মোক্ষপ্রাপ্ত' হন, এরূপ ব্যাখ্যা করার কোন সার্থকতা নাই। স্থূল কথা এই যে, জীবাত্মা দেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ত্রিগুণের অধীন হয়েন, এবং তজ্জনিত কামনা বাসনায় বিমুগ্ধ হইয়া 'আমি' 'আমার' ভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন। সাধক যখন এই দেহ-চৈতন্যের ঊর্দ্ধে উঠিয়া ব্রহ্মচৈতন্যে ('সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে'—গীঃ ৩।২৮), অথবা আত্মচৈতন্যে (সর্ব্বভূতস্থ-মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি'—গীঃ ৬।২৯) অথবা ভাগবত-চৈতন্যে ('যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি'—গীঃ ৬।৩০) অবস্থান করেন, তখনই তিনি ভাগবত স্বভাব বা সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হন। এক তত্ত্বই ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, এই ত্রিবিধ নামে অভিহিত হন এবং সাধকের ভাববৈশিষ্ট্য হেতু ত্রিবিধভাবে প্রকাশিত হন। সুতরাং ব্রহ্মবাদী জ্ঞানযোগীর সিদ্ধ্যবস্থাকে বলা হয় ব্রহ্মসিদ্ধি বা ব্রাহ্মীস্থিতি, আত্মসংস্থ ধ্যানযোগীর সিদ্ধ্যবস্থাকে বলা হয় কৈবল্য-সিদ্ধি ; ভক্তগণ ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ বা কৈবল্য বাঞ্ছা করেন না, তাঁহাদের সিদ্ধ্যবস্থাকে বলা হয় ভাগবত জীবন। এই জীবন ভগবৎসেবায় অর্পিত ; ভগবৎকর্ম্মে উৎসর্গীকৃত।

প্রঃ। ভক্তিযোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বাক্যে একটি কথা আছে—এই পথে জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না (২২০ পৃঃ)। অন্যত্র ভগবদ্বাক্যেই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রশংসাও আছে। সুতরাং এই কথাটির মর্ম্ম ভালরূপ বুঝা গেল না।

উঃ। জ্ঞানের প্রয়োজন তো আছেই, কিন্তু জ্ঞান বলিতে অনেক কিছু বুঝায় যাহা ভক্তিমার্গে বিশেষ প্রয়োজনে আইসে না, বরং ভক্তি-সাধনার অন্তরায় হয়।—যেমন নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্ম-চিন্তায় ভাবভক্তির কোন স্থান নাই, সগুণ ঈশ্বর-চিন্তা ভিন্ন ভক্তির বিকাশ সম্ভবপর নয়। আবার, অদ্বৈত চিন্তায়,—আমি ব্রহ্ম এই ভাবেও ভক্তির অবকাশ নাই। আবার, এই সৃষ্টি, স্বপ্নবৎ, এই জগৎ-প্রপঞ্চ মায়াময়, মিথ্যা, এইরূপ জ্ঞানকেও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বলা হয় ; কিন্তু ভক্তগণ লীলাবাদী, এই সৃষ্টি, এই জগৎ-লীলা, আনন্দময়ের আনন্দ-লীলা, ইহাই ভক্তিবাদের কথা। সংসার-প্রপঞ্চ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে ভগবানের লীলাও মিথ্যা হয়, লীলাময়ও মিথ্যা হইয়া পড়েন ; জীব, জগৎ, ঈশ্বর সকলই স্বপ্ন হইয়া পড়ে ('ঈশ্বরত্বন্তু জীবত্বং স্বপ্নোঽহয়ং অখিলং জগৎ'-পঞ্চদশী)। এইরূপ জ্ঞানচর্চ্চা ভক্তিমার্গে শ্রেয়স্কর নয়, বলাই বাহুল্য। 'জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিদুঃখ-দোষানুদর্শনম্'—ইহাও জ্ঞানের লক্ষণ, এইরূপ বলা হয়। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-সঙ্কুল

ভক্তিমার্গে অদ্বৈত জ্ঞানচর্চ্চাদি শ্রেয়স্কর নহে

দুঃখময় এই সংসার, জীব ত্রিতাপে তাপিত, দুঃখকষ্টে ম্রিয়মাণ, এইরূপ দুঃখের চিন্তায় চিত্ত ভারাক্রান্ত হইলে দয়াময়, প্রেমময়, সুখস্বরূপ সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি অনুরাগের শৈথিল্য জন্মিতে পারে, এমন কি, তাঁহাতে অবিশ্বাসও আসিতে পারে। সতত দুঃখচিন্তায় যাহারা মুখ ভার করিয়া থাকে তাহারা আনন্দস্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না, এ পথে চাই প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা (২৬ পৃঃ দ্রঃ)। এই সকল 'জ্ঞানের' লক্ষণ বা 'জ্ঞানীর' লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু ভক্তিমার্গে উহাদের বিশেষ উপযোগিতা নাই।

প্রঃ। কিন্তু বৈরাগ্যও ভক্তিমার্গে প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না, একথার অর্থ কি? এ দেশে ভক্তগণ তো সকলেই 'বৈরাগী'।

উঃ। বৈরাগ্য বলিতে বুঝায়—(১) বিষয়-কামনা-ত্যাগ, (২) বিষয়-ভোগ ত্যাগ। কামনা-ত্যাগ না হইলে কেবল বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিলেই বৈরাগ্য হয় না। মনে মনে ইন্দ্রিয়-বিষয় কামনা করিয়া বাহ্যতঃ বিষয়ভোগ ত্যাগ করিয়া যে 'বৈরাগী' হওয়া, উহা ফল্গুবৈরাগ্য, মিথ্যাচার (গীঃ ৩।৬)। কিন্তু বিষয়-কামনা ত্যাগ করিয়া অনাসক্তভাবে যথাপ্রাপ্ত বিষয়ভোগ করিলে কোন ক্ষতি হয় না। বরং ভক্তিমার্গে একেবারে বিষয়-গ্রহণ ত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্রসাধনাদি করা শ্রেয়স্কর নহে, উক্ত বাক্যের ইহাই মর্ম্ম। বিষয়াসক্তিই ঈশ্বর-প্রাপ্তির অন্তরায়, অনাসক্তচিত্তে বিষয়ভোগ অন্তরায় নহে, বরং সহায়ক। কিরূপে?—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভক্তিবাদ জগৎ অস্বীকার করে না, জগৎ-প্রপঞ্চ মায়া-মিথ্যা বলে না—এই সৃষ্টিতে আনন্দস্বরূপেরই প্রকাশ, ইহা তাঁহারই আনন্দ-লীলা। জগতের রূপ-রস সুন্দর হইয়াছে, সরস হইয়াছে, সেই আনন্দস্বরূপের, রসস্বরূপের স্পর্শে। বিষয়ের রূপ-রস, মানব-হৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি-দয়া-মৈত্রী এ সকল তো তাঁহারই রূপ-রস-স্নেহ-প্রীতির অভিব্যক্তি। ভক্তিপূতচিত্তে এ সকল তাঁহারই দানরূপে গ্রহণ করিলে ক্ষুদ্র বিষয়ানন্দও সেই পরমানন্দের সন্ধান দিতে পারে। বিষয়ের মোহও প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে। ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হৃদয়ের সুকোমল ভাবসকল নিষ্পেষণ করিয়া কেবল 'মোহ' 'মোহ' বলিয়া হা-হুতাশ করিলে চিত্ত-কাঠিন্য জন্মে, শুষ্কতা ও নীরসতা আইসে। উহা প্রেমভক্তি সাধনার সহায়ক হয় না, বরং অন্তরায় হয়। এ বিষয়টি পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে (২৯-৩২ পৃঃ দ্রঃ)।

ভক্তিমার্গে কঠোর বৈরাগ্য শ্রেয়স্কর নহে

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের এই কথাটির নানারূপ সমালোচনা হইয়াছে। উহা শ্রীভাগবতের পূর্ব্বোক্ত কথারই পরিপোষক। পর পৃষ্ঠার কবিতাটিতে এই তত্ত্বটিই অনুপম ভাষায় পরিস্ফুট—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
... ... এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণ গন্ধময়! প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া ;
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

ইহা সৃষ্টিতে, প্রপঞ্চে আনন্দময়ের আনন্দলীলার অনুভূতি। প্রেমের চক্ষে সকলই সুন্দর, সকলই মধুময়, এ সকল যে রসময়, দয়াময় প্রেমময়ের দয়ার দান—এস্থলে বৈরাগ্যের কথা উঠে না, এখানে বিশুদ্ধ ভোগ। কিন্তু যে সেই রসময়কে ভুলিয়া বিষয়রসে লোলুপ, বিষয়-বাসনায় মুহ্যমান, তাহার নিকট এ সমস্ত কথার কোন মূল্য নাই। তাহার পক্ষে এইরূপ নির্লিপ্তভাবে বিষয় ভোগ করা সম্ভবপরই হয় না। উপনিষদে একটি কথা আছে,—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত সমস্ত ভোগ্য বিষয় উপভোগ করেন ('সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি' —তৈত্তিঃ ২।১।৩)। বলা বাহুল্য বিষয়-কামনা ত্যাগ না হইলে ব্রহ্মকে জানা যায় না, আর নির্ব্বিশেষে কামনা ত্যাগ হইলে যখন ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হয়, তখন সর্ব্বপ্রকার বিষয়ানন্দও ব্রহ্মানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত হয়, কেননা ব্রহ্ম ছাড়া তো বিষয় নাই। বেদান্তের ভাষায় তখন সকলই ব্রহ্মময়, ইহাই ব্রহ্মের সহিত বিষয় ভোগ করা ('ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'—ঈশ ১)। ভক্তিশাস্ত্রের ভাষায়, ইহাকেই 'কৃষ্ণের সংসার', 'কৃষ্ণের বিষয়', এই সকল কথা বলা হয়। কিন্তু মুখে বলা যত সহজ, 'আমার' সংসার, 'আমার' বিষয়কে 'কৃষ্ণের' সংসার বলিয়া প্রকৃত অনুভব করা তত সহজ ব্যাপার নহে, অনেক সময় এ সকল কথা বলিয়া আত্মবঞ্চনা করা হয় মাত্র। ইহাতে চাই—আমাদের ভাবনা, কামনা, কর্ম্ম, বিষয়-আশ্রয় সকলই ঈশ্বরমুখী করা, ঈশ্বরে অর্পণ করা, ঈশ্বরে উৎসর্গ করা। এইরূপে ঈশ্বরে নিবেদিত জীবনের যে বিষয়ভোগ তাহাই বিশুদ্ধ। ভক্তিমার্গের প্রধান

কথাই হইতেছে—শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিবেদন, উহাই ভাগবত-জীবন বা ভগবানে উৎসর্গীকৃত জীবন। এই কথাই উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন।—

উদ্ধব। প্রভো, আপনি বলিলেন যে যোগদ্বারা বা জ্ঞান-বৈরাগ্য বা তপস্যা দ্বারা যাহা যাহা লাভ হয় তৎসমস্ত ভক্তিযোগ দ্বারাই লাভ হইতে পারে। সেই ভক্তিযোগ সাধন সবিস্তার আমাকে উপদেশ করুন।

শ্রীভগবান। পূর্ব্বে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে বলিয়াছি। আচ্ছা, পুনরায় বলিতেছি, ভক্তিযোগই ভক্তির কারণ ('পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্')।—

প্রথম কথা—আমার অমৃতময়ী কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা ('শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে'), শ্রবণান্তর তাহার অনুকীর্ত্তন ('শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্'), আমার পূজায় পরিনিষ্ঠা ('পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং'), স্তুতিবাক্যে আমার স্তব ('স্তুতিভিঃ স্তবনং মম'), আমার সেবাতে সমাদর ('আদরঃ পরিচর্য্যায়াং'), সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা (অষ্টাঙ্গে) আমার অভিনন্দন ('সর্ব্বাঙ্গৈরভিনন্দনম্')—এই সকল ভক্তিসাধনার সাধারণ অঙ্গ।

দ্বিতীয় কথা—কায়, মন, বাক্য সম্পূর্ণরূপে আমাতেই অর্পণ করিতে হইবে, সে কিরূপ?—শরীরের দ্বারা যে কোন কর্ম্ম করিবে অর্থাৎ লৌকিক কর্ম্মাদি আমার উদ্দেশ্যেই করিবে ('মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ'), বাক্যের দ্বারা আমার গুণ কীর্ত্তন করিবে ('বচসা মদ্গুণেরণম্'), মনটি সম্পূর্ণরূপে আমাতেই অর্পণ করিবে ('ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ')।

তৃতীয় কথা—সর্ব্ববিধকামনাত্যাগ ('সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্'), কামনাবাসনাও আমাতেই অর্পণ করিতে হইবে, আমা ভিন্ন অন্য কোন অভিলাষ থাকিবে না ; আমার জন্য অর্থ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ করিবে ('মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ')। লোকে স্বর্গাদিকামনায় যজ্ঞদানাদি ধর্ম্মকর্ম্ম করে, সে সকল কর্ম্মও—যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, তপ, ব্রত-নিয়ম, এ সমস্তই আমার উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিবে ('ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থে যদ্ব্রতং তপঃ')। মোট কথা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ, যাহাকে সংসার-জীবনের পুরুষার্থ বলা হয়, তাহা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়া আমার উদ্দেশ্যেই আচরণ করিবে। ('মদর্থে ধর্ম্ম কামার্থান্ আচরন্ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ')। লোকের লৌকিক কর্ম্মসকলও যদি ফল কামনা না করিয়া আমাতে অর্পিত হয় তবে তাহাতে ধর্ম্মই হয় ('যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ'—ভাঃ ১১।২৯।২১)। এইরূপে যে মনুষ্যেরা আমাতে আত্ম-নিবেদন করিয়াছেন, জীবনটি আমাতে সম্পূর্ণ অর্পিত করিয়াছেন, তাহাদেরই আমাতে ভক্তি জন্মে, তাহাদের সকল অর্থই সিদ্ধ হয়, তাহাদের আর কিছু প্রাপ্তব্য অবশিষ্ট

ভক্তিযোগসাধন—ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ

থাকে না ('এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্। ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে'।)—ভাঃ ১১শ স্কন্ধ, ১৯অঃ, ১১অঃ।

আর একটি কথা এই—সর্ব্বভূতে আমাকে চিন্তা করিবে ('সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ' —ভাঃ ১১।১৯ অঃ)। আমার প্রতিমাদির পূজার্চ্চনা, সেবা-পরিচর্য্যার কথা বলিয়াছি, কিন্তু আমি তো কেবল প্রতিমাতে নই, আমি সর্ব্বাত্মা, আমি তোমার হৃদয়েও আছি, সর্ব্বভূতেও আছি ('সর্ব্বভূতেষ্বাত্মনি চ সর্ব্বাত্মাহমবস্থিতঃ')। নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আপনাতে ও সর্ব্বভূতে আমাকে অন্তরে বাহিরে পূর্ণ দর্শন করিবে ('মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্। ইক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথাখমমলাশয়ঃ।'—ভাঃ ১১।২৯ অঃ)। যিনি সর্ব্বভূতে আমার সত্তা দর্শন করেন অচিরে তাহার অহঙ্কার, স্পর্দ্ধা, অসূয়া ও অভিমান নাশ পাইয়া থাকে ('স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি')। লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, স্বজনের হাসি-উপহাস উপেক্ষা করিয়া (বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্), কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সমুদয় জীবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ('প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ ভূমাবশ্বচাণ্ডালগোখরম্')। যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আমার সত্তা প্রত্যক্ষ উপলব্ধ না হয় ('যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে), ততদিন পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে এইরূপ উপাসনা করিবে।

ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধন—সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব চিন্তা ও সর্ব্বভূতের সেবা

হে উদ্ধব, **সর্ব্বভূতে আমার অস্তিত্ব চিন্তা করা এবং কায়মনোবাক্যে সর্ব্বভূতের সেবা করাই** সকল ধর্ম্মের মধ্যে সমীচীন, ইহাই আমার মত।—

—'অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সমীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ'।

এই আমি তোমাকে মদীয় নিষ্কাম ধর্ম্মতত্ত্ব বলিলাম। ইহাতে ব্রহ্মবাদেরও সার কথা আছে ('ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ')। ইহা বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি এবং মনীষীদিগের মনীষা ('এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্'। ইহা জ্ঞাত হইলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকেনা। অমৃত পান করিলে আর কি পেয় অবশিষ্ট থাকে ? ('পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে')। মনুষ্য যখন নিজের জন্য কোন কর্ম্ম না করিয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া আমার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয় ('নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে') তখন সে অমৃতত্ব লাভ করিয়া ('তদাঽমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো') আমার আত্মভূত হইবার যোগ্য হয় ('ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ') ভাঃ ১১।২৯ শ অঃ।

জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগাদি দ্বারা মনুষ্যের যে অর্থ লাভ হয় তোমার সম্বন্ধে সে সমুদয়ই আমি। একান্তভাবে আমার শরণ লইয়া আমার দ্বারাই অকুতোভয় হও ('ময়া

স্যা হ্যকুতোভয়ঃ'—ভাঃ ১১।১২।১৫)। আমি তোমাকে বিস্তৃতরূপে যে শিক্ষা দিলাম নির্জ্জনে তাহা চিন্তা করিবে ('বিবিক্তমনুভাবয়ন্'), বাক্য ও চিত্ত আমাতেই নিবিষ্ট রাখিয়া আমার ধর্ম্মে নিরত থাকিবে ('ময্যাবেশিতবাক্‌চিত্তো মদ্ধর্ম্মনিরতো ভব')।

চরম উপদেশ—ভগবচ্ছরণাগতি

শ্রীশুকদেব নিম্নোক্ত স্তুতি-বাক্যে এই ধর্ম্মোপদেশ প্রকরণের সমাপন করিয়াছেন—

'য এতদানন্দসমুদ্রসংভৃতং জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতম্।
কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা সশ্রদ্ধয়াসেব্য জগদ্বিমুচ্যতে ॥'

—'যোগেশ্বরগণ যাঁহার চরণসেবা করেন সেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভক্তের প্রতি কথিত ভক্তিরূপ আনন্দসমুদ্রের সহিত একীকৃত এই জ্ঞানামৃত যিনি শ্রদ্ধার সহিত অল্প করিয়াও পান করেন তিনি মুক্ত হন, তাঁহার সংসর্গে জগৎও মুক্ত হইয়া থাকে।'—ভাঃ ১১।২৯।৪৮।

'ভবভয়মপহর্ত্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ ভৃত্যবর্গান্ পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি ॥'

'যিনি ভবভয় নাশ করিবার জন্য, ভ্রমর যেরূপ পুষ্প হইতে মধু উত্তোলন করে তদ্রূপ, বেদসাগর হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান বেদসার-সুধা উদ্ধার করিয়া ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়াছিলেন সেই নিগমকর্ত্তা কৃষ্ণাখ্য আদ্য পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি।' ভাঃ ১১।২৯।৪৯।

এই বর্ণনা হইতে আমরা দেখিলাম যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের হিতার্থ যে বিশিষ্ট ধর্ম্মমত উপদেশ করিয়াছেন তাহাই তিনি এ প্রকরণে বর্ণনা করিয়াছেন। 'আমার ধর্ম্ম', 'আমার মত' এইরূপ কথা শ্রীভাগবতে ভগবদুক্তিতে অনেক স্থলেই আছে এবং শ্রীগীতাতেও অনুরূপ কথা আছে (গীঃ ৩।৩১।৩২)। বস্তুতঃ শ্রীগীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে যে সকল বিষয় উপদেশ করিয়াছেন শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ৯ম হইতে ২৯শ অধ্যায়ে সেই সকল বিষয়েরই পুনরুল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং শ্রীভাগবতের আলোকে দেখিলে শ্রীগীতোক্ত যোগধর্ম্মটির স্বরূপ কি তাহা আমরা স্পষ্টতররূপে বুঝিতে পারি। শ্রীভাগবতে ইহাকে ভক্তিযোগ বলা হইয়াছে এবং ভক্তির মাহাত্ম্য সর্ব্বত্রই অতি উজ্জ্বলরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই ভক্তিযোগের স্বরূপটি কি পূর্ব্বে আমরা তাহা দেখিয়াছি (২২৪-২২৫ পৃঃ)। ইহাতে ভক্তির সহিত নিষ্কাম কর্ম্মের এবং সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাবরূপ জ্ঞানের সংযোগ আছে, অর্থাৎ ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম এ তিনেরই সমাবেশ আছে। শ্রীগীতোক্ত ধর্ম্মেরও উহাই মূল কথা, এ বিষয়ে পূর্ব্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

গীতা ও ভাগবতে একই ধর্ম্মতত্ত্ব উপদিষ্ট

এক্ষণে গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশ অনুসরণ করিয়া কিরূপে ভক্তগণের জীবন যাপন করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কয়েকটি স্থূল কথা শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ হইতে উল্লেখ করিতেছি।—

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ

অর্জ্জুন পূর্ব্বাপরই যুদ্ধার্থে উদ্যোগী ছিলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধ যখন আসন্ন, তখন অর্জ্জুনের দেহমন অবসন্ন, তিনি ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন। এই 'অর্জ্জুন-বিষাদ' লইয়াই গীতারম্ভ।

অর্জ্জুন। হে কৃষ্ণ, যুদ্ধে স্বজনদিগকে নিহত করিয়া আমি মঙ্গল দেখি না। আমি জয়লাভ করিতে চাহি না, রাজ্যও চাহি না, সুখভোগও চাহি না। ('ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ')। আমি রাজ্যসুখলোভে স্বজনদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া মহাপাপে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমি শস্ত্রত্যাগ করিয়া প্রতিকারে বিরত হইলে যদি শস্ত্রধারী দুর্য্যোধনাদি আমাকে বধ করে তাহাও আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর হইবে।

শ্রীভগবান্। তুমি তো বেশ পণ্ডিতের মত কথা বলিতেছ। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারা কাহারও জন্য শোক করেন না। কারণ, প্রকৃত পক্ষে কেহই মরে না, দেহটি মাত্র বিনষ্ট হয়, আত্মার মৃত্যু নাই, আত্মা অবিনশ্বর।

অর্জ্জুন। আত্মা অবিনাশী বলিয়া কি লোক-হত্যায় পাপ হয় না? মানিলাম যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম, অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু তাই বলিয়া কি রাজ্যলাভ কামনায় গুরুজনাদি বধ করিতে হইবে? এরূপ ধর্ম্ম-সঙ্কটে কর্ত্তব্য কি? প্রকৃত ধর্ম্ম কি, এ সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে ('ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ')। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাপন্ন, আমাকে সদুপদেশ দাও। যাহা আমার ভাল হয়, আমাকে নিশ্চিত করিয়া তাহাই বল ('যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে')।

শ্রীভগবান্। তুমি রাজ্যলাভ বাসনায় যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও তবে অবশ্যই তজ্জনিত কর্ম্মফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু একটি পথ আছে, যদি তুমি যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে পার অর্থাৎ ফলকামনা বর্জ্জন করিয়া, লাভালাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া, কেবল কর্ত্তব্যবোধে যুদ্ধ করিতে পার, তবে সেজন্য পাপভাগী হইবে না। এই সমত্বই যোগ ('সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে—২।৪৮')। এই সাম্যবুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। তুমি পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরকাদির কথা বলিতেছ, এ সকল কাম্য কর্ম্মের ফল। পুণ্যের ফলে স্বর্গ, পাপের ফলে নরক, এ সব কথা কাম্যকর্ম্মাত্মক বেদে এবং স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে আছে। কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মী স্বর্গাদির আশায় বা নরকাদির ভয়ে কোন

গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ

কর্ম্ম করেন না। তিনি পাপপুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া পরমপদ লাভ করেন। ('বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে' ২।৫০)। ফলত্যাগী নিষ্কামকর্ম্মীর কর্ম্ম-বন্ধন নাই। কাম্য কর্ম্মের নানাবিধ ফলকথা শ্রবণে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন পরমেশ্বরে সমাহিত হইবে, তখন তোমার বিষয়ে আসক্তি বিদূরিত হইবে, তোমার প্রজ্ঞা স্থির হইবে, তুমি যোগে সিদ্ধ হইবে (২।৫১-৫৩)। যিনি সংযতেন্দ্রিয়, বিষয়-বাসনা, আত্মাভিমান ও মমত্ববুদ্ধি বর্জ্জন পূর্ব্বক ঈশ্বর-চিন্তায় একনিষ্ঠ, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। তুমি স্থিতপ্রজ্ঞ হও। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে আবদ্ধ হন না। এই অবস্থার নামই ব্রাহ্মীস্থিতি, সর্ব্বকামনাত্যাগেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মোক্ষ (২।৫৫-৭২)।

অর্জ্জুন। তুমি স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে বল, সাম্যবুদ্ধি লাভ করিতে বল, ব্রাহ্মীস্থিতির কথা বল ; এ সকলই তো জ্ঞানের কথা। উহাতেই যদি মোক্ষ হয়, তবে জ্ঞানের সাধন দ্বারা তাহা লাভ করিলেই তো হয়, উহাই তো জীবনের লক্ষ্য। তবে আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত কর কেন? আর সে কর্ম্মটিও যে-সে কর্ম্ম নয়, নিদারুণ যুদ্ধকর্ম্ম। একবার বল—'লাভ কর ব্রাহ্মীস্থিতি স্থির কর মন', আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছ, 'রণাঙ্গনে ধর প্রহরণ'। জ্ঞানবাদিগণ তো মোক্ষার্থ কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দেন, তুমি উপদেশ দাও জ্ঞানের, কিন্তু প্রেরণা দিতেছ কর্ম্মের। তোমার কথাগুলি যেন বড় এলো-মেলো বোধ হইতেছে ('ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে')। যাহা দ্বারা আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি সেই একটি পথ আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। (৩।১-২)

শ্রীভগবান্। মোক্ষলাভের দুইটি পথ আছে—যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের পরই সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পরমহংস পরিব্রাজক প্রভৃতির জন্য জ্ঞানযোগ, এবং কর্ম্মীদিগের জন্য কর্ম্মযোগ। আমি তোমাকে কর্ম্মযোগমার্গ অবলম্বন করিতে বলিতেছি, এই যোগমার্গের ভিত্তি সাম্যবুদ্ধি বা কামনাত্যাগ। এই জন্যই সাম্যবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিয়াছি। তোমাকে কর্ম্মোপদেশ দিতেছি, কেননা প্রকৃতির গুণে বাধ্য হইয়া সকলকেই কর্ম্ম করিতে হয়, দেহধারী জীব একেবারে কর্ম্মত্যাগ করিতেই পারে না। কর্ম্ম যদি করিতেই হয় তবে এমন ভাবে কর্ম্ম কর যেন উহা বন্ধনের কারণ না হইয়া মোক্ষের কারণ হয়। মোক্ষের জন্য চাই অহঙ্কার ও ফলাসক্তি ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ প্রয়োজন করে না। যিনি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগের আরম্ভ করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ—(৩।৭)। অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক, যেমন মিষ্ট দ্রব্যের প্রতি জিহ্বার অনুরাগ, তিক্তদ্রব্যে দ্বেষ। এই রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না। এইরূপ নির্লিপ্ত ভাবে বিষয়ভোগ করিবে, বিষয়কর্ম্মও করিবে।

কর্ম্মযোগও মোক্ষপ্রদ

অর্জ্জুন। তুমি বলিতেছ, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী (৩।৩৪), উহার অধীন হইও না। বুঝিলাম, ভাল কথা। কিন্তু ইচ্ছা না থাকিলেও কে যেন বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত করায় ('অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ'), ধর্ম্মচ্যুত করায়, পাপে প্রবৃত্ত করায়। কাহার প্রেরণায় এইরূপ হয়?

শ্রীভগবান্। ইহাই কাম, কামনা, বিষয়-বাসনা। প্রকৃতির রজোগুণ হইতে ইহার উদ্ভব। ইহা দুষ্পূরণীয়, ইহা মহাশন, অতি অধিক আহার করিয়াও অতৃপ্ত, ইহার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, ইহা অতিশয় উগ্র। ইহাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিবে। 'মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্'-৩।৩৭)।

অর্জ্জুন। এই দুর্জ্জয় শত্রুকে কিরূপে জয় করা যায়?

শ্রীভগবান্। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—এই তিনটি ইহার আশ্রয় বা অধিষ্ঠানভূমি। কাম, মনকে আশ্রয় করিয়া নানাবিধ সুখের কল্পনা করে, বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চয় করে, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে আশ্রয় করিয়া রূপরসাদি বিষয় ভোগ করে। এইরূপে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে পুরুষকে বিষয়ে লিপ্ত করিয়া মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

কামদমনের উপায়—
(১) আত্মসংস্থ যোগে

সুতরাং কামের আশ্রয়স্বরূপ ইন্দ্রিয়াদিকে প্রথমে সংযত করা প্রয়োজন। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ বিষয়োপভোগে বিরত থাকিলেও বিষয়-বাসনা বিদূরিত হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিরও ঊর্দ্ধে যে স্বতন্ত্র আত্মা সেই পরমাত্মা বিষয়ে সচেতন হইলেই বিষয়-বাসনা বিদূরিত হইতে পারে। অতএব তুমি চিত্তকে আত্মসংস্থ কর, তবেই কামজয় হইবে (গীঃ ২।৪০-৪৩। এ সকল শ্লোকে 'কাম' বলিতে সাধারণ অর্থে সর্ব্ববিধ কামনা-বাসনা বুঝায়, কেবল সঙ্কীর্ণার্থক রিপুবিশেষ বুঝায় না)।

কামদমনের উপায়
(২) ভক্তিযোগে

যিনি আমার অনন্যভক্ত, তিনি ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া অবস্থান করেন ('যুক্ত আসীত মৎপরঃ' ২।৩১)। তাদৃশ সমাহিত ব্যক্তিরই বিষয়ানুরাগ দূরীভূত হয়, চিত্ত নির্ম্মল হয়, ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়া আইসে। অনন্যভক্তিযোগে আমাতে চিত্ত স্থির করিতে পারিলেই, আমাতে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়-বিষয়ে রাগদ্বেষ লোপ পায়, কামনা-বাসনা দূর হয় (গীঃ ৬।৬১, ৯।৩০।৩১।৩৪, ১০।১৩।১১, ১৪।২৬, ১৮।৬২।৬৫)।

অর্জ্জুন। তুমি চিত্তকে আত্মসংস্থ করিতে বলিতেছ, ইহা তো জ্ঞানযোগের কথা, আবার তোমাতেও চিত্ত নিত্যযুক্ত রাখিতে বলিতেছ। আচ্ছা, সতত ত্বদ্গতচিত্ত হইয়া যে সকল ভক্ত তোমার উপাসনা করেন, আর যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক কে? (গীঃ ১২।১)।

ব্যক্ত উপাসনা ও অব্যক্ত উপাসনা

শ্রীভগবান্। যাঁহারা আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাধক ('তে মে যুক্ততমা মতাঃ'—গীঃ ১২।২)।

যাঁহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত ও সর্ব্বভূতের হিতপরায়ণ হইয়া অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন। কিন্তু দেহাভিমানী জীবের পক্ষে অব্যক্তের উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করা অধিকতর ক্লেশকর। ('অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে'-১২।৫)।

ভক্তিমার্গে ব্যক্ত উপাসনা সহজসাধ্য

কিন্তু যাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পিত করিয়া, একমাত্র আমাতেই চিত্ত একাগ্র করিয়া ও ধ্যাননিরত হইয়া আমার উপাসনা করেন, আমার সেই ভক্তগণকে আমি অচিরাৎ সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ('তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ভবামি ন চিরাৎ পার্থ')। তুমি আমাতেই মন স্থাপন কর ('ময্যেব মন আধৎস্ব'), আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর ('ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়'), তাহা হইলে অন্তিমে আমাতেই স্থিতি করিবে, সন্দেহ নাই ('নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ'—গীঃ ১২।৬-৮) অব্যক্তের উপাসনা দুঃসাধ্য, ব্যক্ত উপাসনাই সুখসাধ্য, অতএব তুমি আমার ব্যক্ত স্বরূপেই চিত্ত স্থির কর।

অর্জ্জুন। কিন্তু চিত্ত স্থির করাও তো সহজ নহে, কৃষ্ণ; মন বায়ুর ন্যায় চঞ্চল, উহাকে নিশ্চল করিয়া এক বিষয়ে স্থির রাখা দুঃসাধ্য বোধ হয় ('চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ···তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং'—৬।৩৪)।

বিবিধ পথ (১) অভ্যাসযোগে ভগবৎ-স্মরণ

শ্রীভগবান্। যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার—তবে অভ্যাসযোগদ্বারা চিত্তকে আমাতে সমাহিত করিতে চেষ্টা কর। বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ অন্য বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক আমার স্মরণরূপ যে যোগ তাহাই অভ্যাস যোগ ('অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়'—১২।৯)।

অর্জ্জুন। ইহাতেও যে সমর্থ হইব এরূপ মনে করি না। ইহাতে অসমর্থ হইলে কি করিব?

শ্রীভগবান্। যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও ('অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব'—১২।১০); আমার জন্য, আমার প্রীতিসাধনার্থ, সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও তুমি সিদ্ধিলাভ করিবে ('মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি')। মনের স্বাভাবিক বহির্ম্মুখী গতির জন্য উহাকে আমাতে স্থির রাখা যদি কঠিন বোধ কর, তাহা হইলে সহজ পথ এই—তোমার কর্ম্মগুলির গতি আমার

দিকে ফিরাইয়া দাও। সকল কর্ম্মই আমাকে স্মরণ করিয়া আমার উদ্দেশ্যে আমার প্রীতির জন্যই সম্পন্ন করিবে। এই ভাবটি লইয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে পাপকর্ম্মই বা কিরূপে হইবে আর পাপ বাসনাই বা কিরূপে আসিবে? এইরূপে, কর্ম্মদ্বারাই তুমি আমার সহিত যুক্ত থাকিতে পারিবে, তোমার সমস্ত জীবনই হইবে আমার অনুস্মরণ, আমার প্রীত্যর্থ কর্ম্ম-সম্পাদন। আমার পূজার্চ্চনা, স্তুতি-বন্দনা আদি যেমন আমার প্রীত্যর্থ কর্ম্ম, তেমনি সর্ব্বভূতে দয়া, সর্ব্বভূতের সেবা—এ সকলও আমার প্রীত্যর্থ কর্ম্ম, আমি তো সর্ব্বভূতময়।

(২) সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে সম্পাদন

অর্জ্জুন। যদি সংসারের কর্ম্মকুহকে পড়িয়া তোমাকে ভুলিয়া যাই, তুমিই যে সর্ব্বকর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য, সর্ব্বাবস্থায় একথা মনে না থাকে, তবে কি করিব? জীবনে কত রকম কর্ম্মই তো করিতে হয়। যদি এই ভাবে কর্ম্ম করিতে না পারি?

শ্রীভগবান্। যদি ইহাতেও অশক্ত হও, তবে যে কোন কর্ম্ম কর, তাহা আমাতে অর্পণ করিবে; কেবল পূজার্চ্চনাদি কর্ম্ম নয়, আহার-বিহারাদি লৌকিক কর্ম্মও আমাতে অর্পিত করিবে ('যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ…তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্'—গীঃ ৯।১৭)। 'আমি আহার-পানাদি, সংসার কর্ম্ম করি, দান-তপস্যাও করি, যাহা কিছু করি, তুমিই করাও, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমি কিছু জানিনা, চাহিনা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্রমাত্র',—এই ভাবটি গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে পারিলেই কর্ম্ম আমাতে অর্পিত হয়। ইহাই কর্ম্মার্পণ যোগ, এই যোগ আশ্রয় করিয়া সংযতচিত্ত হইয়া কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিবে। ('সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্'—গীঃ ১২।১১)।

(৩) সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানে অর্পণ ও কর্ম্মফল-ত্যাগ

সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, আমা হইতেই জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি, কর্ম্ম সকলকেই করিতে হইবে। সুতরাং কর্ত্তব্যবোধে যাহা করিতে হয় করিয়া যাও, কিন্তু কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে তোমার অধিকার নাই। আর ফলাকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া কর্ম্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয় (গীঃ ২।৩৭, ১৫-পৃঃ দ্রঃ)। অভ্যাসযোগ, জ্ঞান, ধ্যান এ সকল অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগই শ্রেষ্ঠ সাধনা, ত্যাগেই পরম শান্তি, ত্যাগেই সিদ্ধি। ফলকামনা ত্যাগ দ্বারা সমত্ববুদ্ধি ও শান্তি লাভ করিলে আমার ভক্তগণের যেরূপ উন্নত অবস্থা হয় তাহা শুন, ঈদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়।

কর্ম্মফল ত্যাগই শ্রেষ্ঠ সাধনা

—'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ॥
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥'—গীঃ ১২।১৩-২০

ত্যাগী ভক্তের লক্ষণ

—'যাঁহার কাহারও প্রতি কোন দ্বেষের ভাব নাই, যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ও দয়াবান্, যিনি মমত্ববুদ্ধিশূন্য অর্থাৎ যাঁহার 'আমার' 'আমার' জ্ঞান নাই, যিনি অহঙ্কারশূন্য, যাঁহার সুখদুঃখ সমান জ্ঞান, যিনি সদা সন্তুষ্ট, ক্ষমাশীল, সমাহিতচিত্ত, সংযতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়, যাঁহার মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পিত, এমন যে আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়।

যাহা হইতে কেহ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যাঁহাকে কেহ উদ্বিগ্ন করিতে পারে না, যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনি আমার প্রিয়।

যাঁহার কোন-কিছুরই অপেক্ষা নাই (ইহা না হইলে আমার চলিবে না এইরূপ জ্ঞান যাঁহার নাই), যিনি শৌচসম্পন্ন, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনলস, পক্ষপাতশূন্য, যাহাকে কিছুতেই মনঃপীড়া দিতে পারে না এবং ফলকামনা করিয়া যিনি কোন কর্ম্ম আরম্ভ করেন না, এমন যে আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয়।

যিনি কোন কিছু লাভে হৃষ্ট হন না, অথচ কিছুতে দ্বেষ নাই, যিনি কোন-কিছু না পাওয়ায় দুঃখ করেন না, কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না, যিনি শুভ কি অশুভ কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, এমন যে ভক্তিমান্ তিনি আমার প্রিয়।

যাঁহার শত্রু-মিত্রে, মান-অপমানে, শীত-উষ্ণ, সুখদুঃখে সমান জ্ঞান, যিনি সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিবর্জ্জিত, স্তুতি ও নিন্দাতে যাঁহার তুল্যজ্ঞান, যিনি সংযতবাক্, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, যিনি গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধিবর্জ্জিত এবং স্থিরচিত্ত, এমন যে আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়।

এই যে ধর্ম্মামৃত বলা হইল, যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া যথাযথ ইহা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা আমার অতীব প্রিয়।'

শ্রীকৃষ্ণ-কথিত এই ভক্তিবাদ ও 'ধর্ম্মামৃত' আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'এখন বুঝিলে ভক্তি কি? হা ঈশ্বর! ভো ঈশ্বর! করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত ভক্তির স্থূলকথা এই। এরূপ উদার এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথায়ও নাই। এইজন্য ভগবদ্গীতা জগতে শ্রেষ্ঠগ্রন্থ।'

প্রঃ। এই 'ধর্ম্মামৃত' অনুষ্ঠান করাও তো সহজ কথা নহে। শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয় ভক্তের যে সকল লক্ষণ বলিলেন তাহা সম্যগ্রূপে লাভ করা দূরের কথা, উহার নিকটবর্ত্তী হওয়াও তো সহজ নহে। সাধারণ জীবের উপায় কি? ভক্তিমার্গকে সহজ পথ বলাও তো নিরর্থক বোধ হয়।

উঃ। সহজ এইজন্য যে ভক্তি হইতেই ভক্তি হয়। ভক্তি সাধন ও সাধ্য উভয়ই। গৌণী ভক্তি বা সাধনভক্তির অনুশীলন-দ্বারাই শেষে মুখ্যাভক্তি বা নিষ্কামা ভক্তি লাভ হয়। শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুশীলন তত কঠিন নহে। ভক্তবৎসল দয়াময় শ্রীভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া সাধন-ভক্তির অভ্যাস করিতে করিতে তাঁহার কৃপাতেই কামনা-বাসনা দূর হইতে থাকে, শেষে নিষ্কামা ভক্তি লাভ হয়, উহাই সাধ্যবস্তু। কিন্তু প্রথম হইতেই, আত্মচেষ্টায় ত্যাগের পথে অগ্রসর হইলে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হয়, পদস্খলনেরও আশঙ্কা আছে। পূর্ব্বে শ্রীগীতোক্ত উত্তমা ভক্তির যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, উহা নিষ্কামতার ফল। নিষ্কাম ভক্তই আদর্শ ভক্ত। পুরাণাদিতে ভক্ত-চরিত বর্ণনায় এই আদর্শই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল আদর্শ ভক্ত-চরিতের মধ্যে প্রহ্লাদ-চরিত্রই শীর্ষস্থানীয়। বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীভাগবতে এই পুণ্যচরিত-কথা অতি বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, মহাত্মা প্রহ্লাদই সমস্ত সাধুজনের উদাহরণস্থলীয় ('উপমানমশেষাণাং সাধূনাং যঃ সদা ভবেৎ'—বিঃ পুঃ ১।১৫।১৫৬)। শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান প্রহ্লাদকে বলিতেছেন—তুমি আমার ভাবে বিভোর হইয়া কামনাশূন্য হইয়াছ ('মদ্ভাববিগতস্পৃহঃ'), তোমাকে যাহারা অনুসরণ করে তাহারাই আমার ভক্ত হয়, তুমিই আমার সমস্ত ভক্তগণের আদর্শস্থানীয় ('ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্'—ভাঃ ৭।১০।২১)।

বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মতত্ত্বে' প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীগীতায় ভগবানের প্রিয় ভক্তের যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে ('অদ্বেষ্টাসর্ব্বভূতানাং' ইত্যাদি ২৩১ পৃঃ), বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ-চরিত্র বর্ণনায় তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। প্রধানতঃ তদবলম্বনে আমরা প্রহ্লাদ-চরিত্রের আলোচনা করিতেছি (বিঃ পুঃ ১।১৭শ-২০শ অঃ দ্রঃ)। তিনি লিখিয়াছেন—

কেবল কথায় গুণানুবাদ করিলে কিছু হয় না, কার্য্যতঃ দেখাইতে হয়। প্রহ্লাদের কার্য্য কি ? প্রহ্লাদের প্রথম কার্য্য দেখি, তিনি সত্যবাদী, সত্যে দৃঢ়নিশ্চয়। সত্যে তাঁহার একটা দার্ঢ্য যে কোন প্রকার ভয়ে ভীত হইয়া তিনি সত্য পরিত্যাগ করেন না। গুরুগৃহ হইতে তিনি পিতৃসমীপে আনীত হইলে হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি শিখিয়াছ ? তাহার সার বল দেখি।"

প্রহ্লাদ বলিলেন—যাহা শিখিয়াছি তাহার সার কথা যাহা আমার হৃদয়ে অবস্থিত আছে ('যন্মে চেতস্যবস্থিতম্'), তাহা এই—

'অনাদিমধ্যান্তমজমবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি মহাত্মানং সর্ব্বকারণকারণম্॥'

—'যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, যাঁহার জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই, যিনি অচ্যুত, সর্ব্ব কারণের কারণ, সেই মহাত্মাকে নমস্কার।'

ইহা শুনিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া হিরণ্যকশিপু আরক্তলোচনে স্ফুরিতাধরে প্রহ্লাদের গুরুকে কহিলেন—এ কি হে! দুর্ম্মতি, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া শিষ্যকে এই অসার বিষয় শিক্ষা দিয়াছ,—যাহাতে আমার বিপক্ষের স্তুতি ('বিপক্ষস্তুতিসংহিতং অসারং গ্রাহিতো বালো মামবজ্ঞায় দুর্ম্মতে')। গুরু বলিলেন, 'আমার দোষ নাই, আমি এ সব শিখাই নাই।' তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কে শিখাইল রে ?"

প্রহ্লাদ বলিলেন,—"যে বিষ্ণু অনন্ত জগতের শাস্তা, যিনি আমার হৃদয়ে অবস্থিত, হে পিতঃ, সেই পরমাত্মা ভিন্ন আর কে শিখায় ?"

হিরণ্যকশিপু বলিলেন,—জগতের ঈশ্বর আমি, বিষ্ণু কে রে ! দুর্বুদ্ধি ?

প্রহ্লাদ বলিলেন—

'ন শব্দগোচরে যস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্।
যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ॥'

—যাঁহার পরমপদ শব্দে ব্যক্ত করা যায় না, যাঁহার পরমপদ যোগীরা ধ্যান করেন, যাঁহা হইতে বিশ্ব এবং যিনিই বিশ্ব, সেই বিষ্ণু পরমেশ্বর।

হিরণ্যকশিপু অতিশয় ক্রোধভরে তর্জ্জন করিয়া বলিলেন—মরিবার ইচ্ছা করিয়াছিস্ যে পুনঃ পুনঃ ঐ কথা বলিতেছিস্ ? মূর্খ ! পরমেশ্বর কে জানিস্ না ? আমি থাকিতে আবার তোর পরমেশ্বর কে ? ('পরমেশ্বরসংজ্ঞোঽজ্ঞ কিমন্যো ময্যবস্থিতে')।

নির্ভীক প্রহ্লাদ বলিলেন—"পিতঃ, তিনি কি কেবল আমারই পরমেশ্বর? সকল জীবেরও তিনিই পরমেশ্বর, তিনি আপনারও ধাতা, বিধাতা, পরমেশ্বর; রাগ করেন কেন? প্রসন্ন হউন।"—

'ন কেবলং তাত মম প্রজানাং স ব্রহ্মভূতো ভবতশ্চ বিষ্ণুঃ।
ধাতা বিধাতা পরমেশ্বরশ্চ প্রসীদ কোপং কুরুষে কিমর্থম্॥'

হিরণ্যকশিপু বলিলেন—"বোধ হয় কোন পাপাশয় এই বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাই এ আবিষ্টের ন্যায় কথা বলিতেছে।"

প্রহ্লাদ বলিলেন—"কেবল আমার হৃদয়ে কেন, তিনি সর্ব্বলোকেই অধিষ্ঠান করিতেছেন। সেই সর্ব্বস্বামী বিষ্ণু আমাকে, আপনাকে, সকলকে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন।"

হিরণ্যকশিপু 'দূর হ!' বলিয়া প্রহ্লাদকে তাড়াইয়া দিলেন, আদেশ দিলেন—গুরুগৃহে ইহার উপযুক্ত শাসন হউক।

প্রহ্লাদ আবার গুরুগৃহে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে তাঁহাকে আবার আনাইয়া হিরণ্যকশিপু তাঁহার অধীত বিদ্যার পরীক্ষার্থ বলিলেন—একটা গাথা পাঠ কর তো শুনি।

প্রহ্লাদের সেই একই কথা। তিনি শ্লোক পড়িলেন—

'যতঃ প্রধানপুরুষৌ যতশ্চৈতৎ চরাচরম্।
কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু॥'

—'যাঁহা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ, যাঁহা হইতে এই চরাচর, সমস্ত জগতের কারণ সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন'।

হিরণ্যকশিপু বলিলেন—দুরাত্মাকে বধ কর, বধ কর, ইহার জীবিত থাকায় ফল নাই, এ স্বপক্ষের অনিষ্টকারী, বিপক্ষের স্তুতিকারী, এ কুলাঙ্গার হইয়াছে ('স্বপক্ষহানিকর্ত্তৃত্বাৎ যঃ কুলাঙ্গারতাং গতঃ')। তখন শত শত দৈত্য অস্ত্র লইয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। প্রহ্লাদ স্থির, ধীর, তিনি তাহাদিগকে শান্তভাবে বলিলেন—বিষ্ণু যেমন আমাতে আছেন, তেমনি তোমাদের অস্ত্রেও আছেন, এই সত্যানুসারে তোমাদের অস্ত্রে আমার অনিষ্ট হইবে না ('বিষ্ণুঃ শস্ত্রেষু যুষ্মাকং ময়ি চাসৌ যথা স্থিতঃ। দৈতেয়াস্তেন সত্যেন মা-ক্রামন্ত্বায়ুধানি মে')।

প্রহ্লাদ
'যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়'

এখন স্মরণ করুন সেই ভগবদ্বাক্য—"যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ"। 'দৃঢ়নিশ্চয়' কাহাকে বলে, বুঝা গেল।

অস্ত্রেও প্রহ্লাদ মরিল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে বলিলেন—ওরে দুর্ব্বুদ্ধি, আবার বলি, শত্রুর স্তুতিবাদ হইতে নিবৃত্ত হ, অতিমূঢ়তা ত্যাগ কর্, আমি এখনও তোকে অভয় দিতেছি ('অভয়ং তে প্রযচ্ছামি মাতিমূঢ়মতির্ভব')।

অভয়ের কথা শুনিয়া প্রহ্লাদ বলিলেন—

'ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরান্তকাদিভয়ানি সর্ব্বাণ্যপযান্তি তাত॥'

—'যিনি সকল ভয়ের অপহারী, যাঁহার স্মরণে জন্ম, জরা, যম প্রভৃতি সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কিসের ?'

এখন বুঝা গেল, ভক্ত "ভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ' (২৩২ পৃঃ) কেন। অতঃপর হিরণ্যকশিপুর আদেশে বিষধর সর্পগণ প্রহ্লাদকে দংশন করিতে লাগিল। তখন প্রহ্লাদের কি অবস্থা ?

প্রহ্লাদ 'ভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ'

'স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দশ্যমানো মহোরগৈঃ।
ন বিবেদাত্মনো গাত্রং তৎস্মৃত্যাহ্লাদসংস্থিতঃ॥'

—'কিন্তু তাঁহার মন কৃষ্ণে এমন আসক্ত ছিল যে কৃষ্ণস্মৃতিজনিত পরমাহ্লাদে সর্পদংশন জনিত ব্যথা তিনি কিছুই জানিতেই পারিলেন না।'

প্রহ্লাদ 'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ'; 'উদাসীনো গতব্যথঃ'

তারপর হিরণ্যকশিপু মত্ত হস্তীদিগকে আদেশ দিলেন—'ইহাকে দন্তাঘাতে হনন কর।' হস্তীদিগের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, প্রহ্লাদের কিছু হইল না। তখন প্রহ্লাদ পিতাকে বলিলেন—

'দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাপবিনাশনোঽয়ং জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥'

—'কুলিশাগ্রকঠিন গজদন্ত যে ভাঙ্গিয়া গেল ইহা আমার বল নহে। যিনি মহাবিপদ ও পাপের বিনাশন, তাঁহার স্মরণে হইয়াছে।'

প্রহ্লাদ—'নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ'

স্মরণ করুন, ভগবদ্ভক্ত 'নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ'। তিনি জানেন সকল শক্তিই ঈশ্বরের ; 'আমার' শক্তি, 'আমি' শক্তিমান্—এই মিথ্যাজ্ঞান তাঁহার নাই।

প্রহ্লাদ 'শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ'

হস্তী হইতেও কিছু হইল না দেখিয়া আদেশ হইল—'অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া এই পাপকারীকে দগ্ধ কর'। কিন্তু আগুনেও প্রহ্লাদের কিছু হইল না।

তখন দৈত্য-পুরোহিত ভার্গবেরা দৈত্য-পতিকে বলিলেন—'আপনি ইহাকে ক্ষমা করিয়া আমাদের জিম্মা করিয়া দিন, আমরা ইহাকে পুনরায় শাসন করিয়া

দেখি, তাহাতেও যদি এ বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ না করে, তবে আমরা অভিচারের দ্বারা ইহাকে বিনাশ করিব। আমাদের কৃত অভিচার কখনও ব্যর্থ হয় না।'

দৈত্যপতি ইহাতে সম্মত হইলে ভার্গবেরা প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া আবার পড়াইতে লাগিলেন। প্রহ্লাদও সেখানে একটি ক্লাস খুলিয়া বসিলেন। তিনি দৈত্য বালকগণকে বিষ্ণুভক্তিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশের সার কথা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

দৈত্যবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ

—বালকগণ, পরমার্থ শ্রবণ কর। জীবসকল জন্ম, বাল্য ও যৌবন প্রাপ্ত হয়, ক্রমে জরাগ্রস্ত হয়, এবং শেষে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ইহা আমাদের এবং তোমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে ('প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে চৈতদস্মাকং ভবতাং তথা')। মৃতের পুনর্জ্জন্ম হয়, ইহারও অন্যথা নাই ('মৃতস্য চ পুনর্জ্জন্ম ভবত্যেতচ্চ নান্যথা')। জীবের জন্মকালেও মহাদুঃখ, মৃত্যুকালেও মহাদুঃখ ('জন্মন্যত্র মহদ্ দুঃখং ম্রিয়মাণস্য চাপি তৎ'), জন্মে গর্ভবাসাদি দুঃখ, মৃত্যুকালে যমযাতনায় দুঃখ ('যাতনাসু যমস্যোগ্রং গর্ভসংক্রমণেষু চ')। জীবিতকালেও শোকদুঃখাদি আছে। লোকে যে পরিমাণে মনের প্রিয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করে, সেই বস্তুর অভাব হইলে তাহার হৃদয় সেই পরিমাণে শোকাকুল হয়। কেহ বিদেশে থাকিলেও তাহার গৃহস্থিত ধনজনাদির চিন্তা দূর হয় না। সে সকল ধনাদির নাশ হইতে পারে, ঘটনাক্রমে হয়ও। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে মনঃস্থিত ধনাদির নাশ হয় না অর্থাৎ সে ব্যক্তি তন্নাশ জন্য শোক অনুভব করিতে থাকে। সুতরাং কোন বস্তুতে অনুরাগ করা উচিত নহে। দেখিতেছ সংসার দুঃখময়। এই দুঃখময় ভবার্ণবে একমাত্র বিষ্ণুই তোমাদের পারকর্ত্তা, ইহা আমি সত্য বলিতেছি ('ভবতাং কথ্যতে সত্যং বিষ্ণুরেকঃ পরায়ণম্')। আমরা সকলেই বালক, তাই তোমরা জান না যে এই দেহের মধ্যে যে দেহী (আত্মা) আছেন তাহার বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধত্ব নাই, এ সকল দেহের ধর্ম্ম ('মা জানীত বয়ং বালা···বাল্যযৌবনবৃদ্ধাদ্যৈর্দেহী ভাবৈরসংযুতঃ')। অতএব বাল্যকালেই সদা শ্রেয়োলাভে যত্ন করা উচিত ('তস্মাৎ বাল্যে বিবেকাত্মা যততে শ্রেয়সে সদা')। আমি যে সকল কথা বলিলাম যদি তাহা মিথ্যা মনে না কর, তবে সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ কর। তাঁহার স্মরণে আয়াস কি? স্মরণ করিলেই শুভফল প্রদান করেন ('আয়াসঃ স্মরণে কোঽস্য স্মৃতো যচ্ছতি শোভনম্')। সর্ব্বভূতস্থিত বিষ্ণুতে তোমাদের মতি হউক আর তাঁহার অধিষ্ঠান প্রাণিসমূহে তোমাদের মৈত্রী হউক ('সর্ব্বভূতস্থিতে তস্মিন্ মতির্মৈত্রী দিবানিশং')।

উপদেশের সারকথা—ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বভূতে প্রীতি

অন্যের ধনৈশ্বর্য্যাদি হইতেছে, আমি হীনশক্তি, ইহা দেখিয়াও আহ্লাদ করিও, দ্বেষ করিও না, কেননা দ্বেষে অনিষ্টই হইয়া থাকে ('মুদং তথাপি কুর্ব্বীত হানির্দ্বেষফলং যতঃ')। যাহাদের সঙ্গে শত্রুতাবদ্ধ হইয়াছে তাহাদের যে দ্বেষ করে ('বদ্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্ব্বন্তি চেৎ ততঃ'), সে অতি মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে জানিয়া জ্ঞানীরা দুঃখ করেন ('শোচ্যান্যহোঽতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণঃ')। সংক্ষেপে সারকথাটি বলিতেছি শুন ('সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মম')—

এই বিশ্বজগৎ সর্ব্বভূতময় বিষ্ণুরই বিস্তার, সকলই বিষ্ণুময় ('বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ'), বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য অভেদ দৃষ্টিতে সকলকে আত্মবৎ দেখিবেন ('দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ')। অতএব তোমরা এবং আমরা আসুরভাব ত্যাগ করিয়া ('সমুৎসৃজ্যাসুরং ভাবং তস্মাদ্ যূয়ং তথা বয়ং'), এরূপ যত্ন করিব যাহাতে মুক্তিপ্রাপ্ত হই ('তথা যত্নং করিষ্যামো যথা প্রাপ্স্যামো নির্বৃত্তিম্')। হে দৈত্যগণ, তোমরা সর্ব্বত্র সমান দেখিও ('সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত'), এই সমদর্শনই অচ্যুতের আরাধনা ('**সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য**)'।—বিঃ পুঃ ১।৭ম অঃ।

সর্ব্বভূতে সমদর্শনই ঈশ্বরের আরাধনা

অচ্যুতকে প্রীত করা বহু প্রয়াসের কর্ম্ম নহে, ('নহ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ'), কারণ তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা এবং সর্ব্বত্রই অবস্থিত আছেন ('আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ')। অতএব সর্ব্বভূতে দয়া ও মৈত্রী কর ('তস্মাৎ সর্ব্বেষুভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদং'), উহাতেই ভগবান্ তুষ্ট হন ('যয়াতুষ্যত্যধোক্ষজঃ'), সেই অনন্ত তুষ্ট হইলে আর কি অলভ্য থাকে ('তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্তে')? আমি দেবদর্শন নারদের নিকট এই শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি'—ভাঃ ৭।৬ষ্ঠ অঃ।

ভক্তোত্তম প্রহ্লাদোক্ত এই ধর্ম্মোপদেশে গীতোক্ত 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্ মৈত্রঃ করুণ এব চ', 'সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ' 'যস্মান্নোদ্বিজতে লোকা' ইত্যাদি (২৩১ পৃঃ) ভক্তলক্ষণ-বর্ণনাই পাইতেছি। প্রহ্লাদ কেবল উপদেশে নয়, কার্য্যতঃ আচরণেও এই সকল গুণাবলী প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাই আমরা আলোচনা করিতেছি।

বিষ্ণুভক্তি ত্যাগ করা দূরের কথা, প্রহ্লাদ অন্যান্য দৈত্যবালকগণকে বিষ্ণুভক্ত করিয়া তুলিতেছেন, দৈত্যপতি ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে বিষপান করাইতে আদেশ দিলেন। প্রহ্লাদ শ্রীবিষ্ণু নামোচ্চারণে বিষান্ন নির্বীর্য্য করিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ('অনন্তখ্যাতিনির্বীর্য্যং জরয়ামাস তদ্বিষং')।

তৎপর হিরণ্যকশিপু পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া অভিচার ক্রিয়া দ্বারা প্রহ্লাদকে সংহার করিতে আদেশ দিলেন। পুরোহিতগণ প্রহ্লাদকে একটু বুঝাইলেন,

বলিলেন—'তোমার পিতা ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর, তোমার অনন্তে কি প্রয়োজন, অনন্তে কি হয়? তুমি বিপক্ষস্তুতি ত্যাগ কর।' প্রহ্লাদ বিনয়বশে কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, শেষে হাসিয়া বলিলেন—'অনন্তে কি হয়'! গুরুগণ বলিতেছেন, 'অনন্তে কি হয়?' যদি অসন্তুষ্ট না হন তবে শুনুন, অনন্তে কি হয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটিকে পুরুষার্থ বলে, যাহা হইতে এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ লাভ হয়, তাহা হইতে কি হয়, এ কি বৃথা কথা বলিতেছেন?'

প্রহ্লাদ 'স্থিরমতি'

—'ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।
চতুষ্টয়মিদং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং কিমিদং বৃথা॥'।

তৎপর পুরোহিতেরা ভয়ানক অভিচার-ক্রিয়ার সৃষ্টি করিলেন। ভয়ঙ্করী অগ্নিময়ী কৃত্যা প্রহ্লাদের বুকে শেলাঘাত করিল। শেল তাঁহার বুকে ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই কৃত্যা, নিরপরাধ প্রহ্লাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া, পুরোহিতদিগকে ধ্বংস করিতে গেল। তখন প্রহ্লাদ, হে কৃষ্ণ, হে অনন্ত, ইহাদিগকে রক্ষা কর বলিয়া সেই দহ্যমান পুরোহিতদিগকে রক্ষা করিতে ধাবমান হইলেন ('ত্রাহি কৃষ্ণেত্যনন্তেতি বদন্নভ্যবপদ্যত')।

ডাকিলেন—হে সর্ব্বব্যাপিন্, হে জগৎস্বরূপ, হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, হে জনার্দ্দন, এই ব্রাহ্মণদিগকে এই দুঃসহ মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা কর। যেমন সকল ভূতে সর্ব্বব্যাপী জগদ্গুরু বিষ্ণু তুমি আছ, তেমনি এই ব্রাহ্মণেরা জীবিত হউক। বিষ্ণু সর্ব্বগত বলিয়া যেমন অগ্নিকে আমি শত্রুপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ব্রাহ্মণেরা তেমনি—ইহারাও জীবিত হউক। যাহারা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, হাতীর দ্বারা আমাকে আহত করিয়াছিল, সর্পের দ্বারা দংশিত করিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, শত্রু মনে করি নাই, আজ সেই সত্যের হেতু এই পুরোহিতেরা জীবিত হউক। ('তথা তেনাদ্য সত্যেন জীবন্ত্বসুরযাজকাঃ')।

'এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্ম অন্য কোন দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার?'—বঙ্কিমচন্দ্র।

এমন অব্যর্থ অভিচারও ব্যর্থ হইল দেখিয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার এমন প্রভাব কোথা হইতে হইল? ইহা কি মন্ত্রাদিজনিত না তোমার স্বাভাবিক। ('এতন্মন্ত্রাদিজনিতমুতাহো সহজং তব')। প্রহ্লাদ বলিলেন—'ইহা মন্ত্রাদিজনিত নহে, আর কেবল আমারই ইহা স্বাভাবিক প্রভাব নহে, অচ্যুত হরি যাহাদের হৃদয়ে বাস করেন তাহাদেরই এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। ('প্রভাব এষ সামান্যো যস্য যস্যাচ্যুতো হৃদি')।

[অচ্যুত হরি তো সকলের হৃদয়েই বাস করেন তবে সকলের এরূপ প্রভাব হয় না কেন ?]

যে ব্যক্তি হরি সকলের হৃদয়ে আছেন জানিয়া অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না, কারণাভাববশতঃ তাহারও অনিষ্ট হয় না ('তস্য পাপাগমস্তাত হেত্বভাবান্নবিদ্যতে')। যে কর্ম্মের দ্বারা, মনে, বাক্যে পরপীড়া করে, তাহার সেই বীজে প্রভূত অশুভ ফল ফলিয়া থাকে।

কেশব আমাতেও আছেন, সর্ব্বভূতেও আছেন, ইহা জানিয়া আমি কাহারও মন্দ ইচ্ছা করি না, কাহাকেও মন্দ বলি না, আমি সকলের শুভ চিন্তা করি, আমার শারীরিক বা মানসিক দৈব বা ভৌতিক অশুভ কেন ঘটিবে ? **হরি সর্ব্বময় জানিয়া সর্ব্বভূতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি করা** পণ্ডিতের কর্ত্তব্য ('এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী। কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্')।

কি নীতির দিক্ হইতে, কি প্রীতির দিক্ হইতে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আর কি আছে ? বলা বাহুল্য, অসুরের চিত্তে এ সমস্ত কথা প্রবেশ করিল না। ইহার পরও প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার নানা প্রচেষ্টা হইল, পরে তাহাকে নীতিশিক্ষার জন্য পুনরায় গুরুগৃহে পাঠান হইল। সেখানে নীতিশিক্ষা সমাপ্ত হইলে আচার্য্য প্রহ্লাদকে দৈত্যেশ্বরের নিকট লইয়া আসিলেন। দৈত্যপতি পুনশ্চ তাঁহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিলেন—

হে প্রহ্লাদ ! মিত্র ও শত্রুর প্রতি নৃপতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন ? মন্ত্রী ও অমাত্যের সঙ্গে, চর, চৌর ও গূঢ় শত্রুদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিবেন, বল—

প্রহ্লাদ পিতৃপদে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, আদি রাজনীতির কথা গুরু শিখাইয়াছেন বটে, আমিও শিখিয়াছি। কিন্তু এ সকল নীতি আমার মনোমত নহে। কিন্তু পিতঃ রাগ করিবেন না ('মা ক্রুধঃ'), আমি তো সেরূপ শত্রুমিত্র দেখি না। যেখানে সাধ্য নাই, সেখানের সাধনের কি প্রয়োজন ? যখন জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ব্বভূতাত্মা, তখন আর শত্রু-মিত্রের কথা কোথা হইতে হইবে, কাহাকেও শত্রু মনে করিব কিরূপে ? ('সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথ জগন্ময়ে। পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ'।) তোমাতে ভগবান্ আছেন, আমাতে আছেন, আর সকলেও আছেন, তখন এই ব্যক্তি মিত্র, এই ব্যক্তি শত্রু, এমন করিয়া পৃথক্ ভাবিব কিরূপে ? সুতরাং এই দুষ্টবিধিবহুল নীতিশাস্ত্রের কি প্রয়োজন ?

প্রহ্লাদ 'সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ'

এই সকল কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন এবং তাহাকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন।

অসুরেরা প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পর্ব্বতচাপা দিল।

প্রহ্লাদ 'যোগী'

প্রহ্লাদ তখন জগদীশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি ধ্যানযোগে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনাকেও বিস্মৃত হইয়াছিলেন ('তন্ময়ত্বমবাপাগ্র্যং বিসস্মার তথাত্মানং')। তখন তাঁহার নাগপাশ খসিয়া গেল, সমুদ্রের জল সরিয়া গেল, পর্ব্বতসকল দূরে বিক্ষেপ করিয়া প্রহ্লাদ গাত্রোত্থান করিলেন। তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে আমি প্রহ্লাদ ('প্রহ্লাদোঽস্মীতি সস্মার')। তিনি পুনরায় পুরুষোত্তমের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবস্তুতিতে আত্মরক্ষার জন্য আবেদন নিবেদন নাই বা মোক্ষমুক্তিরও প্রার্থনা নাই। ইহাতে কেবল ভগবানের নাম ও মহিমা কীর্ত্তন। শেষে শ্রীহরি তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। প্রহ্লাদ 'সন্তুষ্টঃ সততং', জগতে তাঁহার প্রার্থনীয় বস্তু কিছু নাই। তিনি বলিলেন—

প্রহ্লাদ—'ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি'; 'শুভাশুভ-পরিত্যাগী'

—'নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
তামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

—'হে নাথ, যে যে সহস্রযোনিতে আমি পরিভ্রমণ করিব সে সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে। অবিবেকী লোকদিগের বিষয়ের প্রতি যেরূপ অচলা আসক্তি থাকে, উহা যেমন তাহাদের হৃদয় হইতে কিছুতেই দূর হয় না, তোমার অনুস্মরণে তোমার প্রতি আমার প্রীতি যেন সেইরূপ অবিচল থাকে, উহা যেন আমার হৃদয় হইতে কখনও অপসারিত না হয়।'

বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি যে অবিচলিতা আসক্তি তাহারই গতি ফিরাইয়া যদি ঈশ্বরে ন্যস্ত করা যায় তবেই অহৈতুকী ভক্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটির উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন—'ভক্তরাজ প্রহ্লাদ ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বোধ হয়।' নিষ্কাম ভক্ত ভক্তিই প্রার্থনা করেন, তাঁহার অন্য প্রার্থনা নাই। প্রহ্লাদের ভক্তি-প্রার্থনা শুনিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন—'তাহা তোমার আছে এবং থাকিবে। অন্য বর দিব, প্রার্থনা কর।'

প্রহ্লাদ বলিলেন—'আমি তোমার স্তুতি করিয়াছিলাম বলিয়া পিতা দ্বেষ করিয়া আমার প্রতি যে নির্য্যাতন করিয়াছিলেন তাঁহার সেই পাপ ক্ষালিত হউক।'

শ্রীভগবান বলিলেন—'তাহা হইবে, তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।'

প্রহ্লাদ বলিলেন—'প্রভো! তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি হইবে, তুমি এই বর দিয়াছ। উহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আমার আর কিছু প্রার্থনীয় নাই।'

'তুলামানে একদিকে বেদ, নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্র, বাইবেল আদি, আর একদিকে প্রহ্লাদ-চরিত্র রাখিলে প্রহ্লাদ-চরিত্রই গুরু হয়।...আর এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম ধর্ম্মের সার, সুতরাং ইহা সকল বিশুদ্ধ ধর্ম্মেই আছে। যে পরিমাণে যে ধর্ম্ম বিশুদ্ধ, ইহা সেই পরিমাণে সেই ধর্ম্মে আছে।'—বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ ভগবদ্ভক্তের যে লক্ষণসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন সে সকলের দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা প্রহ্লাদ-চরিত্রের আলোচনা করিলাম। এই সকল লক্ষণ জ্ঞানী নিষ্কাম ভক্তের। জ্ঞানী কে? সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন, এই জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই জ্ঞানী। কিন্তু কেবল শাস্ত্র-গুরূপদেশে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিলেই জ্ঞানী হয় না, যিনি সর্ব্বভূতে ভগবৎ-সত্তা প্রত্যক্ষ অনুভব করেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। এই অনুভূতির জন্যই তিনি হন সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও সর্ব্বভূতানুকম্পী। এইরূপ জ্ঞানীই নিষ্কাম ভক্ত, এই অনুভূতি হইতেই ভগবানে পরা ভক্তি জন্মে। ('সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'—গীঃ ১৮।৫৪)। প্রহ্লাদ-চরিত্রে আমরা ইহাই দেখি। তাঁহাতে বৈদান্তিক জ্ঞান—(এ সমস্তই ব্রহ্ম—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম') এবং বৈষ্ণবিক ভক্তির একত্র সমাবেশ। ইহাই গীতোক্ত ভাগবত ধর্ম্ম—ইহাতে জ্ঞান ও ভক্তির সহিত নিষ্কাম কর্ম্মের যোগ আছে, কেননা যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, সর্ব্বভূতানুকম্পী ভগবদ্ভক্ত, তিনি সর্ব্বভূত হিতার্থে সর্ব্বভূতময় ভগবানের কর্ম্মবোধেই সর্ব্বকর্ম্ম করেন। নিষ্কাম কর্ম্মের অন্য অর্থ নাই।

ভক্তিযোগের আলোচনায় ভাগবত ধর্ম্মের এই জ্ঞানমূলক লক্ষণটি প্রায়ই লক্ষ্য করা হয় না। অথচ শ্রীভাগবত-আদি ভক্তিশাস্ত্রে উহাকেই উত্তমা ভক্তির লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বিদেহরাজ নিমি-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাভাগবত পরমর্ষি ঋষভনন্দন হরিঁ ভাগবত ধর্ম্ম ও ভাগবতধর্ম্মীর লক্ষণাদি বর্ণন করেন। তিনি ভগবদ্ভক্তগণের উত্তম, মধ্যম ও অধম, এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। যথা,—

অধম বা প্রাকৃত ভক্তের লক্ষণ—

'অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥'—ভাঃ ১১।২।৪৭

—'যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিমাতে হরির পূজা করেন, কিন্তু তাঁহার ভক্ত বা অন্য কাহারও পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত বা নিকৃষ্ট ভক্ত।'

যাঁহারা প্রতিমাতে শ্রীহরির পূজা করেন তাঁহারা অবশ্য ভক্ত, তাঁহাদের ঈশ্বরে শ্রদ্ধার ভাব আছে বটে, কিন্তু হরিভক্ত বা অন্যের প্রতি কোন শ্রদ্ধার ভাব নাই, শত্রুর প্রতি হিংসাদ্বেষ আছে, অংহভাবটিও বেশ আছে, কামক্রোধাদি সংযত হয় নাই, কেবল ঈশ্বরে কিছু শ্রদ্ধার ভাব জন্মিয়াছে মাত্র,

প্রাকৃত ভক্তের লক্ষণ

ইহাদের মন্দ কর্ম্ম করিতেও বড় আটকায় না। মোট কথা, নিম্ন প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইঁহারা প্রাকৃত ভক্ত।

মধ্যম ভক্তের লক্ষণ—

'ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু বা।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥'—ভাঃ ১১।২।৪৬

—'যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তজনের প্রতি মৈত্রী, অজ্ঞজনের প্রতি কৃপা, শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন তিনি মধ্যম।'

মধ্যম ভক্তের লক্ষণ

এস্থলে নিম্ন প্রকৃতির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ঈশ্বরে শ্রদ্ধা অনুরাগে পরিণত হইয়াছে, ভক্তজনের প্রতি মৈত্রীভাব জন্মিয়াছে, অজ্ঞজনের প্রতি ঘৃণার ভাব ছিল, সে স্থলে কৃপার ভাব হইয়াছে, শত্রুর প্রতি হিংসাদ্বেষ ছিল, সে স্থলে উপেক্ষার ভাব আসিয়াছে। কিন্তু এখনও ভেদজ্ঞান আছে, আপন-পর শত্রুমিত্রে সমভাব হয় নাই, সর্ব্বভূতে সমদর্শন হয় নাই, তাই ইঁহারা মধ্যম।

উত্তম ভক্তের লক্ষণ—

'ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥'—ভাঃ ১১।২।৫২

উত্তম ভক্তের লক্ষণ

—'যাঁহার আত্মপর ভেদ নাই, বিত্তাদিতে আমার এবং পরের বলিয়া ভেদজ্ঞান নাই, সর্ব্বভূতে যাঁহার সমজ্ঞান, যাঁহার ইন্দ্রিয় ও মন সংযত, তিনি ভক্তোত্তম।'

'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥'—ভাঃ ১১।২।৪৫

—'যিনি সর্ব্বভূতে আত্মস্থ ভগবদ্ভাব এবং ভগবানে সর্ব্বভূত অধিষ্ঠিত দেখিতে পান, তিনি ভক্তোত্তম।'

ভক্তোত্তমের জ্ঞান কিরূপ

আমাতেও ভগবান্ আছেন, সর্ব্বভূতেও ভগবান্ আছেন এবং ভগবানেই সর্ব্বভূত অধিষ্ঠিত আছে, ইহা যিনি অনুভব করেন তিনিই ভক্তোত্তম। বলা বাহুল্য, তিনিই আবার পরম জ্ঞানী, পরম জ্ঞানের ইহাই লক্ষণ (গীঃ ৪।৩৫)। প্রহ্লাদ-চরিত্রে আমরা ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। ইহাই হইল ভক্তোত্তমের জ্ঞান। তাঁহার ভক্তির স্বরূপটি কিরূপ ?

'ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥'

ভক্তোত্তমের ভক্তি কিরূপ

—'নিমিষার্দ্ধ মাত্র ভগবচ্চরণপদ্ম হইতে মনকে দূর করিলে ত্রিভুবনের সমস্ত বিভবের অধিকারী হইতে পারেন এরূপ প্রলোভন পাইয়াও যিনি ভগবৎ-পাদপদ্মই সারাৎসার জানিয়া দেবতাদিগেরও দুর্লভ সেই ভগবৎ-পদারবিন্দ হইতে মনকে বিচলিত করেন না, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান।—ভাঃ ১১।২।৫৩

বলা বাহুল্য, ইনিই প্রহ্লাদ। এইতো হইল ভক্তোত্তমের পরম জ্ঞান ও পরা ভক্তির কথা। কর্ম্ম করা বা কর্ম্ম ত্যাগ করা সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্য কি ?

—'কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥'—ভাঃ ১১।২।৩৬

—'কায়, মন, বুদ্ধি, বাক্য, ইন্দ্রিয়, চিত্ত দ্বারা প্রকৃতির প্রেরণায় যে কোন কর্ম্ম করা হয়, তৎ সমস্তই পরাৎপর নারায়ণে সমর্পণ করিবে।'

মনুষ্য একেবারে কর্ম্মত্যাগ করিতেই পারে না। প্রকৃতির প্রেরণায় বাধ্য হইয়াই তাহাকে কর্ম্ম করিতে হয়। একেবারে কর্ম্ম ত্যাগে জীবন থাকে না, জীবসৃষ্টি থাকে না। তাই প্রকৃতি সকলকেই কর্ম্ম করান। দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিবিধ কর্ম্ম হয়। এ সকল প্রকৃতিরই পরিণাম। প্রকৃতি আর কি,—উহা ভগবানের সৃজনী শক্তি।

ভক্তোত্তমের কর্ম্ম কিরূপ

বস্তুতঃ জীবের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি ভগবান্ হইতেই ('যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্')। জীবের যে কর্ম্ম তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই কর্ম্ম প্রকৃতিদ্বারা সম্পন্ন হয়। বিশ্বকর্ত্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র তিনিই। অজ্ঞানতা-বশতঃ জীব মনে করে আমার কর্ম্ম আমার প্রয়োজনে আমি করি। এই অজ্ঞানতাকেই মায়া বলা হয়। জীব যদি বুঝিতে পারে, বলিতে পারে,—তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, তুমি কর্ত্তা, আমি নিমিত্ত মাত্র। আমি যাহা কিছু করি তুমিই করাও, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমার কর্ম্ম সার্থক হউক, আমি কিছু জানিনা, চাহিনা—এই ভাবটি গ্রহণ করিয়া যদি কর্ম্ম করিতে পারে, তবেই কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত হয়।

এই কর্ম্মার্পণের মূলে ফলাশা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবার তত্ত্ব নিহিত আছে। জীবনের সমস্ত কর্ম্ম, এমন কি জীবনধারণ পর্য্যন্ত এইরূপ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিতে পারিলে স্বার্থবুদ্ধিতে কৃতকর্ম্ম কিরূপে হইবে, কর্ম্মবন্ধনই বা কিরূপে ঘটিবে, তখন স্বার্থ তো কৃষ্ণার্পণরূপ পরমার্থের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধনও ঘুচিয়া যায় ('শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ'—গীঃ ৯।২৮)। এইরূপে কর্ম্মদ্বারাই কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ('বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি' —গীঃ ৯।২৮)। ভক্তের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মব্যবহার কিরূপ তাহা বলা হইল। বিষয়-ভোগ বা বিষয়ত্যাগ সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্য কিরূপে নিয়মিত হইবে ?

—'গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥'—ভাঃ ১১।২।৪৮

—'এই সংসার-ব্যাপারও বিষ্ণুর মায়া ইহা বুঝিয়া যিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ্য বিষয়সকল গ্রহণ করেন, কিন্তু কিছুতে দ্বেষও করেন না বা হৃষ্টও হন না, 'তিনিও ভক্তোত্তম।'

'এ সংসার বিষ্ণুর মায়া'—এ কথার অর্থ কি ? মায়াবাদী দার্শনিকগণ মায়ার স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া বলিয়াছেন—ইহা সৎও নয়, অসৎও নয়, বস্তুও নয়, অবস্তুও নয়, ইহা অনির্ব্বচনীয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী কোন-কিছু। মায়া এই মিথ্যা জগৎ-প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া প্রতীত করায়, এই হেতু উহাকে 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী' বলা হয়।

সুতরাং এই মতে 'জগৎ মায়াময়' একথায় জগৎ মিথ্যা এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ভাগবতধর্ম্মী মায়াবাদী নন, পরিণামবাদী, লীলাবাদী (৪,২৫,৩৭ পৃঃ দ্রঃ)। তাঁহার মতে, এই জগৎ-সৃষ্টি মিথ্যা নয়, বিষ্ণু ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিদ্বারা এই সংসার সৃষ্টি করেন, এই ত্রৈগুণ্যই বিষ্ণুর মায়া ('গুণময়ী মম মায়া সুদুস্তরা'—গী ; 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্'—শ্বেত ৪।১০)। দেহেন্দ্রিয়াদি এবং ইন্দ্রিয়-বিষয় রূপরসাদি সকলই ভগবানের সৃষ্টি ; এই সকল প্রেমময় দয়াময় ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এ সকলে আসক্ত হওয়া উচিত নয় ; কেননা বিষয়ে আসক্তি থাকিলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না, উহা ভগবান্‌কে ভুলাইয়া রাখে, এই জন্যই উহাকে মায়া বা মোহ বলা হয়। অনাসক্ত চিত্তে বিষয়ভোগে দোষ নাই, আসক্তিই বন্ধনের কারণ। ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি জন্মিলে বিষয়াসক্তি দূর হয়, আনন্দস্বরূপকে পাইলে বিষয়ের রূপ-রসাদি সকল বস্তুতেই সেই আনন্দস্বরূপেরই প্রকাশ অনুভূত হয়, তখনই অনাসক্তচিত্তে বিষয়ভোগ করা যায় (২২২ পৃঃ দ্রঃ)।

ভক্তোত্তমের বিষয়ভোগ কিরূপ

প্রঃ। শাস্ত্রে দুই রকম উপদেশ দেখা যায়—বিষয়াসক্তি দূর না হইলে, মায়ামুক্ত না হইলে, প্রকৃতির বন্ধন না ঘুচিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না ; একথা আমরা সকল শাস্ত্রেই পাই। আবার শাস্ত্র একথাও দৃঢ়স্বরে বলেন যে তাঁহাকে না পাইলে বিষয়াসক্তি কিছুতেই দূর হয় না, মায়া-মোহ ঘুচে না। মনে করুন, এক পক্ষ বলেন, আগে টাকা না দিলে দলিল লিখিয়া দিব না ; অপর পক্ষ বলেন, আগে দলিল লিখিয়া না দিলে টাকা দিব না। উভয়ের কথাই যদি বহাল রাখিতে হয় তবে টাকাও দেওয়া হয় না, দলিলও লেখা হয় না। মায়ামুক্ত না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না ; আবার তাঁহাকে না পাইলে মায়াও ঘুচিবে না। অজ্ঞ জীব কোন্ পথে যাইবে ? ইহার কোন্‌টি আগে হবে ? কোন্‌টি সত্য ?

উঃ। উভয়ই সত্য, ইহার আগে পরে নাই। মায়া-মুক্তি ও ঈশ্বর-প্রাপ্তি একই অবস্থা এবং ঠিক এক সময়েই হয়। এ দুই রকম উপদেশ প্রকৃত পক্ষে দুইটি বিভিন্ন মার্গ বা সাধনপথের সঙ্কেত। যাঁহারা বলেন, মায়া বা অজ্ঞান দূর না হইলে সেই পরতত্ত্ব উপলব্ধ হয় না, তাঁহারা দেন

জ্ঞানমার্গ—আত্ম-স্বাতন্ত্র্য

জ্ঞানের উপদেশ ; আর যাঁহারা বলেন, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণ না লইলে, তাঁহার কৃপা না হইলে, মায়া দূর হইবে না, তাঁহারা দেন ভক্তির উপদেশ। একটি হইল জ্ঞানমার্গ, আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আত্মশক্তির কথা, অপরটি হইল ভক্তিমার্গ, আত্মসমর্পণ ও কৃপাবাদের কথা।

এবং ভক্তিমার্গ—আত্মসমর্পণ

শ্রীগীতায় এই দুই রকম উপদেশই আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপদেশ আছে—'আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে' ('উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং'—৬।৫), এ-কথার স্থূল মর্ম্ম এই যে, জীব স্বরূপতঃ নিত্যমুক্ত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই অংশ, মূলতঃ প্রকৃতি-পরতন্ত্র নহে, তাঁহার স্বাধীনতা লাভের স্বাতন্ত্র্য আছে। সাধনা দ্বারা প্রকৃতির রজস্তমোগুণকে দমন করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদ্রেক করিয়া পরিশেষে সে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ করিতে পারে, প্রকৃতির অতীত হইতে পারে, নিজেই নিজেকে উদ্ধার করিতে পারে। এই সাধনা—জ্ঞানযোগ বা আত্মসংস্থ যোগ।

শ্রীগীতায় উভয়ই স্বীকৃত

কিন্তু শ্রীগীতায় ভক্তিযোগেরই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ইহা ভক্তিবাদে সমুজ্জ্বল। মায়া-উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় কি সে-সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—এই ত্রিগুণাত্মিকা আমার মায়া নিতান্ত দুস্তরা। যাঁহারা একমাত্র আমারই শরণাগত হন তাঁহারাই এই সুদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন ('মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'—গীঃ ৭।১৩)। যাঁহারা সতত আমাতে চিত্তার্পণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, সেই সকল ভক্তকে আমি ঈদৃশ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করিয়া থাকেন ('দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেনমামুপযান্তি তে'—গীঃ-১০।১০)

কিন্তু শ্রীগীতায় ভক্তিমার্গের প্রাধান্য

পরিশেষে উপসংহারে শ্রীভগবান্ গুহ্য হইতেও গুহ্য ('গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং') তত্ত্বকথা এইরূপে বলিতেছেন—

শ্রীভগবান্। হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়াদ্বারা জীবদিগকে সংসার-রঙ্গমঞ্চে নাচাইতেছেন ('ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'—১৮।৬১), তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণ লও ('তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত'), তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি ও নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে।

অর্জ্জুন। তুমিই তো সেই ঈশ্বর, আমি তোমা বই আর ঈশ্বর জানি না।

শ্রীভগবান্। হ্যাঁ, তুমি আমার প্রিয়, তাই সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরম হিতকথা পুনরায় বলিতেছি শুন ('সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ'—১৮।৬৪)—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'—গীঃ ১৮।৬৫-৬৬

—'তুমি একমাত্র আমাতেই চিত্ত রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। আমি সত্যপ্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি, তুমি আমাকেই পাইবে, কেননা তুমি আমার প্রিয়।'

'সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।'

'সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও,' এস্থলে 'ধর্ম্ম' বলিতে কি বুঝায়? ভগবৎ-প্রাপ্তি, মোক্ষলাভ বা স্বর্গাদি পারলৌকিক মঙ্গললাভার্থ যে সকল অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম শাস্ত্রাদিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, ব্যাপক অর্থে তাহাকেই ধর্ম্ম বলে—যেমন, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, যতি-ধর্ম্ম, দান-তপস্যাদি ধর্ম্ম, অহিংসা ধর্ম্ম ইত্যাদি। বেদোক্ত, শাস্ত্রোক্ত এবং শিষ্টগণের আচরিত এইরূপ বিবিধ ধর্ম্ম-ব্যবস্থা আছে এবং ঐ সকল বিষয়ে নানা মতভেদও আছে। অর্জ্জুনের মোহ অপসরণার্থ শ্রীভগবান্ এ পর্য্যন্ত জ্ঞানকর্ম্মভক্তি-মিশ্র অপূর্ব্ব যোগধর্ম্মের উপদেশ দিলেন। পরিশেষে 'সর্ব্বগুহ্যতম' এই সার কথাটি বলিয়া দিলেন—শ্রুতি, স্মৃতি বা লোকাচারমূলক নানা ধর্ম্মের নানারূপ বিধিনিষেধের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া, তুমি সর্ব্বতোভাবে আমার শরণ লও, তোমার কোন ভয় নাই, আমিই তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। ইহাই শ্রীগীতায় শ্রীভগবানের শেষ অভয়বাণী, ইহাই ভক্তিমার্গের সার কথা।

সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ—ভগবৎ-শরণাগতি

শ্রীভাগবতেও উদ্ধবকে নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া পরিশেষে ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়াছেন—'যিনি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই ভজনা করেন তিনিই সাধুশ্রেষ্ঠ ('ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ' ভাঃ ১১।১১।৩২)। তুমি একান্তভাবে আমার শরণ লইয়া আমার দ্বারাই অকুতোভয় হও ('ময়া স্যা হ্যকুতোভয়'—ভাঃ ১১।১২।১৫; ২২৬ পৃঃ দ্রঃ)।' ইহার নাম **ভগবৎ-শরণাগতি** বা আত্মসমর্পণ-যোগ। ভক্তিশাস্ত্রে শরণাগতির ষড়্‌বিধ লক্ষণ বর্ণিত আছে, যথা—

'আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতি॥'

—'শ্রীভগবানের প্রীতিজনক কার্য্যে প্রবৃত্তি, প্রতিকূল কার্য্য হইতে নিবৃত্তি, তিনি রক্ষা করিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া তাঁহাকেই বরণ; তাহাতে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ, এবং 'রক্ষা কর' বলিয়া দৈন্য ও আর্ত্তিপ্রকাশ এই ছয়টি শরণাগতির লক্ষণ (বায়ুপুরাণ, হরিভক্তিবিলাস, চৈঃ চঃ ২২।৮৩)।'

এই সকল শরণাগত ভক্তের লক্ষণ। প্রথম কথা এই যে, ভগবানের প্রীতিজনক কার্য্যে সতত রত থাকিবে, এই হইল বিধি। তাঁহার অপ্রীতিজনক কার্য্যে বিরত থাকিবে, এই হইল নিষেধ। যখন যে কোন কার্য্য করি তখনই যদি এই মূলনীতিটি স্মরণ করি যে, এই কার্য্যটি আমার প্রভুর প্রীতিজনক না অপ্রীতিজনক হইবে, জীবনের প্রতি কার্য্যে যদি এই বিধি-নিষেধ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি, তবে আর পাপকর্ম্ম কিরূপে ঘটিবে? কোন্ কর্ম্ম ভগবানের প্রীতিজনক আর কোন্ কর্ম্ম তাঁহার অপ্রীতিজনক সে বিষয়ে শাস্ত্রগুরূপদেশের অভাব হয় না, ভিতর হইতে অন্তরাত্মার বাণীও শুনা যায় ('স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ', 'মনঃপুতং সমাচরেৎ')—যাহাকে পাশ্চাত্যেরা বলেন conscience, আমরা বলি বিবেক-বাণী। সত্যাশ্রয়ী, অহিংসুক, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, জিতচিত্ত, সদাচারী, কোমলচিত্ত, কারুণিক, অমানী, মানদ, সমদর্শী, সর্ব্বোপকারী ভক্ত ভগবানের প্রিয়, এ সকল কথা সকল শাস্ত্রেই আছে, সাধারণ জ্ঞানেও বোধগম্য হয়। এই সকল উপদেশ সতত স্মরণ রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উহাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করিলেই ভগবানের কৃপালাভের যোগ্য হওয়া যায়।

ভগবৎ-শরণাগতির লক্ষণ

শরণাগতির আর একটি লক্ষণ এই—ঈশ্বরই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা এই দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁহাতেই একান্ত নির্ভর। প্রথমাবস্থায় সাধনপথের প্রধান বিঘ্নই হইতেছে সংশয়। যে সংশয়াত্মা—যাহার কোন কিছুতেই সুদৃঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নাই, এটা ঠিক, না ওটা ঠিক, এ পথ ভাল, না ও পথ ভাল, এইরূপ চিন্তায় যে সতত সন্দেহাকুল, তাহার পক্ষে শরণাগতি কেন, কোন গতিই নাই ('সংশয়াত্মা বিনশ্যতি')। এই পথে সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিতে হয়, পরমহংসদেবের ভাষায় তাঁহাকে 'বকলমা' দিতে হয়—তাহা হইলে আর ভয় থাকে না, পদস্খলনেরও আশঙ্কা থাকে না। তিনি বলিতেন—'পুত্র যদি পিতার হাত ধরিয়া চলে, তবে পতনের আশঙ্কা আছে, কিন্তু পিতা যদি পুত্রের হাত ধরিয়া থাকেন, তবে তাহার পতনের ভয় নাই।' সুতরাং এইপথে একমাত্র প্রার্থনা এই—আমি শক্তিহীন, ভক্তিহীন, প্রকৃতির অধীন, আমাকে পাপ-প্রলোভন দমনের শক্তি দাও, আমার কুমতি দূর কর, সুমতি দাও, তোমাতে অচলা ভক্তি দাও, আমি যেন বিষয়-বিলাসে বিমুগ্ধ হইয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে বিস্মৃত না হই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শাস্ত্রে দ্বিবিধ উপদেশ আছে—একটি হইতেছে জ্ঞানের পথ, আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আত্মশক্তির কথা ; অপরটি হইতেছে আত্মসমর্পণ ও কৃপাবাদের কথা (২৪৫-৪৬ পৃঃ)। অধ্যাত্মশাস্ত্র বলেন—'আত্মানং বিদ্ধি' আত্মাকে জান, আপনাকে চেন, সতত আত্মস্বরূপ চিন্তা কর, তুমি তো শক্তিহীন নও, প্রকৃতির অধীন নও, ভাবনা কর তুমি স্বাধীন, নিত্যমুক্ত, বল—

জ্ঞানমার্গী সাধকের ভাব

'সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।'

অপর পক্ষে, ভক্তিশাস্ত্র বলেন—তুমি মায়ামুগ্ধ জীব, দীন, পাপতাপে ক্লিষ্ট, একমাত্র শ্রীহরিই দীনশরণ, পাপহরণ ; একান্তভাবে তাঁহারই শরণ লও, কাতরপ্রাণে তাঁহাকে ডাক, বল—

'পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ॥'

কিন্তু ভক্তিরও অবস্থাভেদ আছে এবং ভক্তেরও প্রকারভেদ আছে। শরণাগতির ভাবটি হইতেছে 'আমি তোমারই,' তুমিই আমার একমাত্র গতি, প্রভো! রক্ষা কর'—এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণ।

ভক্তের ত্রিবিধ ভাব—
(১) আমি তোমার—

ভক্তিমার্গের আর একটি উচ্চতর ভাব হইতেছে—'তুমি আমার।' যেমন, ঠাকুর বিল্বমঙ্গল বলিতেছেন—

(২) তুমি আমার

'হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥'

—'হে কৃষ্ণ, তুমি বলপূর্ব্বক হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যদি আমার হৃদয় ছাড়িয়া বলপূর্ব্বক চলিয়া যাইতে পার তবে বুঝি তোমার পৌরুষ।'

অন্ধ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছেন, লীলাময় খেলাচ্ছলে বালকবেশে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া নিতেছেন। ঠাকুরের বড়ই ইচ্ছা বালকটির বরাভয়প্রদ শ্রীহস্তখানি একটি বার স্পর্শ করেন। কোনরূপে একদিন হাত ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু লীলাময় ধরা দিলেন না, হাত সবলে দূরে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তখনই ঠাকুর বিল্বমঙ্গল পূর্ব্বোক্ত কথাটি বলিয়াছিলেন। এ বড় জোরের কথা, ইহাই প্রেমভক্তি, ব্রজের ভাব। এখানে 'রক্ষা কর', 'মুক্ত কর' ইত্যাদির কোন প্রসঙ্গই নাই, কেননা যিনি শ্রীভগবানকে হৃদয়ে বসাইয়াছেন, 'মুক্তি তার দাসী'। এখানে কেবল বিশুদ্ধ প্রেম, প্রেমরসাস্বাদ।

এই প্রেমভক্তির পরিপক্কাবস্থায় প্রেমাস্পদের চিন্তা করিতে করিতে 'তাদাত্ম্য' লাভ হয়, 'আমিই তুমি' এই ভাব উপস্থিত হয়। পুরাণে দেখি, 'কৃষ্ণদর্শনলালসা', 'কৃষ্ণান্বেষণকাতরা', 'কৃষ্ণভাবনা' কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে ('তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ' ভাঃ ১০।৩০।৪৩), শেষে 'আমি কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে কৃষ্ণের লীলানুকরণ করিতে লাগিলেন ('দুষ্টকালিয় তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহং ইতি চাপরা' বিঃ পুঃ ৫।১৩ ; 'লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ'—ভাঃ ১০।৩০।১৪)।

(৩) আমিই তুমি

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ এইরূপে শ্রীভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন—

'নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম।
নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥'

ইত্যাদি, ইত্যাদি (বিঃ পুঃ ১।১৯।৬৪।৬৫)।

কিন্তু স্তব করিতে করিতে তন্ময় হইয়া শেষে একেবারে তাদাত্ম্যলাভ করিয়া বলিতে লাগিলেন 'তিনিই আমি'—স্তব শেষ হইল এই কথায়—

'সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥'

—বিঃ পুঃ ১।১৯।৮৫-৮৬

—'সেই অনন্ত সর্ব্বগত, তিনিই আমি। আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন, আমিই সমস্ত, আমাতেই সমস্ত ; আমিই অক্ষর, নিত্য, পরমাত্মা, ব্রহ্ম ; সৃষ্টির পূর্ব্বেও আমি, পরেও আমিই।' এখানে দ্বৈতাদ্বৈত, ভক্তি জ্ঞান, বেদান্ত ভাগবত, সব এক হইয়া গেল।

ভক্তির এই সকল অবস্থাভেদ ও প্রকারভেদ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তির প্রকারভেদ—প্রেম

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ন্যূন্যাধিক্যবশতঃ জীব-প্রকৃতি বিভিন্ন রূপ হয়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক স্বভাবের বিভেদ অনুসারে মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি, পূজার্চ্চনা, জ্ঞানবুদ্ধি, কর্ম্ম আদি সকলই ত্রিবিধ হয়। সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী প্রকৃতির লোকের শ্রদ্ধা, যজ্ঞদানতপস্যা, জ্ঞানবুদ্ধি ইত্যাদি কিরূপ বিভিন্নরূপ তাহা শ্রীগীতাগ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে (গীঃ ১৭।১—২২, ১৮।১৯-৩৯ দ্রঃ)।

প্রকৃতিভেদে ভক্তির প্রকারভেদ

হিন্দুশাস্ত্রে সাধনভেদে ও ধর্ম্মকর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা সকলই মূলতঃ ত্রিগুণতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীভাগবতেও সগুণা ও নির্গুণা ভেদে ভক্তির দ্বিবিধ বিভাগ করা হইয়াছে এবং সগুণা ভক্তির ত্রিবিধ প্রকার-ভেদ বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা,—

'ভক্তিযোগ বহুবিধ, লোক-প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণবৈষম্যহেতু লোকের ভাব-ভক্তি বিভিন্নরূপ হয় ('স্বভাব-গুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে')। অন্যকে হিংসা করিবার, অন্যের অনিষ্ট করিবার অভিসন্ধি লইয়া, অথবা দম্ভবশতঃ বা মাৎসর্য্যবশতঃ ক্রোধপরবশ ভেদদর্শী লোকে যে ঈশ্বরের পূজার্চ্চনা করে তাহা তামসী ভক্তি ('অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা। সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ' ॥)। বিষয়ভোগ, যশ বা ধনৈশ্বর্য্যাদি কামনা করিয়া ভেদদর্শী লোকে প্রতিমাদিতে যে আমার অর্চ্চনা করে তাহা রাজসী ভক্তি ('বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা। অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ' ॥)। পাপক্ষয় মানসে, বা ভগবানে কর্ম্ম-সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে, যজ্ঞপূজাদি কর্ত্তব্য, তাই করি এইরূপ ভাব লইয়া ভেদদর্শী লোকে যে পূজার্চ্চনাদি করে তাহা সাত্ত্বিকী ভক্তি ('কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্। যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ।)'—ভাঃ ৩।২৯।৭-১০।

তামসী ভক্তি

রাজসী ভক্তি

সাত্ত্বিকী ভক্তি

সংসারে দেখা যায়, অতি তামসিক স্বভাবের লোকেরও ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনরূপ একটা ধারণা আছে এবং তাহার প্রার্থনা এবং পূজার্চ্চনাও নিজের প্রকৃতির অনুরূপই হয়। ইহাকে ভক্তি বলিলে তামসী ভক্তিই বলিতে হয়। দস্যুগণ নরবলি দিয়া কালীপূজা করে, এই পূজা ঘোর তামসিক, ইহা তামসিক বুদ্ধি হইতে জাত; তামসিক বুদ্ধিতে অধর্ম্মই ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় ('অধর্ম্মং

ধর্ম্মমিতি বা মন্যতে তমসাবৃতা'—গীঃ ১৮।৩২)। কেহ কেহ ছাগমহিষাদি বলি দেন, কত রকম ধুমধাম করিয়া দুর্গোৎসব করেন, এই পূজা রাজসিকবুদ্ধি-প্রসূত; রাজসিকবুদ্ধি শাস্ত্রাদির প্রকৃত মর্ম্ম যথাযথ বুঝিতে পারে না ('অযথাবৎ প্রজানাতি' গীঃ ১৮।৩১)।

কেহ কেহ আবার ছাগমহিষাদিকে কামক্রোধাদি পাশব বৃত্তির প্রতীকমাত্র বুঝিয়া, ঐ সকল রিপুকে বলিদান করাই মায়ের শ্রেষ্ঠ অর্চ্চনা বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা কার্য্যাকার্য্য, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ঠিক ঠিক বুঝেন (গীঃ ১৮।৩০)। ইহা সাত্ত্বিক-বুদ্ধিপ্রসূতা সাত্ত্বিকী ভক্তি।

তামসী ও রাজসী ভক্তিকে প্রকৃতপক্ষে ভক্তি বলা চলে না। সাত্ত্বিকী ভক্তিই উত্তমা ভক্তি, কিন্তু সর্ব্বোত্তমা নয়। ইহাতেও মোক্ষবাঞ্ছাদি থাকিতে পারে এবং ভেদদর্শনও থাকিতে পারে, এই হেতু ইহাও সগুণা ভক্তি। মোক্ষ-বাঞ্ছাদিও যখন বর্জ্জন করা যায় তখনই ভক্তি প্রকৃতপক্ষে নিষ্কামা নির্গুণা হয়। পরে সেই কথাই বলা হইতেছে—

নির্গুণা ভক্তি

'মদগুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তি পুরুষোত্তমে॥
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥'

—আমার গুণ শ্রবণমাত্র যে মনোগতি, সাগরে গঙ্গাসলিলধারার ন্যায়, অবিচ্ছিন্ন-ভাবে সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষোত্তম আমাতে নিহিত হয়, তাহাকেই নির্গুণা ভক্তি বলে। ইহা ফলাভিসন্ধিশূন্য (অহৈতুকী) এবং ভেদদর্শনরহিত (অব্যবহিতা)। সালোক্য, সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য লাভ), সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্য—এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও নির্গুণভক্তিকামী সাধকগণ তাহা গ্রহণ করেন না, তাহারা আমার সেবা ভিন্ন আর কিছুই চাহে না। এইরূপ ভক্তিযোগকেই আত্যন্তিক ভক্তি বলা হয়। এই ভক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া সাধক আমার ভাব প্রাপ্ত হন।'

—ভাঃ ৩।২৯।১৩-১৪

এই নির্গুণা ভক্তি অহৈতুকী, কেননা ইহাতে কোন ফলানুসন্ধান নাই, এবং ইহা ভেদদর্শনরহিতা, কেননা ত্রিগুণাতীত অবস্থায় আপন-পর, শত্রু-মিত্র, শুভাশুভ, সুখ-

দুঃখাদি ভেদজ্ঞান থাকে না—তখন কেবল অখণ্ড অদ্বয় আনন্দানুভূতি। এ সকল বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে এবং আমার ভাব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ কি, তাহাও আলোচনা করা হইয়াছে (২২০-২১ পৃঃ দ্রঃ)।

এই অহৈতুকী নিষ্কামা ভক্তিই **প্রেম**। সাধকের অন্য কোন কাম্য না থাকিলে ভগবান্‌ই একমাত্র কাম্য বস্তু হইয়া পড়েন এবং তাহার কামনা-বাসনা যখন একমাত্র ভগবানেই অর্পিত হয় তখনই উহা প্রেমপদবাচ্য হয়। এই হেতু কোন কোন ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তি ও প্রেম একার্থকরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

নির্গুণা, নিষ্কামা ভক্তিই প্রেম

'অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥' —নাঃ পঞ্চরাত্র।

'অন্য কিছুতে মমতা না থাকিয়া একমাত্র বিষ্ণুতেই যে প্রেমযুক্ত মমতা তাহাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি ভক্তি বলিয়াছেন।'

নারদ বলেন—'সা (ভক্তি) কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা আনন্দরূপা চ'।

শাণ্ডিল্য বলেন—'সা (ভক্তি) পরানুরক্তিরীশ্বরে'।

সুতরাং যাঁহারা ভাগবতোত্তম, ভক্তশ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই প্রেমিক। এই পরাভক্তি বা প্রেম কিরূপে লাভ করা যায়? যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে প্রেম-সম্পদ্ লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন অথবা হঠাৎ শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যান, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এরূপ ভাগ্যবান্ অতি বিরল, সাধারণতঃ বিবিধ সাধনা দ্বারাই উহা লাভ করিতে হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভক্তি হইতেই ভক্তি হয় (২১৯ পৃঃ), এ কথার অর্থ এই যে, ভাগ্যবলে ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধার ভাব উদিত হইলে শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তনাদি সাধনাদ্বারা চিত্ত ক্রমে যতই নির্ম্মল হইতে থাকে ততই কামনা-কলুষ বিদূরিত হয় এবং ঈশ্বরে অনুরক্তি বর্দ্ধিত হইয়া উহা প্রেমে পরিণত হয়।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রেম-বিকাশের ক্রম এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সঙ্গস্ততোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তি স্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি!
সাধকানাং অয়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥' —ভঃ রঃ সিঃ

—প্রথমে চাই **শ্রদ্ধা**—শাস্ত্রবাক্যাদিতে দৃঢ় বিশ্বাস। হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইলে **সাধুসঙ্গে** ইচ্ছা হয়, সাধু ভক্তজনের আচরণ দেখিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনে প্রবৃত্তি হয়। ঐকান্তিকতার সহিত **সাধন-ভজন** করিতে করিতে **অনর্থ-নিবৃত্তি** হয় অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলেই **নিষ্ঠা** জন্মে অর্থাৎ ভগবৎ-চরণে

প্রেম-বিকাশের ক্রম

চিত্ত একাগ্র হয়, শ্রীভগবানে চিত্ত একনিষ্ঠ হইলেই তাঁহার মাধুর্য্য বিশেষভাবে উপলব্ধ হইতে থাকে এবং তাঁহার নাম-গুণ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে **রুচি** জন্মে। রুচি হইতেই **আসক্তি** জন্মে, আসক্তি গাঢ় হইলে **ভাব** বা প্রীত্যঙ্কুর জন্মে, উহা গাঢ় হইয়া **প্রেম** আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সাধকগণের প্রেমোদয়ের ইহাই ক্রম।

'রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণ-প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥' —চৈঃ চঃ মধ্য—২৩

এ স্থলে, প্রেমের প্রথমাবস্থাকেই ভাব বলা হইয়াছে ('প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে'—ভঃ রঃ সিঃ)। চিত্তে এই ভাব বা প্রেমাঙ্কুর জন্মিলে সাধকের যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহাও গোস্বামিপাদ সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন, যথা,—ক্ষান্তি, অব্যর্থ-কালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, সমুৎকণ্ঠা ইত্যাদি।

ক্ষান্তি—ক্ষোভের হেতু উপস্থিত হইলেও অর্থাৎ রোগ শোক, আপদ্ বিপদ্ উপস্থিত হইলেও যে চিত্তের অক্ষোভিত ভাব তাহাকে বলে ক্ষান্তি ('ক্ষোভহেতাবপি প্রাপ্তে ক্ষান্তিরক্ষুভোতিতাত্মতা')। জীব ত্রিতাপে তাপিত, তাহার দুঃখের অন্ত নাই, সে দুঃখ দুঃখ করিয়া অস্থির। কিন্তু সেই সুখময় প্রেমময়ের প্রতি ভাবের অঙ্কুর মাত্র যাঁহার চিত্তে উদ্গত হইয়াছে তাঁহার আর দুঃখ নাই, তিনি ভাবানন্দে ভরপুর। তাই দেখি, আচার্য্য শ্রীনিবাস প্রভু মৃত পুত্র গৃহাঙ্গনে রাখিয়াও কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইলেন, ঠাকুর হরিদাস বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত খাইয়াও পরমানন্দে হরিনাম করিতে লাগিলেন। ইহাই ক্ষান্তি।

অব্যর্থকালত্ব—শ্রীভগবানের স্মরণ মনন এবং তাঁহার প্রীতিকর কার্য্যসাধন ব্যতীত যে সময় যায় তাহাই বৃথা যায়, ইহাই অব্যর্থকালত্ব। যাঁহার চিত্তে ভাবাঙ্কুর জন্মিয়াছে, তিনি যে কোন কর্ম্মে লিপ্ত থাকুন না কেন, তাঁহার চিত্ত সততই শ্রীভগবানে নিত্যযুক্ত থাকে। তাই কেবল পূজার্চ্চনাদি নয়, আহার-বিহারাদি সকল কর্ম্মই শ্রীভগবানে অর্পণ করিবার উপদেশ আছে (২৪৪ পৃঃ)। এইরূপে কর্ম্মার্পণদ্বারাই ভগবানের সহিত মানসে যুক্ত থাকা যায়, লৌকিক কর্ম্ম-জীবনও ধর্ম্মজীবনেই পরিণত হয়। অবশ্য, ভাবের পরিপক্কাবস্থায় শেষে এরূপ অবস্থা উপস্থিত হয় যে লৌকিক কর্ম্ম থাকেই না, এমন কি বাহ্য পূজার্চ্চনাও থাকে না।

বিরক্তি—বিরক্তি অর্থ বিষয়ে বিরক্তি, ভোগলিপ্সা ত্যাগ। ভগবানে যাঁহার রতি জন্মিয়াছে, বিষয় আর তাহার ভাল লাগে না, যথাপ্রাপ্ত বিষয় ভোগ

করিলেও উহাতে আসক্তি থাকে না (২২২-২৩ পৃঃ)। অনেকে বিষয়-আশয় ত্যাগ করিয়া পরমানন্দে বিচরণ করেন। রাজরাণী মীরাবাঈ অতুল ঐশ্বর্য্য, সুখ-সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া 'হরিছে লাগি রহ রে ভাই' বলিতে বলিতে বৃন্দাবনে ছুটিলেন।

মানশূন্যতা—অভিমান অহংভাব হইতে উৎপন্ন হয়। আমি বড়, আমি ধনী, আমি সাধক, আমি ভক্ত, এইরূপ ভাবই অভিমান। ধনাভিমান, জাত্যভিমান, বিদ্যাভিমান, সদাচারের অভিমান, সাধন ভজনের অভিমান, এইরূপ নানাভাবে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে উহা মনকে অভিভূত করে। কিন্তু যাঁহার চিত্তে প্রেমাঙ্কুর জন্মিয়াছে তিনি এ সকল 'আমি' ভাব হইতে মুক্ত (২০৬ পৃঃ দ্রঃ)।

'নামটা যে দিন ঘুচাবে, নাথ,
বাঁচবো সে দিন মুক্ত হ'য়ে—
... ...
সবার সজ্জা হরণ ক'রে
আপনাকে সে সাজাতে চায়।
সকল সুরকে ছাপিয়ে দিয়ে
আপনাকে সে বাজাতে চায়।
আমার এ নাম যাক্ না চুকে,
তোমারি নাম নেব মুখে,
সবার সঙ্গে মিল্‌বো সে দিন
বিনা-নামের পরিচয়ে।' —রবীন্দ্রনাথ

বলা বাহুল্য, মানশূন্যতা ও নামশূন্যতা একই কথা।

সমুৎকণ্ঠা—এইরূপ অবস্থায় শ্রীভগবান্‌কে পাইবার জন্য, দেখিবার জন্য একান্ত ব্যাকুলতা জন্মে। সে ব্যাকুলতা, সে উৎকণ্ঠা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এক ব্যক্তি কোন মহাপুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল— 'আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন ? তিনি কি দেখা দেন ? কিরূপে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় ?' মহাপুরুষ বলিলেন—'হাঁ, দেখিয়াছি, তুমি দেখিবে ? তবে আমার সঙ্গে এস।' এই বলিয়া তিনি তাহাকে নিকটস্থ জলাশয়ে লইয়া গিয়া বলিলেন—'জলে ডুব দাও।' সে যেই ডুব দিয়াছে অমনি সাধু পুরুষ তাহার মাথাটি জলের নীচে কিছুক্ষণ সবলে ডুবাইয়া রাখিয়া শেষে ছাড়িয়া দিলেন। সে ব্যক্তি মাথা তুলিয়াই ক্রোধভরে বলিল—'এ কেমন ব্যবহার আপনার, আমার প্রাণ যায়-যায়, অথচ আপনি আমাকে এমনভাবে চাপিয়া রাখিলেন।' মহাপুরুষ বলিলেন—'বৎস, মুহূর্ত্তকাল তোমার প্রাণের জন্য যে

ব্যাকুলতা হইয়াছিল—এইরূপ ব্যাকুলভাব যখন ঈশ্বরের জন্য হইবে তখনই তাঁহার দর্শন পাইবে, নচেৎ আমার শত উপদেশেও কিছু হইবে না।'

এই অবস্থায় ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগে না, তাঁহার নামগুণ শ্রবণ-আখ্যানে একান্ত আসক্তি জন্মে এবং স্মরণ কীর্ত্তনে অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবগুলির অল্প অল্প উদয় হয় ('সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ'-ভঃ রঃ সিঃ)। সাত্ত্বিক ভাব অষ্ট প্রকার (৮৬ পৃঃ দ্রঃ)।

এই ভাবের পরিপক্কাবস্থায়ই প্রেম। প্রেমের পূর্ণ বিকাশে বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, ঘৃণা, লজ্জা, ভয় সমস্ত লোপ পায়, লোকাপেক্ষা থাকে না—প্রেমবিহ্বল ভক্ত উন্মত্তের ন্যায় কখনও হাস্য করেন, কখনও রোদন করেন, কখনও নাম গান করেন, কখনও আনন্দে নৃত্য করেন ('হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ'—৮৭ পৃঃ দ্রঃ)।

প্রেমোন্মত্ততা

এই প্রেমোন্মাদের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'তোমার প্রেম যে বইতে পারি
এমন সাধ্য নাই।
এ সংসারে তোমার আমার
মাঝখানেতে তাই
কৃপা ক'রে রেখেছ নাথ
অনেক ব্যবধান—
দুঃখ সুখের অনেক বেড়া
ধন জন মান।
... ...
শক্তি যারে দাও বহিতে
অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দ্দা
ঘুচায়ে দাও তা'র।
না রাখো তা'র ঘরের আড়াল
না রাখো তা'র ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তায়
করো অকিঞ্চন।
না থাকে তা'র মান অপমান,
লজ্জা সরম ভয়,
একলা তুমি সমস্ত তা'র
বিশ্ব ভুবনময়।'

"প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে।' বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রীচৈতন্য-লীলা লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলা হইয়াছে। ভগবৎ-প্রেমোন্মাদের বিচিত্র বিভাব, অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের 'উদ্দীপ্ত' বিকাশ ইত্যাদি শাস্ত্রাদিতে যেরূপ বর্ণিত আছে সে সমস্তই শ্রীচৈতন্যলীলায় প্রকটিত দেখিতে পাই। এই অপূর্ব্ব লীলাখ্যান বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন এবং এতৎপ্রসঙ্গে রসশাস্ত্রাদিরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় রসব্রহ্মের উপাসক, বেদান্তের রসব্রহ্মই ব্রজের রসরাজ। ব্রজের রাধাকৃষ্ণলীলাই শ্রীচৈতন্যলীলা—শ্রীগৌরাঙ্গ একধারে রাধা-কৃষ্ণ—'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্' (১১০ পৃঃ)।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে ভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি (৮৩ পৃঃ)। বৈধী ভক্তি সমস্ত ভক্তসম্প্রদায়েরই সাধারণ সামগ্রী, কিন্তু উহা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, উহাতে ভগবানের মহিমা জ্ঞানই প্রধান থাকে এবং ভুক্তি মুক্তি আদি প্রার্থনাও থাকে। কিন্তু রাগানুগা ভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে না, উহাতে একান্ত মমত্ববোধ থাকে, ঐশ্বর্য্য জ্ঞান থাকিলে মমত্ববোধের পূর্ণ স্ফূরণ হইতে পারে না।

কেননা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বাৎসল্যাদি-ভাবের বিকাশ হইতে পারে না—'উহা বাৎসল্য সখ্য মধুরের করে সঙ্কোচন'। ব্রজের কৃষ্ণ, মা যশোদার স্নেহের পুতুল, গোপিকার হৃদয়-বল্লভ, রাখালের খেলার সাথী,—'কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ'। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পাঁচটি মুখ্য স্থায়িভাবের মধ্যে শান্ত ও দাস্যরস সকল ভক্তিশাস্ত্রেরই অভিধেয়, কিন্তু সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব ব্রজলীলারই বিশেষত্ব, উহা আর কোথায়ও নাই। তন্মধ্যে মধুরভাব বা 'কান্তাপ্রেম' 'সাধ্য-শিরোমণি'। যিনি এই ভাবের ভাবুক তাঁহার পক্ষেই এ নিগূঢ়তত্ত্ব বোধগম্য, উহা দুর্ল্লভ বস্তু।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য

'কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তার কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সুলভ।' —চৈঃ চঃ

এই 'কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের' সংবাদ, রাগমার্গের ভজন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাবেই আমরা বিশেষরূপে পাইয়াছি, তাই তিনি প্রেমাবতার বলিয়া পরিচিত। পুরাণে এই সংবাদ আমরা পাই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায়—তথায় তিনি রসময়, প্রেমময় রূপেই প্রকটিত (৫৯ পৃঃ দ্রঃ)। আবার, তাঁহার অন্য লীলাও আছে, যিনি আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, তিনিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ তিনি যেমন অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, তেমন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ,—সৎ-চিৎ-আনন্দ, কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তি,—তাঁহার সমগ্র লীলার অনুধ্যানে এই ত্রিবিধ শক্তিরই আমরা পূর্ণ-প্রকাশ দেখিতে পাই। জীবকেও তিনি

কেবল রস-ভোক্তা করেন নাই, তাহাকে জ্ঞাতা ও কর্ত্তাও করিয়াছেন (৮৬ পৃঃ)। সুতরাং তাঁহার উপাসনায় ও সাধনায় কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম, এ তিনেরই সঙ্গতি থাকিবারই কথা। এই সকল তত্ত্বই আমরা বিবিধ শাস্ত্রবিচারে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য, এ সকল শুষ্ক নীরস শাস্ত্রালোচনামাত্র, সাধনভজনহীন, ভক্তিহীন, শক্তিহীন, সংসার-কীট আমরা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব কি বুঝিব আর কি বুঝাইব? শাস্ত্রভারবাহী আমাদের এ সকল আলোচনা কেমন, না—

'যথা খরশ্চন্দনভারবাহী, ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।'

চন্দনের গন্ধ গ্রহণের যোগ্যতা নাই, কেবল চন্দনকাষ্ঠের ভার বহন করিতেছি মাত্র। আমরা অনধিকারী, কেবল নিজ শিক্ষার জন্য আলোচনা করি, যদি এই প্রসঙ্গে তাঁহার নাম-গুণ স্মরণ মননে রুচি হয়, শুষ্ক নীরস হৃদয় একটু সরস হয়, এই প্রাণের আশা।

দয়াময়! তুমি জান।
অহৈতুককৃপাসিন্ধু তুমি!
'তোমার দয়া যদি
চাহিতে নাও জানি
তবুও দয়া করে
চরণে নিও টানি'।

॥ ওঁ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥
॥ শান্তিঃ পুষ্টিস্তুষ্টিমস্তু ॥

পরিশিষ্ট

শ্লোকসূচী

[এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বহুসংখ্যক মূল শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সুবিধার্থে সে সকলের কতকগুলি নিম্নে বর্ণমালানুক্রমে উল্লিখিত হইল। সংখ্যাগুলি পত্রাঙ্ক-জ্ঞাপক]

অ

বিষয় — পৃষ্ঠা

—

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বতঃপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মূলস্পর্শী শাস্ত্রালোচনা।

অভিমত (সংক্ষিপ্ত)

আনন্দবাজার পত্রিকা—বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আজ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-জীবন বিবৃত করিয়া বাংলা ভাষাতে যত গ্রন্থ লেখা হইয়াছে এই 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থখানাকে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভাগবত-ধর্ম্ম আলোচনায় ভক্তিরস মিশাইয়া লেখক গ্রন্থখানাকে **অপূর্ব্ব রস-মধুর করিয়া তুলিয়াছেন।**

ভগবৎ-লীলার প্রকাশক এই গ্রন্থ **একাধারে ধর্ম্ম ও দর্শন গ্রন্থ।**

দেশ—জগদীশবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ গীতা-ব্যাখ্যাতা। তাঁহার এই গ্রন্থে তিনি ভক্তির দৃষ্টিতে, প্রেমের দৃষ্টিতে, শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত-ধর্ম্ম বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানা আশা করি **শীঘ্রই রসিক ও ভক্ত-সমাজে অবিচলিত আসন লাভ করিবে।** গ্রন্থখানা **মধুর রসের আকর।** বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকলকেই আমরা গ্রন্থখানা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

যুগান্তর—গীতা-সম্পাদক লিখিত এই বইখানি নানাভাবেই বৈচিত্র্যপূর্ণ। গ্রন্থকার অতি নিপুণতার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'বেদান্ত ও ব্রজের ভাব', 'রাস-লীলা রহস্য', 'শ্রীগীতাতত্ত্ব' প্রভৃতি বিষয়সমূহের বিস্তৃত আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থখানি **ভক্ত, জ্ঞানী, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, সকলের নিকটই আদরণীয় হইবে।**

প্রবর্ত্তক—রসঘন বিশুদ্ধ মাধুর্য্য-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র ও মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধার রস-বিলাস-বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভক্তিমান্ গ্রন্থকার যে অভিনিবেশের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকার শুধু নিজেই রসাস্বাদন করেন নাই, তাঁর নিগূঢ় রাধাকৃষ্ণ লীলার অন্তরঙ্গ অনুপ্রবেশ ও সহজ সাবলীল প্রকাশভঙ্গী রসাস্বাদন করাইবারও সহায়তা করিয়াছে। **শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্ররূপ জাতির সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য গ্রন্থকার চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।**

শ্রীসুদর্শন পত্রিকা—সুপ্রসিদ্ধ গীতা-ব্যাখ্যাতা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি, মুগ্ধ হইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে **এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বব্যাপক আর কোন গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।** এইরূপ একখানা গ্রন্থ-প্রণয়নের জন্য গ্রন্থকারকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

Amrita Bazar Patrika—Will be highly valued by Bhaktas, Vedantists and Karmajogins alike. We wish this admirable book a wide circulation.

উদ্বোধন—গ্রন্থখানি অল্পসংস্কৃতজ্ঞ অথচ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের পক্ষে যে বেশ উপাদেয় হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ভূমিকায় প্রদত্ত সুচিন্তিত আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা বুদ্ধিজীবিগণের বিচার-সৌকর্য্য সাধন করিবে।

উজ্জ্বল ভারত—গ্রন্থখানি নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ—ইহা জনসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে—প্রাচীনের চিন্তাধারা এই গ্রন্থখানির ভিতর দিয়া নবীনের ছাঁচে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে বলিয়াই এই গ্রন্থের এতটা প্রসার সম্ভবপর হইয়াছে। গ্রন্থখানি সফল হইয়াছে। ইহার আরও প্রচার কামনা করি।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

শ্রীগীতা

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.-সম্পাদিত

অভিমত (সংক্ষিপ্ত)

আনন্দবাজার পত্রিকা—জগদীশবাবুর গীতাখানি দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙালী পাঠকগণকে গীতার মর্ম্ম ও মাধুর্য্য আস্বাদনে সহায়তা করিয়া আসিতেছে। প্রাঞ্জল অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা। গ্রন্থখানা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে যেমন উপযোগী হইয়াছে, তেমনি সুশিক্ষিত পাঠকগণও উহা পাঠে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। গ্রন্থকার পণ্ডিত ও শাস্ত্রদর্শী। **আমরা প্রত্যেক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুকে এই গ্রন্থ ক্রয় করিতে অনুরোধ করি।**

দেশ—জগদীশবাবুর গীতাখানা সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের নিত্য পাঠযোগ্য হইয়াছে। সাধারণ পাঠকদের বুঝিবার উপযোগী ব্যাখ্যা যেমন দেওয়া হইয়াছে তেমনি বিজ্ঞতর পাঠকদের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাব্যাখ্যাকারীদের মত আলোচনাসহ 'গীতার্থদীপিকা' নামে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বিস্তৃত ভূমিকায় গীতাসম্পর্কিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য স্থান পাইয়াছে। **গীতাধ্যায়ীদের নিকট বইখানা অপরিহার্য্য বলিয়া আমরা মনে করি।**

প্রবর্ত্তক—বাজারে প্রচলিত গীতার বহু সংস্করণের মধ্যে 'জগদীশ ঘোষের গীতা' এই নাম জানেন না এমন শিক্ষিত লোক খুব কমই আছেন। মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা-টীপ্পনী, ভাষ্য তো আছেই, তাহা ভিন্ন গ্রন্থকার প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য গীতাব্যাখ্যাতৃগণের আলোচনা নিরপেক্ষভাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সুবৃহৎ ভূমিকা পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই প্রশংসনীয়।

যুগান্তর—গীতার সুসম্পাদিত সংস্করণ। শঙ্কর, শ্রীধর হইতে তিলক, অরবিন্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক গীতাচার্য্যগণের মত বিশদভাবে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। গীতা বুঝিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সাংখ্যবেদান্তাদি শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ও দার্শনিক পরিভাষা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রন্থখানিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে; **এরূপ প্রাঞ্জল টীকা-টীপ্পনী-ভাষ্য-রহস্যাদি গীতা সাহিত্যে অধিক নাই।** ভূমিকায় সনাতন ধর্ম্মের পরিচয়, সমন্বয়বাদ, গীতার মূল শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা আছে। বহিরবয়বও মনোরম হইয়াছে।

দৈনিক বসুমতী—প্রত্যেকটি শ্লোককে সহজবোধ্য করিবার জন্য শ্রীগীতায় উহার ভাষামুখে অন্বয়, কঠিন কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা ও সহজ ভাষায় উহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা, নানাশাস্ত্র আলোচনাকালে প্রয়োজনীয় নানা তত্ত্বের অবতারণাও লেখককে করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত যাঁহারা ভাল জানেন না, তাঁহাদের কাছেও পুস্তকখানি সহজবোধ্য।

Amrita Bazar Patrika—A notable feature of Jagadish Babu's Geeta is the author's inimitable method of presentation which makes the most abstruse points easily intelligible. Besides lucid explanations and elucidations, the book contains an admirable synopsis of matters directly bearing on the texts...which is very helpful for a thorough grasp of the Geeta.

Indeed the work is a store-house of ancient knowledge.

Hindustan Standard—The author seems to have spared no pains to make the Gita understandable to the common reader. The discussions have been carried on throughout in a manner which will not only enable the reader to make his way with the mysteries of the Gita, it will also give him good knowledge of almost all the important scriptural books of the Hindus.

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা